প্রসঙ্গ ঃ অন্নদাশঙ্কর

সম্পাদনা

কালিদাস ভদ্র

রেসনস্

৯৪, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০০

প্রকাশিকা ঃ বীথিকা রায়
৪এ, গোমেশ লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৪

প্রথম প্রচ্ছদ ঃ আলোকচিত্র ● রবি দত্ত
শেষ প্রচ্ছদ ঃ আলোকচিত্র ● পারিজাতবিকাশ মজুমদার
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ কলিদাস ভদ্র ও সন্দীপ রায়

বর্ণসংস্থাপক ঃ
ম্যাক্স কম্পিউটার সেন্টার
৯এ, হরি ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

স্বাতী মুখার্জী, অভয় বসু, স্বপন সিংহ-কে

সূচিপত্র

কিছু কথা

জীবদ্দশায় জন্মশতবার্ষিকী করার বাসনা ছিল সবারই। বাধ সাধলো জীবনের নিয়ম। ২৮ অক্টোবর, ২০০২, বিকেল ৩-৫০ মিনিটে শেঠ সুখলাল কাবনানি হাসপাতালে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়। আগস্টে বার্ধক্যজনিত শারীবিকভাবে দুর্বল অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত দীর্ঘায়ু অন্নদাশঙ্কর রায় সদা জাগ্রত ছিলেন। জাগ্রত রেখেছিলেন আমাদের বিবেককেও।

মুম্বাইয়ে শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন-এর ছবি পুড়িয়ে দেওয়ার পর বাংলা আকাদেমি সভাঘরে এক প্রতিবাদ-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছেন তিনি। গুজরাটে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদী বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। সামাজিক দায়বোধের এমন ব্যতিক্রমী উদাহরণ ভারতবাসীর অহংকার। দেশভাগ থেকে আজকের গোধরা, সর্বত্র এক বিবেকবান মানুষের প্রবল উচ্চকণ্ঠ স্তব্ধ হল।

১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ, ওড়িশার ঢেঙ্কানালে তাঁর জন্ম। পিতা নিমাইচরণ রায়, মাতা হেমনলিনী দেবী। স্ত্রী মার্কিন নারী অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ, তিনি তাঁর নাম দেন লীলা রায়।

স্কুল জীবনেই সাহিত্য রচনার প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ গড়ে ওঠে। কলেজ জীবনে ইবসেন, টলস্টয়, টর্গেনিভ, বার্নার্ড শ', চার্লস ডিকেন্স প্রমুখের লেখা পড়ে তাঁর মন ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী হয়। ইতিমধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যে তিনি কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষাকেই বেছে নিলেন সাহিত্য চর্চায়।

আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ১৯২৭ সালে ইউরোপ পাড়ি দিলেন। সেখানে বসে ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী নিয়ে শুরু হল 'পথে প্রবাসে'। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এই ধারাবাহিক বাংলা সাহিত্যে তাঁকে এনে দিল খ্যাতিমান সাহিত্যিকের সম্মান। ১৯২৯ সালে দেশে ফিরলেন তিনি। ১৯৩০ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শুরু হল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সত্যাসত্য'।

প্রায় এক শতাব্দী ধরে হেঁটে যাওয়া সাহিত্যের এই নিবিড় সাধক, জীবন সন্ধানী, জাগ্রত বিবেক আমাদের পথিকৃৎ। অস্থির এই সময়ে আজ খুবই দরকার তাঁর বিপুল সৃষ্টিকর্ম, জীবন ও বাণী অনেক বেশি বেশি আমাদের আত্মস্থ করার সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। 'প্রসঙ্গ ঃ অন্নদাশঙ্কর' বইটি সেই দায় পালনের একটি প্রয়াস মাত্র। বিবেকি মানুষ হিসেবে বিবেকি মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের উৎসমুখে যেতে চাওয়া।

অগ্রজ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পবিত্র সরকার, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, ধীমান দাশগুপ্ত, তপন বন্দোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, উৎপল ঝা, রবি দত্ত, বিজন মুখোপাধ্যায়, এঁদের অকৃপণ সহযোগিতা ছাড়া বইটির প্রকাশ সম্ভব হত না। এছাড়াও বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধু শুভময় মণ্ডল, কাজল চক্রবর্তী, প্রণবেশ মাইতি, শ্যামল জানা, পারিজাতবিকাশ মজুমদার, শঙ্কর ভট্টাচার্য, সন্দীপ রায়।

অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন, দৈনিক আনন্দবাজার, আজকাল, গণশক্তি, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কাছেও চিরকৃতজ্ঞ। চিরকৃতজ্ঞ বন্ধু মনোজ রায়ের কাছে, যাঁর নিরন্তর তাগাদায় বইটির প্রকাশ সম্ভব হল।

অন্নদাশঙ্কর রায়

জীবনানন্দ সভাগৃহ উদ্বোধন করছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, বাঁদিকে সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কবি শঙ্খ ঘোষ ।

রাজশাহীতে লীলা রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় (পেছনের সারিতে) চিত্রকাম (ডানদিকে), জয়া (টুলের উপর বসে), পূণ্যশ্লোক (বাঁদিকে)

নন্দন চত্বরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায় ও সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়।
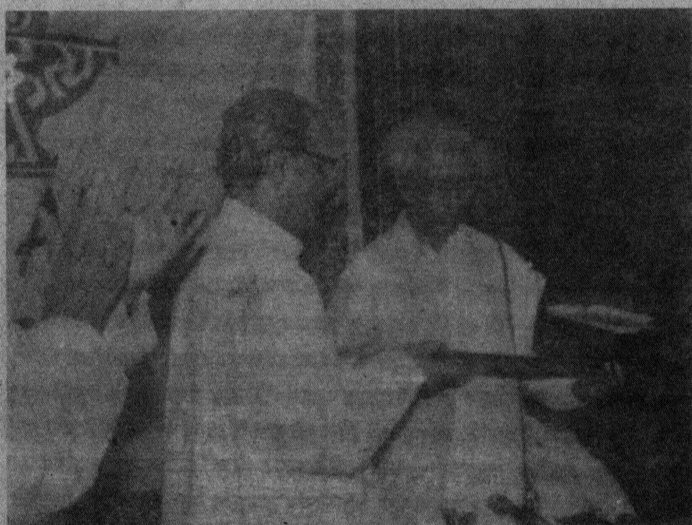
১৯৮৯ সালে সাহিত্য অকাদেমি ফেলোশিপ অন্নদাশঙ্কর রায়কে প্রদান করছেন সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।

শিল্পী প্রণবেশ মাইতির সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় ।

অন্নদাশঙ্কর রায়, মাহবুব উল আলম, কাজী আবদুল ওদুদ।

নিজের রচনা নিয়ে নিজের কথা (১৯৮৭-১৯৮৯)

অন্নদাশঙ্কর রায়

এক

পরীক্ষায় সফল হয়ে বিলেত যাত্রার তোড়জোড় করছি এমন সময় আমার পাটনা কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু কৃপানাথ মিশ্র আমাকে লেখেন তাঁর ভাগলপুরের প্রতিবেশী সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'র জন্যে আমার কাছ থেকে একটি রচনা চান। আমি যে প্রবন্ধটি পাঠাই সেটি 'রক্তকরবীর তিনজন' নামে প্রকাশিত হয়। এর পরে সম্পাদকের কাছ থেকে আরও লেখার অনুরোধ আসে। আমি তাঁদের জানাই যে আমি বিলেত যাচ্ছি। সেখান থেকে তাঁকে ভ্রমণকাহিনী পাঠাব। তিনি আমার প্রস্তাবে রাজি হন। এইভাবে 'পথে প্রবাসে'র শুরু। নাম রাখি অবনীন্দ্রনাথের 'পথে বিপথে'র অনুকরণে।

বিলেতে আমি দু'বছর থাকি। মাঝে মাঝে ঘুরে আসি ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশ। 'পথে প্রবাসে' লিখতে লিখতে একসময় লিখি 'তারুণ্য' নামক প্রবন্ধসমষ্টি। সে সময় দেশে বিদেশে তরুণ-তরুণীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছিল। বিদেশে তার নাম যৌবনের বিদ্রোহ। বিদ্রোহটা বার্ধক্যের বিরুদ্ধে। পুরাতনের বিরুদ্ধে। পুরাতন আপনাকে সনাতন বলে জাহির করে, সেই তথাকথিত সনাতনের বিরুদ্ধে। আমিও জরার বিরুদ্ধে যৌবনের পক্ষে লেখনী ধারণ করি।

বিলেত থেকে ফেরার পর 'বিচিত্রা' সম্পাদকের অনুরোধে একটি উপন্যাসে হাত দিই। তার নাম রাখি 'সত্যাসত্য'। পরে তার প্রথম খণ্ডের নাম রাখা হয় 'যার যেথা দেশ'। সেই উপন্যাস লিখতে লিখতে কী মনে করে 'অসমাপিকা' নামক অপর একটি উপন্যাস শুরু ও শেষ করি। সেটি কোনো মাসিকপত্রে প্রকাশ না করে সরাসরি 'তারুণ্য' গ্রন্থের প্রকাশক স্বনামধন্য সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ওপর পুস্তকাকারে প্রকাশের ভার দিই। সুধীরবাবু অনেক ভেবেচিন্তে বছরখানেক বাদে প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বিবাহের বরযাত্রী গোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার কাছে একটি উপন্যাস চান। প্রথমে রাজি না হলেও পরে আমি আমার একটি ভ্রমণবৃত্তান্তকে উপন্যাসের আকার দিই। নাম রাখি 'আগুন নিয়ে খেলা'। গোপালবাবু রাতারাতি প্রকাশ করে আমার হাতে কিছু টাকা দেন। সেই টাকা নিয়ে আমি রাতারাতি বিয়ে করি। অনেকের ধারণা

পেগী আর কেউ নয়, আমার স্ত্রী। সে ধারণা ভুল। পেগী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ভ্রমণটা সত্য হলেও কাহিনীটা বানানো। 'আগুন নিয়ে খেলা'ই আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। 'অসমাপিকা' তার কয়েক মাস আগে লেখা। 'যার যেথা দেশ' আরও কয়েক মাস আগে শুরু। বিলেত থেকে ফিরে তরতাজা মন নিয়ে এসব লিখি। তখনও বিয়ে হয়নি, সংসারদায় ছিল না, সরকারি কাজের চাপ হালকা, প্রভূত অবসর। বিকেলে টেনিস, সন্ধ্যায় বিলিয়ার্ডস। তারই ফাঁকে ফাঁকে এইসব লেখা।

'অসমাপিকা' লেখার বছর পাঁচেক পরে আমি অনুভব করি যে ওই উপন্যাসের বিষয়বস্তু একটি বৃহৎ উপন্যাসের উপযুক্ত। নতুবা তার প্রতি সুবিচার করা হয় না। সে-রকম একটি উপন্যাস লেখার সময় আমার হাতে ছিল না, আমি তখন 'সত্যাসত্য' নিয়েই ব্যাপৃত। তা ছাড়া রাজকার্য তো ছিলই। পরে এক সময় একই বিষয়বস্তু নিয়ে বৃহৎ উপন্যাস লিখব বা তার নাম রাখব 'রত্ন ও শ্রীমতী' এ চিন্তা মাথায় রেখে 'অসমাপিকা'র দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ থেকে জটিলতর অংশ বাদ দিই। ফলে কাহিনীটি হয় নিছক একটি প্রেমের কাহিনী, যা সমস্যামূলক নয়। পাঠকরা গ্রহণ করেন, তার প্রমাণ সেইভাবে তৃতীয় সংস্করণ।

পরে একদিন কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাকে যা বলেন তার মর্ম, যে অন্নদাশঙ্কর রায় ও বই লিখেছেন আমি সে অন্নদাশঙ্কর রায় নই। একজনের রচনায় অপরজন হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। তাঁর সে নৈতিক অধিকার নেই। এক বয়সের লেখা অপর বয়সের লেখায় পরিণত করা চলে না।

কান্তিবাবুর পরামর্শই আমি গ্রহণ করি। কিন্তু 'অসমাপিকা'র আর সংস্করণ হয় না। তাই পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত অংশ পুনঃসন্নিবেশের সুযোগ মেলে না। এখন রচনাবলিতে প্রথম সংস্করণের 'অসমাপিকা' তার জটিলতাসমেত পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে। 'রত্ন ও শ্রীমতী' যেভাবে লেখার কথা ভেবেছিলুম সেভাবে লেখা হয়নি। সুতরাং 'অসমাপিকা' অনন্য। তার প্রতি আমার একটু দুর্বলতাও আছে। সে আমার তারুণ্যের স্মৃতিচিহ্ন। কাঁচা হাতের লেখায় কাঁচা আমের স্বাদ।

দুই

বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan ; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস্ লস্ট রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্যাসত্য।

গোড়াতে আমার সংকল্প ছিল তাদের নিয়ে আমিও একখানি এপিক রচনা করব, কিন্তু পদ্যে নয় গদ্যে, যেহেতু আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। গ্রন্থের যুগ্মনায়কের নাম রাখতুম সত্য এবং অসত্য। কিন্তু অমন নাম কোনো পিতামাতা রাখেন না। অতএব

সুধী ও বাদল। নারীবর্জিত হলেই ভালো হত। কিন্তু নায়িকাহীন কাব্য হয় না। অতএব উজ্জয়িনীর অবতারণা। সত্য এবং অসত্য উভয়ের আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় দোলাবে। সে যেন সংকটারূঢ় মানবাত্মা। 'সত্যাসত্য' এপিক তথা রূপক হবে।

আইডিয়াটিকে মগজ থেকে নামিয়ে দেখা গেল, বাদল সুধী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল, গঙ্গা ধাবিত হল তৃতীয় দিকে। কোথায় রইল তাদের বিরোধ, সুধী হল বাদলের দাদা। কোথায় রইল তাদের প্রেম, বাদল উজ্জয়িনীকে টানল না, সুধীও তার প্রতি নিরনুরাগ। এই তিন নদনদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়ল বহু উপনদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটি শক্তি নয়—ব্যক্তি।

রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল। এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাবনিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানবসংসার নয়, নক্ষত্রনীহারিকার সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়পারম্পর্য, অণু-পরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়কনায়িকা তিনজনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইনটুইশনের মার্গ, বাদল ইনটেলেক্‌টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিনজনেরই আকাঙক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়। ওদের স্বভাবে কৃত্রিমতা নেই। এপিকের নায়কনায়িকা হওয়ার যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা পুরা মাপের মানুষের চাইতে মাথায় উঁচু।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যদি হয় এপিক, উপন্যাসের সঙ্গে এপিকের প্রভেদ কোথায়? উত্তর, এপিকমাত্রেই উপন্যাস, হয় পদ্যে নয় গদ্যে। কিন্তু উপন্যাসমাত্রেই এপিক নয়। অর্থাৎ উপন্যাস বহু প্রকার। তার এক প্রকার হচ্ছে এপিক। এপিকের লক্ষণ নায়ক-নায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ত্ব ; তাদের জগতের বিস্তার ও জীবনের অতিমর্ত্যতা। এর উদাহরণ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ। আর এক প্রকার হচ্ছে চরিত্র-চিত্রশালা। বিচিত্র চরিত্রের ভিড়, জনতার কলকোলাহল। এর উদাহরণ ডস্টইয়েভস্কির যে কোনও উপন্যাস। আর এক প্রকার হচ্ছে ঘটনাচক্র। নায়কনায়িকার ভাগ্য ঘটনার সঙ্গে ঘুরতে থাকে, কী হবে কী হবে করে পাঠকের মনটা ব্যাকুল। পাঠিকা হলে বইয়ের শেষ পাতাটা উলটে ধাঁধার জবাব দেখে রাখেন, নায়কনায়িকা বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মিলিত হয়েছেন, বিবাহের বিলম্ব নেই। এর উদাহরণ রেলওয়ে বুকস্টলে অগুনতি। বড়ো বড়ো লেখকেরও এই প্রকার উপন্যাস আছে। উদাহরণ 'Three Musketeers'। আর এক প্রকার হচ্ছে বিশ্বকোষ। তার পাত্রপাত্রী অবান্তর। সেটি যাবতীয় জাগতিক বিষয়ে গ্রন্থকর্তার চিন্তার পরিশীলন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ওয়েল্‌সের উইলিয়াম ক্রিসোল্ড্। আর এক প্রকার হচ্ছে প্রচারপত্রী। তারও পাত্রপাত্রী অবান্তর, তাদের উপলক্ষ করে গ্রন্থকার ধর্মপ্রচার করেন, সমস্যার সমাধান বলে দেন, আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন।

আধুনিক উদাহরণ Upton Sinclair-এর যাবতীয় উপন্যাস। আরও অনেক প্রকার আছে, তাদের মধ্যে একটি প্রকার সম্প্রতি বহুল আলোচিত হচ্ছে। তাকে বলতে পারা যায় সন্দর্ভ অথবা থীসিস্। লেখকের উদ্দেশ্য প্রচার নয়, প্রতিপাদন। তাঁর মনের ছাঁদ বৈজ্ঞানিকের, পদ্ধতি Objective উদাহরণ জেম্‌স্ জয়্‌সের 'Ulysses', মার্সেল প্রুস্তের 'A la recherche du temps perdu'।

ওপরে বলেছি, আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। নতুবা, ওই সমস্ত উপন্যাস গদ্যে লিখিত হয়ে কাব্য নাম ধারণ করত। প্রাচীন সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। তবে উপন্যাস বলে সাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট বিভাগ সেকালে ছিল না। এখনও উপন্যাসের সীমানা নিয়ে দাঙ্গা বাধে। সমালোচক মানা দিয়ে বলেন ওটা উপন্যাস নয়, প্রকাশক পাঠক পাকড়াবার ফন্দিতে মলাটের ওপর চেপে দেন উপন্যাস। লেখক বলেন আমি লিখেই খালাস, শ্রেণি-বিভাগ অপরে করুক ; পাঠক প্রকাশকের চাতুরির জন্যে লেখককে দায়ী করেন। পাছে আমার এই উপন্যাসের বেলা তাই হয় সে জন্য একটা অযাচিত জবাবদিহি করে রাখলুম।

উপন্যাসের সংজ্ঞা কিংবা সীমানা নির্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত, স্বয়ং বেদব্যাস তা করেননি। তবে তাঁর মহাভারত থেকে আমার 'সত্যাসত্য' পর্যন্ত উপন্যাসরূপে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে এমন যত গ্রন্থ গ্রথিত হয়েছে তাদের প্রাণবস্তু হচ্ছে গল্প। প্রক্ষিপ্ত কিংবা বিক্ষিপ্ত গল্প নয়, আদ্যোপান্ত একটি গল্পপ্রবাহ। পক্ষান্তরে এক রাশ ছোটোগল্পের একত্রীকরণও নয়. সব উপগল্পকে জড়িয়ে একটিমাত্র গল্প। যে উপন্যাসে একটি সর্বময় গল্প নেই সে উপন্যাস প্রাণবিহীন পিণ্ডবিশেষ। গল্পের গুণ আগ্রহকে জাগিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখা এবং আগ্রহের সঙ্গে জেগে থাকা। রাত ভোর হয়, রাজা তৃপ্তি পান, শেহেরজাদী মুক্তি পান। অতএব শুধু গল্প থাকলে চলবে না, গল্পের গুণ থাকা চাই। গল্প যেন শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে পারে। যে উপন্যাস পাঠকের আহারনিদ্রা হরণ করতে পারল না, যে নারী পুরুষের মনোহরণ করতে পারল না, তাকে শত ধিক্।

উপন্যাসের প্রাণ গল্প এবং গল্পের গুণ চমৎকারিতা। কিন্তু তাই সব নয়। তাই যদি শেষ কথা হত তবে ছোটোগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের প্রভেদ থাকত না। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটোগল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, যেন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাঁটলে সে ছোটোগল্প হয় না, ছোটোগল্পকে পল্লবিত প্রসারিত করলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ দ্বার খুলে দিয়ে বলে, 'বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়।' ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় আর বলে, 'পাঠক, যথেষ্ট দেখলে, আর দেখতে চেয়ো না।'

উপন্যাসকার ক্রমাগত সুতা ছাড়তে থাকেন. মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙায় তোলেন। ছোটোগল্পকার জাল ফেলে তখুনি তুলে নেন। ছোটোগল্প

হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময়সাপেক্ষ, তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে।

ওপরে যে বিশিষ্ট জগতের কথা বলা হল সে শুধু উপন্যাসের কিংবা ছোটোগল্পের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট জগৎ আছে। প্রকৃতপক্ষে ওই জগৎটাই সৃষ্টি। ভাষার কারিকুরি, ভাবের ঐশ্বর্য, ঘটনার ঘূর্ণি চরিত্রের বৈচিত্র্য—কিছুতেই কিছু হবে না, যদি একটি বিশিষ্ট জগতের আভাসটুকু অন্তত না থাকে। সে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জগতের মিল থাকবে কি থাকবে না, যদি থাকে কতখানি থাকবে, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। 'সত্যাসত্য' সম্বন্ধেও ওই তর্ক বাধতে পারে। কেউ কেউ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অংশ পড়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন, 'কই, বাদলের মতো কাউকে তো দেখিনি?' বাদল ছাড়া বাদলের মতো কাউকে আমিও দেখিনি সেটা ঠিক। কিন্তু বাদলকে আমি দেখেছি, হয় তো একমাত্র আমিই দেখেছি। তবে দেখারও প্রকারভেদ আছে। বাদলকে দেখেছি ও ট্র্যাফলগার স্কোয়ার দেখেছি, দু-ই যথার্থ হলেও দুই সমার্থক নয়। বাদলকে নিজের মধ্যে দেখেছি, পরের মধ্যে দেখেছি, বহু স্থানে বহু অবস্থায় দেখেছি। ট্র্যাফলগার স্কোয়ারকে দেখেছি, ট্র্যাফলগার স্কোয়ারে। দু-রকম দেখাকেই পাঠককে দেখিয়েছি। যথাস্থানে ও যথানুপাতে দেখালে এমন জিনিস নেই যা দর্শনীয় হয় না। সকলের চোখে দেখা এই জগৎটার যাবতীয় বস্তুকে আমি যে perspective থেকে যে proportion-এ দেখি তাই আমার দেখা ও সেই দেখার থেকে আমার উপন্যাসের জগৎ। আমার উপন্যাসের জগতে বিচরণ করতে করতে অনেক কিছু পাঠকের মনে ধরবে না অনেক কিছু ধরবে, যেমন ভগবানের জগতেও। কিন্তু সৃষ্টি যদি করে থাকি, ফাঁকি যদি না দিয়ে থাকি, তবে ও জগৎকে এ জগতের মতো স্বীকার করে নিতেই হবে।

শেষ প্রশ্ন, আর একটা জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? ভগবান তাঁর জগৎ কী জন্যে সৃষ্টি করলেন প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে উত্তরের আশা রাখি।

ঔপন্যাসিকের বক্তব্য, উপন্যাস আর্টের শাখা। বিচার করতে হয়, আর্টের উদ্দেশ্য কী। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য জীবনকে প্রতিবিম্বিত করা (holding the mirror up to life)। তাই যদি হয় তবে কাজটা ছেলেখেলা। আয়নায় যাকে ধরা যায় সে প্রতিচ্ছায়া, আয়না হচ্ছে ছায়াধরা ফাঁদ। সোজাসুজি জীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে আয়নায় তার আদল দেখব কেন? আসল থাকলে নকল কী হবে? কেউ কেউ বলেন, তা নয়, আর্টের উদ্দেশ্য জীবনের ব্যাখ্যা করা, আর্ট হচ্ছে জীবনের ভাষ্য। অর্থাৎ জীবন অতি দুর্বোধ্য, পুঁথি, আর্টিস্ট ব্যতীত অপরে তার অর্থ করতে অপারগ। আর্টিস্ট হলেন জীবনশাস্ত্রের শঙ্করাচার্য। কিন্তু আর্টিস্টের ওই দাবি দার্শনিকের দাবির সঙ্গে সমান। মামলা বাধলে বিচারকের রায় দার্শনিকের পক্ষে যাবে।

তৃতীয় এক দলের ধারণা, আর্টের অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে মানবের জীবন হবে দেবতার জীবন। আর্টিস্ট হবেন apostle ; তিনি উপনিষদের ঋষির মতো উদাত্ত স্বরে

ঘোষণা করতে থাকবেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—যতক্ষণ শ্রোতার কর্ণপটাহ অবিভক্ত থাকে। রক্ষা এই যে, কোনো সত্যকার আর্টিস্ট কোনো দিনই এ ব্রত স্বীকার করেননি ; যাঁরা করেছেন তাঁদেরকে আর্টিস্ট বলে গণ্য করা হয়নি।

আমি বলি, জীবন যেমন ভগবানের সৃষ্টি, আর্ট তেমনই মানবের সৃষ্টি। জীবনের উদ্দেশ্য যা, আর্টের উদ্দেশ্যও তাই। সে উদ্দেশ্য স্রষ্টার আত্মপ্রকাশেচ্ছা পূরণ, স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্যদান। জীবন বড়ো, না আর্ট বড়ো, এমন প্রশ্নও উঠেছে। শুনে হাসি পায়। রাধা বড়ো, না কৃষ্ণ বড়ো এ সম্বন্ধে শুকশারীর কলহ সুপরিচিত। আমি বলি আর্ট না থাকলে জীবনমহীরুহ পুষ্পপল্লবহীন, রিক্ত। জীবন না থাকলে আর্ট আকাশকুসুম। জীবন এবং আর্ট মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা, যেন ওরা দুই নয়, এক। যেন জীবন হচ্ছে আর্ট, আর্ট হচ্ছে জীবন। তবু ওদের প্রকৃতি ভিন্ন, যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি। পরস্পরের অনুকৃতি ওদের সম্বন্ধে মাধুর্য হ্রাস করে, পরস্পরকে উন্নত করা ওদের চোখের অগোচরে ঘটে, পরস্পরের কাছে ওরা অর্থসমন্বিত।

তিন

পাটনা বিভাগের কমিশনার মিস্টার বি. সি. সেন, আই. সি. এস. একদিন মিন্টো হিন্দু হস্টেল পরিদর্শনে আসেন। সঙ্গে পাটনা কলেজের প্রিন্সিপাল মিস্টার ই. এ. হর্ন, আই. ই. এস.। হস্টেলনিবাসী ছাত্রদের জড়ো হতে বলা হয় একটা বারান্দায়। বলা হয় কাগজ পেনসিল নিয়ে আসতে। প্রিন্সিপাল বলেন আধঘণ্টার মধ্যে ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ লিখতে। বিষয় নির্দেশ করবেন কমিশনার সাহেব। যার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে তাকে তিনি কুড়ি টাকা পুরস্কার দেবেন।

আমরা ছাত্ররা লিখতে বসে যাই। কমিশনার ও প্রিন্সিপাল অপেক্ষা করেন না। লেখা সংগ্রহ করার ভার দিয়ে যান হস্টেল সুপারিন্টেনডেন্টের ওপর। আর সকলের মতো আমিও লেখা সেরে তাঁর হাতে দিই। বিষয়টা আমার মনে পড়ছে না। এটা ১৯২৪ সালের কথা। প্রিন্সিপাল বলে পাঠান পুরস্কারটা আমাকেই দেওয়া হবে। আমি কি নগদ টাকা নেব না সেই দামের বই নেব? আমি বই চাই ও বইয়ের নাম দিই। রম্যাঁ রলাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর ইংরেজি সংস্করণ 'জন ক্রিস্টোফার'। পাটনায় কমলা বুক ডিপোর একটি শাখা ছিল। সেখানে পাওয়া যাচ্ছিল। প্রিন্সিপাল খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন চার খণ্ডে সমাপ্ত সেই সংস্করণের দাম পঁচিশ টাকা। তখন তিনি কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করেন উনি কি অনুগ্রহ করে আর পাঁচটা টাকা বাড়িয়ে দিতে পারবেন? তাই হয়। চারখানা বই পেয়ে আমি আহ্লাদে আটখানা হই।

সেই বয়সে 'জন ক্রিস্টোফার'ই ছিল আমার উপন্যাসের আদর্শ। কখনও যদি উপন্যাস লিখতে হয় তো সেই আদলের উপন্যাস লিখব। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত আমি বিশ বছর বয়সে নিইনি, নিতে আরও পাঁচ বছর লেগেছে। ততদিনে আমি বিলেত থেকে

ফিরেছি ও ইতিমধ্যে 'পথে প্রবাসে' লিখে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছি। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে একটি উপন্যাস চান। তাঁরই প্রবর্তনায় আরম্ভ করে দিই 'সত্যাসত্য'। চরিত্রদের নামকরণের সময় আমার অবচেতন মনে কাজ করছিল বি. সি. সেন, আই. সি. এস. মহোদয়ের নাম। তাঁর পুরো নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, আমার নায়কের নাক বাদলচন্দ্র সেন। সংক্ষেপে বি. সি. সেন। সে হতে চায় বিলেত গিয়ে পার্লামেন্টের মেম্বর। বি. সি. সেন, এম. পি.।

আপনারা হাসছেন যে। পার্সিরা তিন তিনবার এম. পি. হতে পারে। দাদাভাই নওরোজী মানচেরজী ভাউনগরী, শাপুরজী সাকলাতওয়ালা। বাঙালি একবারও হতে পারে না? লালমোহন ঘোষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখন থেকেই আঙুরফল টক। বাঙালি আর চেষ্টা করবে না। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আশাই করেননি। ব্রিটিশ সরকারই তাঁকে ব্যারন উপাধি দিয়ে হাউস অভ লর্ডসে বসায়। ব্যারন সিন্‌হা অভ রায়পুর। হ্যাঁ, হাউস অভ লর্ডসের মেম্বাররাও এম. পি.। কেবল হাউস অভ কমনসের মেম্বাররাই নয়।

খবরটা যখন পাটনায় পৌঁছল বাদল তখন স্কুলের ছাত্র। তার প্রাইভেট টিউটর তারাপ্রসন্ন গুপ্ত মুচকি হেসে বলেন, 'পার্সিরা বড়োজোর ব্যারনেট হতে পেরেছে। কিন্তু ব্যারন হওয়া অত সহজ নয়। সে এক বাঙালিই পারে। একজন বাঙালি যা পেরেছে আর একজন বাঙালিও তা পারবে, যদি বিলেত যায়, ব্যারিষ্টার হয়, তারপর কিংস কাউনসেল, তারপর প্রিভি কাউনসিলার, তারপর লর্ড। দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়।'

কে জানত সেই লর্ড সিন্‌হা, একদিন বিহার ওড়িশার গভর্নর হয়ে পাটনায় আসবেন! বাদল তখনও স্কুলে। প্রাইভেট টিউটর তারাপ্রসন্ন বাবু আবার মুচকি হাসেন। বলেন, 'উনিই কি শেষ বাঙালি গভর্নর?' এমনভাবে বাদলের দিকে তাকান যেন লর্ড সেন আসামের গভর্নর এখন থেকে স্থির হয়ে রয়েছে। তিনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। বাদল তা করে না। বাদল নিজেই স্থির করবে সে বড়ো হয়ে কী হবে। আপাতত এই পর্যন্ত স্থির, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে বিলেত যাবে। তার পূর্ব শর্ত যে পিতার ইচ্ছায় বিবাহ একথা তার মনে উদয় হয়নি। দারুণ শক পায় যখন বি. এ. পাস করার পর শোনে বিয়ে পাস করতে হবে, নয় তো বাবা টাকা দেবেন না। মেম বিয়ে করার সংকল্প তার ছিল না। বিয়ে না করে বিলেত যেতে দিলে যে সে মেম বিয়ে করে বসত সেটা তার বাবার ভুল ধারণা। কী করবে, উপায়ান্তর নেই দেখে সে বিয়ে করতে রাজি হয়। বিয়েটা তার কাছে একটা পাসপোর্ট বই আর কিছু নয়। পাসপোর্ট দেয় গভর্নমেন্ট, বিয়ে দেন বাবা। আপনারা বলবেন তাঁর বিলেত যাওয়া এমন কী জরুরি ছিল যে ভালো না বেসে বিয়ে করতে হল। চাকরি বাকরি করে টাকা জমিয়ে নিজের খরচে বিলেত যেতে পারত। কিংবা আরও পড়াশুনা করে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে। কিংবা আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে সরকারি খরচে। বিশ বছর বয়সেই বিলেত যেতে হবে এমন কী দায় পড়েছিল? এর উত্তর বাদলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুধী যাচ্ছিল। সুধী গেলে বাদলও যাবে, এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু সুধী কি নিজের যাওয়া দু'বছর পেছিয়ে দিতে পারত না? না। সে সাবরমতী গিয়ে শুনতে পেয়েছিল গান্ধীজী গণসত্যাগ্রহের জন্যে তৈরি হচ্ছেন। বছর দু'তিনের মধ্যে ঝাঁপ দেবেন। সেবারের মতো এবারেও তাঁর বচন এডুকেশন ক্যান ওয়েট, স্বরাজ ক্যান নট। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে বছর খানেক জেলে কাটিয়ে ও আর এক বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সে কলেজে ফিরে আসে। তখন বাদলকে পায় সহপাঠীরূপে। কলেজে ফিরে এলেও সে গান্ধিজীর নির্দেশে গঠনকর্ম করে ও মনেপ্রাণে সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হয়। বি. এ. পাশ করার পর সে এম. এ. পড়তে চায় না, পাছে সত্যাগ্রহের আহ্বানে পড়ার ব্যাঘাত হয়। পরিবর্তে সেই সময়টা সে ইউরোপ ঘুরে আসতে চায়, বিশেষ কোনো প্রয়োজনে নয়, জীবনদর্শনকে উদারতর করার জন্যে। সে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নয়। স্বজাতির চেয়ে মানবজাতি বড়ো। ইউরোপ মানবজাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু ইউরোপীয় ডিগ্রি সে চায় না। ডিগ্রির জন্যে পড়তে গেলে আবার কখন সত্যাগ্রহের আহ্বান আসবে, পড়ার ব্যাঘাত হবে। তবে কলেজে গিয়ে পড়াশুনা না করলেও ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে বসে পড়াশুনা করবে।

বাদলের বিবাহ কীভাবে হয়েছিল তার একটা বিবরণ দিতে পারতুম 'সত্যাসত্য' আরম্ভ করে, যদি তার আগে শোনা থাকত আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধুর মুখে তাঁর পুত্রের বিবাহের বিবরণ। বাদলের বিয়ে ১৯২৭ সালে, আর বন্ধুপুত্রের বিয়ে ১৯৫০ সালে। ভবিষ্যতে যেমনটি ঘটবে তেমনটি অতীতেই ঘটে গেছে। বন্ধু বলেন, 'প্রথমেই স্থির করলুম কোন্ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেব। তারপর দিন স্থির করলুম। সব ঠিকঠাক করে ছেলেকে টেলিগ্রাম করলুম, কাম শার্প। ইয়োর ম্যারেজ। ফ্রাইডে ফিফটিন্থ। ছেলে এসে এমন ভাব দেখায় যেন আকাশ থেকে পড়েছে। জানতে চায় কার সঙ্গে বিয়ে। কেমন দেখতে। তাকে কি দেখতে পাইনে? আমি আশ্বাস দিই, মেয়েরা যেমন হয় তেমনই দেখতে। তোমার বউ, তুমি দেখবে বইকি। আর দুটো দিন সবুর কর। শুভদৃষ্টির সময় দেখবে। ছেলের কী রাগ। কিন্তু আমিও তেমনই বাপ। আমার বউকে আমি দেখতে পাইনি শুভদৃষ্টির আগে। আমার ছেলেকে কেন দেখতে দেব? বাপের পছন্দই ছেলের পছন্দ।'

এমনই এক টাইরান্ট ছিলেন বাদলের বাবা মহিমচন্দ্র। অথচ পরম স্নেহশীল পিতা। ছেলে যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। মা মরা ছেলে, তিনিই তার মা, তিনিই তার বাবা। কিন্তু ছেলের বিয়ের সময় টাইরান্টের মতো আচরণ। তার ফল কী হল তা আমার উপন্যাসের ছয় খণ্ডে দেখানো হয়েছে। উজ্জয়িনীর কী দোষ? তবু তাকেই হতে হল পতির প্রেম থেকে বঞ্চিত। হত না, যদি পূর্বরাগের সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকত। তখনকার দিনের সমাজে সেটা ছিল নির্লজ্জ স্বৈরাচার। এখনও কি বিয়ের আগে বিশ্বাস করে মিশতে দেওয়া হয়?

এই উপন্যাস লেখার আগে আমি টুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স' পড়েছি। অবচেতন মনে কতকটা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। নানা বিষয়ে পিতাপুত্রের মতভেদ ও দ্বন্দ্ব একটা চিরন্তন সত্য। পতিপত্নীর মতভেদ ও দ্বন্দ্বও তেমনই। বিকাশে বাধা দিলে বিরোধ বাধে। বিকাশের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। সেই জন্যে চাণক্য বলে গেছেন ষোল বছর বয়সের পর পুত্রের সঙ্গে মিত্রের মতো আচরণ করবে। যেটা তিনি বলে যাননি সেটা আমরা বলতে পারি। স্ত্রীর সঙ্গেও স্বাধীনার মতো আচরণ করবে।

'সত্যাসত্য' জীবনদর্শনের বই। তিনজনের তিন রকম অন্তর্জীবনই এর উপজীব্য। সিরিয়াসকে কমিক করতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার আমাকে বলেন, বইখানা বড়ো বেশি গুরুভার হয়ে যাচ্ছে। লোকে নিতে চাইছে না। একটুখানি লঘুভার না করলে বই কাটবে কী করে? আর্থিক দায় তো আমার নয়, তাঁর। পাঁচখণ্ডে সমাপ্য উপন্যাস তো আর কেউ কখনও লেখেননি। কেউ কখনও প্রকাশ করেননি। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্য যেমন আমাকে লিখতে অনুপ্রাণিত করে তেমনই গোপালদাস মজুমদারের আনুকূল্য আমাকে আমার উপন্যাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। পাঁচখণ্ড ক্রমে ছয় খণ্ডে পর্যবসিত হয়। অসীম ধৈর্য গোপালদাসবাবুর। লাভ বলতে বিশেষ কিছু হয়নি তাঁর বা আমার। তাঁর বিশ্বাস ছিল এ গ্রন্থ স্থায়ী হবে। আমারও।

তাঁকে খুশি করার জন্যে আমাকে হাস্যরসের অবতারণা করতে হয়েছে। বিলেত থেকে বুলডগ আমদানি করতে হয়েছে বৃন্দাবনে। বিভূতিকে বানাতে হয়েছে ডিটেকটিভ। কৌতুককর ব্যাপার। পরামর্শ নিতে হয়েছে স্ত্রীর। তৃতীয় খণ্ড 'কলঙ্কবতী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো সিরিয়াস হয়নি। কোনো বিদগ্ধ পাঠক যদি বলেন রসাভাস ঘটেছে তা হলে আমি নাচার। আমার জবাবদিহি এই যে শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলিতেও কমিক রিলিফ থাকত। না হলে দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি হত।

যাই হোক, তৃতীয় খণ্ডের পর আমি মনস্থির করি যে হাস্যকৌতুক আর নয়। গোপালদাসবাবুকেও বলি যে আমাকে আমার মতো করে লিখতে দিন। সমসাময়িক পাঠকই তো অন্তিম পাঠক নন। শেষ পাঠকের কথাও ভাবতে হবে। আলটিমেট রিডার কি আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি আমি ধ্রুপদের সঙ্গে টপ্পা মিশিয়ে ফেলি? 'দুঃখমোচন'-এ আমি আমার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মূল সুরে ফিরে যাই। বাদল, সুধী বা উজ্জয়িনী কেউ তখন হালকা মেজাজে নয়। কাহিনীটা যদিও বিশের দশকের শেষ পাদের তবু রচনাটা ত্রিশের দশকের। ত্রিশের দশকের ছায়া পড়েছে লেখকের মনের ওপর। সেটা যেন চন্দ্রগ্রহণের সময় রাহুর ছায়া। রাহু মানে হিটলার, মুসোলিনি ও ফ্রাঙ্কো মিলিত অশুভ শক্তি।

'কলঙ্কবতী' পড়ে কোনো পত্রিকা চেঁচিয়ে ওঠে, 'অশ্লীল'! 'অশ্লীল'! বিশ্রী ভাষায় গালাগালাজ দেন। যেটুকুতে তাঁদের আপত্তি সেটুকু না থাকলে নয়। কাহিনীর সত্যতার জন্যে সেটুকুর প্রয়োজন। জীবনে তো ওর চেয়েও আপত্তিকর ঘটনা ঘটে। আদালতকে

তো সে সব ঘটনার খুঁটিনাটি শুনতে হয়। তখন আদালতে বসাই তো ছিল আমার নিত্য কর্ম। নারীহরণ ও নারী ধর্ষণের মামলা কি কম শুনতে হয়েছে? সমাজে বিস্তর কলঙ্ক আছে। নিষ্পাপ নারীর ভাগ্যেও তথাকথিত অশ্লীল দুর্ভোগ জোটে। উজ্জয়িনীকে বাঁচিয়ে দেয় তার বিদেশী অন্তর্বাস। কারও কথায় আমি বাদসাদ দিইনি।

জেমস জয়েস বা ডি. এইচ. লরেন্স যাঁরা পড়েছেন তাঁরা উলটে আমাকে দোষ দেবেন। বলবেন আমি এত ভীতু কেন? বুক ফুলিয়ে একটা বিশদ বর্ণনা দিতে পারতুম। লেখকের কর্তব্য লক্ষ্যে অবিচল থাকা। আমার লক্ষ্যে আমি অবিচল থেকেছি কি না সেটাই বিবেচ্য। জয়েস বা লরেন্সের লক্ষ্য আমার লক্ষ্য নয়। তাঁদের উপন্যাসের সমস্যা আমার উপন্যাসের সমস্যা নয়। নিষিদ্ধ বিষয়ের যেটুকুতে আমার প্রয়োজন সেইটুকুই আমি নিয়েছি। নিষেধ উঠে গেলেও যে নিতুম তাও নয়।

'দুঃখমোচন' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। তার দশ বছর বাদে তৎকালীন বঙ্গীয় বিধানসভার সরকার মনোনীত সদস্য কে. সি. রায়চৌধুরী একটি প্রশ্নের নোটিশ দেন। নোটিশটিতে ছিল অন্নদাশঙ্কর রায় আই. সি. এস. প্রণীত 'দুঃখমোচন' নাটক উপন্যাস কেন অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ হচ্ছে না? নোটিসের কপি আমাকে পাঠানো হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে। আমার উত্তর পড়ে সরকার বিধানসভায় উত্তর দেবেন। আমি তো ভেবে পাইনি 'দুঃখমোচনে'র কোথায় অশ্লীলতা আছে। কেউ তো কোথাও তার বিরূপ সমালোচনা করেননি। ঝাঁঝালো জবাব দিই। কিন্তু অধিবেশনের আগেই পার্টিশন হয়ে যায়। ইংরেজ রাজত্বের অবসান।

চার

ছয় খণ্ডের উপন্যাস 'সত্যাসত্য' লিখতে আমার বারো বছর লেগেছিল। সেই বারোটি বছর আমার যৌবনের সেরা অংশ। বয়স তখন পঁচিশ থেকে সাঁইত্রিশ। সেই বারো বছরের সাত বছর কেটেছিল পূর্ববঙ্গে; আর বাকিটা পশ্চিমবঙ্গে। অন্যদিক থেকে হিসাব করলে আট বছর শাসন বিভাগে। আর চার বছর বিচার বিভাগে।

বিচার বিভাগে যেতে আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না, যদিও সেই বিভাগেই অবসর বেশি। শাসন বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিল লোকজনের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার প্রচুর সুযোগ। লাটসাহেব থেকে আরম্ভ করে গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত সকলের সঙ্গে মিশেছি। রাজা মহারাজা নবাব বাহাদুর থেকে আরম্ভ করে কৃষক প্রজা পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই ছিল আমার যোগাযোগ। পুলিশের তো কথাই নেই, টেররিস্টদের সঙ্গে ছিল আমার সম্পর্ক। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও সাইকেলে চড়ে, কখনও হাতির পিঠে, কখনও হাউসবোটে, কখনও পালকিতে করে, কখনও টমটম গাড়িতে চেপে গ্রামেগঞ্জে সফর করেছি। একালের মতো ভালো রাস্তা ছিল না। মোটরের দৌড় বেশি দূর নয়। রাত্রে তাঁবুতে বাস করতে হত। তাতেই ছিল আমার বিশেষ আনন্দ। একবার কিন্তু পদ্মার চরে তাঁবু খাটিয়ে নাকাল হতে হয়েছিল।

বাঁচব না লিখব? এই ছিল প্রশ্ন। যাঁরা জাত লিখিয়ে তাঁরা হয়তো বলতেন, লিখব। আমি জাত লিখিয়ে নই। আমি বলতুম, বাঁচব। আমি প্রাণ ভরে বেঁচেছি, সময় জুটলে লিখেছি। লিখতুম, প্রকাশকের কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিতুম। ডাকযোগে প্রুফ আসত। প্রুফ ফেরত পাঠাতুম। বই শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের হাতে দেওয়া কোনো খণ্ডের বেলা হয়ে ওঠেনি। গোপালদাস মজুমদার অপেক্ষা করার পাত্র ছিলেন না। তাঁর অনুরোধ ছিল যখন যতটুকু লেখা হবে তখন ততটুকু প্রেসে দিতে হবে। লেখককে রিভিসনের সময় দিতে তিনি নারাজ। কাজেই ছয় খণ্ডের পাঁচটি খণ্ডই রিভাইজ করা হয়নি। ব্যতিক্রম প্রথম খণ্ড। সেটি ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

কথা ছিল এই উপন্যাস পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হবে পাঁচ বছরের মধ্যে। কিন্তু আমার জীবনযাত্রা আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কোনো মতে 'দুঃখমোচন' অবধি লিখে আমি আর এগোতে পারিনে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকলে হয়তো পারতুম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে প্রমোশন দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রমাণ করতে চাই যে উক্ত পদের আমি উপযুক্ত। সেই যে মাথায় ভূত চাপে সে ভূত আর নামতে চায় না। আমি তিনটি বছর বন্য হংসীর পশ্চাদ্ধাবন করি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে জজ করে দেওয়া হয়। জজের পদে দৌড়ঝাঁপ নেই। সময় মেলে। সময় পেয়ে 'মর্ত্যের স্বর্গ' লিখি। সেই খণ্ডেই দাঁড়ি টানার কথা। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি কাহিনী ফুরায় না। তাই লিখি 'অপসরণ'।

মূল পরিকল্পনায় অন্তিম খণ্ডের নাম ছিল 'মর্ত্যের শর্ত'। বলাবাহুল্য, স্বর্গ আর শর্ত সমার্থক নয়। আমি লিখতে চেয়েছিলুম এক, হয়ে উঠল আর এক। কেন, তার কারণ খুলে বলি।

প্রাচীনদের বিশ্বাস এই মর্ত্যভূমি দু'দিনের জন্যে। এখানে কেউ স্থায়ীভাবে বসত করতে আসে না। মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যায়। অথবা নরকে। খ্রিস্টানদের মতে চিরকালের জন্যে। হিন্দুমতে যতদিন পুণ্যবল ক্ষয় না হয় ততদিন স্বর্গবাস, তার পরে পুনর্জন্ম। অথবা যতদিন পাপকর্মের ফল ভোগ সারা না হয় ততদিন নরকবাস, তারপরে পুনর্জন্ম। মর্ত্যে না এসে স্বর্গে বা নরকে যাওয়া সম্ভব নয়। মানুষকে জন্মাতেই হবে, মরতেই হবে, তারপরে স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি। মর্ত্যের শর্ত হচ্ছে স্বর্গের জন্যে প্রস্তুতি। অনবরত পুণ্যসঞ্চয়।

পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক সম্বন্ধে প্রাচীনদের বিশ্বাস আধুনিকদের কাছে যুক্তিসহ নয়। আধুনিকরা সাধারণত সংশয়ান্বিত। কেউ কেউ সংশয়বাদী। আমিও ক্রমে ক্রমে সংশয়ান্বিত হই। যুগটা বিশ্বাসের পরিবর্তে মতবাদের। ইডিওলজির। মতভেদ থাকলেও সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, গান্ধিপন্থী প্রভৃতি সকলেই চান মর্ত্যভূমিতেই স্বর্গ গড়ে তুলতে। রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'ভারতেরে সেই স্বর্গে করো উপনীত।' মানুষ তার আপন

শক্তিতে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করতে পারে এরূপ ধারণা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। বার বার ব্যর্থ হতে হতেই মানুষ স্বর্গ রচনা করবে। শ্রীঅরবিন্দ তো মনে করেন মানব একদিন অতিমানব হবে। বানর থেকে যেমন মানব তেমনই মানব থেকে অতিমানব। দেবতা বলতে পারা যাচ্ছে না, কারণ অতিমানবেরও মৃত্যু আছে, সে দেবতার মতো অমর নয়।

ঈশ্বরের স্থান নিতে চায় মানুষ। হতে চায় মর্ত্যের নিয়ন্তা। মৃত্যুকে এড়াতে না পারলেও পেছিয়ে দিতে পারবে। বিজ্ঞান তাকে ব্যাধিমুক্ত করতে সক্ষম। জরাকেও পরাস্ত করতে।

ওদিকে প্রত্যেকটি ইডিওলজিই হচ্ছে ফাইটিং ইডিওলজি। স্বর্গ জয় করবার জন্যে সংগ্রাম অত্যাবশ্যক। এ সংগ্রাম সাধারণত সহিংস। যুদ্ধ বা বিপ্লবে মানুষ যদি মরেই গেল তবে স্বর্গ ভোগ করবে কে ইহলোকে? তা হলে কি আবার সেই পরলোকের ভরসায় মরবে? না, তা নয়। মরতে হলে মরতে হবে উত্তরপুরুষের জন্যে। তারাই স্বর্গ ভোগ করবে। চিরকাল না হোক দীর্ঘকাল। না, নরক ভোগ নয়। নরক লুপ্ত হবে শোষক শ্রেণীর নিপাতের সঙ্গে সঙ্গে। কিংবা প্রভু শ্রেণীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু পূর্বপুরুষের মনোনীত স্বর্গ উত্তরপুরুষের মনের মতো হবে কি না তা বলতে পারে? পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষেরও এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। পিতার মনোনীত পুত্রবধূ পুত্রের মনের মতো নয়। তাই নিয়েই তো উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট। পূর্বপুরুষদের কাছে যা স্বর্গ উত্তরপুরুষের কাছে তা হয়তো সোনার খাঁচা। তখন সেই খাঁচা থেকে পরিত্রাণের উপায়ই খুঁজতে হয়। খাঁচাটাকে মেনে নিয়ে সোনাকে প্লাটিনামে রূপান্তরিত করেও মুক্তি নেই। ন বিত্তেন হি তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। আধুনিক সমাজপিতাদের চিন্তাটাই বিত্তময়ী চিন্তা। বিত্তহীনকে তাঁরা বিত্তবানে পরিণত করবেন, নিম্নবিত্তকে, মধ্যবিত্তে, মধ্যবিত্তকে উচ্চবিত্তে। সকলেই উচ্চবিত্ত হলে সকলেরই স্বর্গসুখ।

তাই যদি হত তবে বুদ্ধকে গৃহত্যাগ করতে হত না। প্রেয়সী বধূকেও। আদরের পুত্রকেও। বিদ্যার জন্যে বোধির জন্যে, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে, মোক্ষের জন্যে, স্যালভেশনের জন্যে, নির্বাণের জন্যে, মানুষের অন্তরাত্মা ব্যাকুল। স্নেহের জন্যে, প্রেমের জন্যে, বন্ধুতার জন্যে আকুল। সৃষ্টি না করে মানুষের তৃপ্তি নেই। কাব্যে, নাটকে, নৃত্যে, চিত্রণে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে, অভিনয়ে, প্রসাধনে সে তার সৃষ্টিশীলতার স্ফূর্তি চায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্ভর করে তার এই সৃষ্টিশীলতার ওপর। তারপর মানুষকে দেওয়া হয়েছে করুণা ও বিবেক। নইলে সে অমানুষই থেকে যেত। যদিও জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে উন্নত। স্বর্গে কি দয়ামায়া, বিবেক বিবেচনা থাকবে না? বৈরাগ্যও থাকতে পারে।

মোট কথা, স্বর্গের সংজ্ঞা আমরা পুরোপুরি জানিনে। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। বিকাশের প্রক্রিয়া সমস্ত ক্ষণ চলেছে। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের। সামনে রয়েছে আরও কত শতাব্দী, সহস্রাব্দী। এই পৃথিবীও তো মানুষের একমাত্র বাসভূমি নয়। মানুষ মঙ্গলগ্রহে

পদার্পণেরও তোড়জোড় করছে। আশা করছে সেখানেও প্রাণধারণের পরিবেশ পাবে। ইতিমধ্যেই মহাশূন্যে স্টেশন স্থাপন করা হয়ে গেছে।

এত কিছুর পরেও প্রশ্ন উঠবে, 'যা দিয়ে আমি অমৃত না হব তা নিয়ে আমি কী করব?' এর উত্তর মর্ত্যের স্বর্গ নয়। স্বর্গের স্বর্গও নয়। মৈত্রেয়ী দেবতার অমরত্ব চাননি। বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধের স্থান দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে। স্বর্গও তাঁর কাছে তুচ্ছ। বৈষ্ণবদের কাম্য স্বর্গ নয়, বৈকুণ্ঠ, যেখানে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা। কোনো কোনো ভাগ্যবান তা ইহলোকেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। মৃত্যুর পূর্বেই। মৈত্রেয়ীও মৃত্যুর পূর্বেই অমৃত হতে চেয়েছিলেন। হয় তো ব্রহ্মাস্বাদ তাঁকে অমৃত করত।

আমি দার্শনিক সন্দর্ভ লিখতে বসিনি। 'সত্যাসত্য' দর্শন না হলেও একপ্রকার জীবনদর্শন। অপরিণত বয়সের, অপটু লেখনীর নিদর্শন। কিন্তু তখন যদি না লিখতুম আর কখনও লিখতে সাহস হত না। এটা দুঃসাহসের কাজ। তেমন দুঃসাহস প্রথম যৌবনেই সম্ভবপর। উপন্যাসে যাঁরা পরিপক্কতার প্রত্যাশী তাঁরা নিরাশ হবেন। এপিক উপন্যাসের দাবি আমি নিজেই প্রত্যাহার করেছি। তবে এরই মণিকোঠায় নিহিত আমার যৌবন।

---

* ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'অন্নদাশঙ্কর রায় রচনাবলী'র প্রথম চারখণ্ডে প্রকাশিত 'লেখকের ভূমিকা'র অত্যন্ত সামান্যকর্তিত পাঠ।

—সৌজন্যে : 'বাংলা বই' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি।

বিপ্লব ও রেনেসাঁস

এক

বিপ্লব কথাটা মানুষের ইতিহাসে নতুন নয়। কিন্তু আগেকার দিনে তার অর্থ ছিল রাষ্ট্রবিপ্লব। রাষ্ট্রবিপ্লব এখনো মাঝে মাঝে ঘটে। যেমন দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে। কিন্তু ইতোমধ্যে শব্দটির অর্থ পালটে গেছে। বিপ্লব বলতে আজকের দিনে বোঝায় রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক বিপ্লব। রাষ্ট্রিক না হ'য়ে সামাজিক হ'তে পারে না। সামাজিক না হয়ে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক হওয়াও উদ্দেশ্যহীন।

সামাজিক বিপ্লবই আসল লক্ষ্য। সমাজকে রাষ্ট্রের সাহায্যে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যার ফলে শোষিত শ্রেণীর জনগণ আর শোষিত হবে না। শোষকশ্রেণীর হাতে আর শোষণের উপায় থাকবে না। শোষকরা সুদ পাবে না, মুনাফা পাবে না, জমির খাজনা পাবে না, ফসলের ভাগ পাবে না, বাড়ির ভাড়া পাবে না। সম্পত্তির থেকে তাদের কোনো আয় হবে না। অপরকে তারা খাটাতে পারবে না। অপরকে খাটিয়ে তাদের কোনো লাভ হবে না। শোষকদের যা আছে তা থাকবে না, তার জন্যে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। দিলেও একহাতে যা দেওয়া হবে আরেক হাতে তা কেড়ে নেওয়া হবে। কিছুদিন বাদে দেখা যাবে শোষিতদের সঙ্গে শোষকদের কোনো তফাৎ থাকবে না। সকলের একই অবস্থা। তখন সমাজ হবে শ্রেণীশূন্য সমাজ।

গত পঞ্চাশ বছর আগে রাশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটে সেই বিপ্লবই একালের বিপ্লবীদের চোখে সামাজিক বিপ্লবের মানসচিত্র। কারো কারো মতে রাশিয়ানরা শোধনবাদী হয়েছে। শোধনবাদী হওয়াটা নাকি বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাওয়া। কিন্তু যারা একথা বলেছেন তাঁরাও কি শোধনবাদী না হয়ে চিরদিন থাকতে পারবেন? তাঁদের মতো বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আরেকদল অতিবিপ্লবী রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা চায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। দেখা যাচ্ছে সামাজিক বিপ্লবই শেষ কথা নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবও চাই। শ্রেণীশূন্য সমাজকে হতে হবে সংস্কৃতিশূন্য সমাজ। কতকগুলো লোক কেনই বা বেশি পড়াশুনা করবে, বিদ্বান হবে? তা হলে তো তারাই বড় বড় চাকরি ও বেশি মজুরি পাবে। তা হলে আর সাম্য হলো কি করে? শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হলে দু'টো শ্রেণী তো রয়েই গেল। মজুরিরও তারতম্য ঘটল।

সাম্যবাদীরা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন, সম্পত্তিশালীদের কোতল করেছেন বা খেদিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা, খনি ও খামার চালাবার

জন্যে অসংখ্য ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, পদস্থ সিভিল ও মিলিটারি কর্মচারী তথা বৈজ্ঞানিক নিয়োগ করেছেন। এঁরা যে পারিশ্রমিক পান তা সাধারণ কর্মীদের চেয়ে বেশি। এই নিয়ে চেকোস্লোভাকিয়াতে তীব্র মতভেদ দেখা যায়।

যতদূর জানতে পেরেছি চেকোস্লোভাকিয়ার সাধারণ শ্রমিকেরা যদি আঠারো শো পান তো ইঞ্জিনীয়াররা পান বাইশশো। এতে ইঞ্জিনীয়রদের আপত্তি। "আমরা এত লেখাপড়া করে, এতগুলো পরীক্ষা পাশ করে, ঘরের খেয়ে, ঘরের টাকা খরচ করে ইঞ্জিনীয়ার হলুম। আর ওরা ওসব কিছুই করল না, সে যোগ্যতাই ওদের নেই। তবু ওরা পাবে আঠারো শো, আমরা পাব বাইশশো। কতটুকু তফাৎ?"

এ সমস্যার সমাধান প্রত্যেকটি সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে করতে হবে। কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করলেও ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ার, কেরাণী ও পিওন একই পারিশ্রমিক পেতে পারে না। তারতম্য থাকবেই। সে তারতম্য চেকোস্লোভাকিয়ার মতো হলে ম্যানেজারদের আপত্তি হবে। তাদের সবাইকে লিকুইডেট করলে কলকারখানা অচল হবে। তেমনি ব্যাঙ্ক, সরকারী অফিস ও সেনাবিভাগ।

গায়ের জোরে কতকগুলি লোককে উৎখাত করা যায়। কিন্তু তারা যদি হয়ে থাকে দরকারি মানুষ তবে তাদের শূন্যতা পূরণ করবে কে? চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবও শূন্যতা পূরণ করতে না পেরে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। শূন্যস্থান তাঁরাই পূর্ণ করছেন যাঁরা কাজের লোক। লোককে কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক দিতে হবেই। অবশ্য তাঁরা যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করেন সে কথা আলাদা। স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকারের জন্য শত শত কর্মী এগিয়ে না এলে বিপ্লবী সমাজব্যবস্থাও মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্মুখীন হবে। সামাজিক বিপ্লবই শেষ কথা নয় চীনারা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে। সামাজিক সুবিচার বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে সাধারণ শ্রমিকদের মত সকলে জানে। তারা চায় সম্পূর্ণ সাম্য। কিন্তু সমাজে ইঞ্জিনীয়ার, ম্যানেজার প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। আছে বৈজ্ঞানিকেদরও প্রয়োজন। এঁরা চান পারিশ্রমিকের বৈষম্য। এঁদের কোতল করে বা খেদিয়ে যা হবে তা হবে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার এঁদের পাওনা এঁদের দিলে যেটা হবে সেটাও সমসমাজ নয়।

এতক্ষণ আমি বিদেশের কথা আলোচনা করলুম। এখন করি স্বদেশের কথা। এদেশে কারিগর বলে একটি শ্রেণী আছে। কামার, কুমোর, রাজমিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী প্রভৃতিকে নিয়ে এই শ্রেণী। এরা দিন আনে, দিন খায়। অপরে এদের পুরো পাওনার থেকে এদের কম দেয়, কিন্তু এরা অপরকে শোষণ করে না। কী এদের অপরাধ! কেন এই শ্রেণীটিকে উচ্ছেদ করা হবে? কেন এদের কল-কারখানার মজুরে পরিণত করা হবে? কেন এদের কামারশাল বা কুমোরশাল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে? এরা তো কাউকে খাটায় না, খাটিয়ে লাভ করে না। দক্ষতার নিরিখে কেউ হয়তো কিছু বেশি কামায়, কেউ কিছু কম। এটা কি পারিশ্রমিকের পর্যায়ে পড়ে না? মুনাফার পর্যায়ে পড়ে?

তেমন বিরাট একটি শ্রেণী আছে যারা নিজের জমি নিজের হাতে চাষ করে। এরা

জোতদার নয়, রায়ত। এক বিঘা দু'বিঘার মালিক। এদের মালিকানা কেড়ে নিয়ে এদের জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা কি শোষণের প্রতিকার? কার শোষণের প্রতিকার? এদের যদি বৃহৎ খামারের ক্ষেতমজুরে পরিণত করা হয় তা হলেই কি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে? দক্ষতা অনুসারে কেউ বেশি কেউ কম মজুরি পাবে না?

যে শ্রেণী শোষক তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়েছে। তাকে বিদায় দিলে হয়তো সামাজিক অন্যায় বিদায় হবে। কিন্তু যে শ্রেণী শোষক নয় তাকে তার মালিকানা থেকে বঞ্চিত করলে সেটা কি নতুন একটা অন্যায় হবে না? গায়ের জোরে এই নতুন অন্যায়টা যাঁরা করবেন তাঁরা কিছুকালের জন্যে সফল হতে পারেন, কিন্তু একদিন না একদিন তাঁদেরও জবাবদিহির কাল আসবে। ইতিহাস যে চিরকাল তাঁদের দিকে এটা একটা অন্ধ বিশ্বাস। বিপ্লব কথাটার যাদুমন্ত্রে সবাই সব সময় ভুলবে না। ভূমিহীন কৃষকদের জন্যে হয়তো বিপ্লব ছাড়া আর গতি নেই, কিন্তু যাদের অল্পস্বল্প ভূমি আছে আর সে ভূমি তারা নিজেরাই চাষ আবাদ করে বিপ্লব তাদের মালিকানা কেড়ে নিলে তারা তাকে স্বাগত জানাবে কি?

তেমনি ক্ষুদে দোকানদাররা। যারা নিজেরাই খাটে ;অপরকে খাটায় না। লাভ যা করে তা দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটায়। কাকেই বা এরা শোষণ করে? এদের দোকান রাষ্ট্রায়ত্ত করে এদের দোকানকর্মচারীতে পরিণত করলে সাধারণেরই এমন কী সুবিধে? গায়ের জোর ছাড়া এর সপক্ষে আর কী যুক্তি আছে? যতক্ষণ না এদের অস্তিত্বটা অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর হচ্ছে ততক্ষণ এদের গায়ে হাত দেওয়া উচিত নয়। দিলে সেটাও অন্যায়।

দুই

ষাট মণ ঘি পুড়বে, রাধা নাচবে। যদি না পোড়ে? তবে রাধা নাচবে না। এই কথাটাই আমাদের বলা হতো বিদেশী শাসনের আমলে। বিদেশী শাসন দূর হবে, তা হলেই ভারতে রেনেসাঁস হবে। নয়তো রেনেসাঁস হবে না। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যা হয়েছে তা কি রেনেসাঁস নয়? না, নয়।

এখন বিদেশী শাসন নেই। এখন শোনা যাচ্ছে, ধনতন্ত্র লোপ পাবে। তা হলেই রেনেসাঁস হবে। এই বত্রিশ বছরে তবে কী হয়েছে? কিছুই হয়নি। রেনেসাঁস এখনো সুদূর। কবে একদিন ধনতন্ত্র লোপ পাবে, তখন রেনেসাঁসের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। তার আগে আমাদের কর্তব্য ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আগেও যেমন শোনা যেত, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির উপর নির্ভর করছিল দেশের স্বাধীনতা। এখন নির্ভর করছে শ্রেণীশূন্য সমাজ।

রাশিয়া তো ষাট বছর হলো ধনতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত। রেনেসাঁসের ক্ষেত্র সেখানে প্রস্তুত। কিন্তু রেনেসাঁস কি এই ষাট বছরে হয়েছে? না তার আগে হয়েছিল? সেই স্বৈরতন্ত্রী আমলে। যখন ধনতন্ত্রও শ্রমিক-কৃষকের রক্ত শোষণ করছিল। পুশকিন,

গগল, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টয়েভ্স্কি, চেখভ, গর্কি এঁরা কবেকার লোক। পরবর্তী আমলে এঁদের মতো উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি কতটুকু হয়েছে? এঁদের চেয়েও উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি তো দূরের কথা। ষাট বছরেও যা সম্ভব হলো না তা কি একশো বছরেও সম্ভব হবে? হতে পারে, যদি সৃষ্টির উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়। অন্তত শিথিল করে দেওয়া হয়।

ইটালিতে যখন রেনেসাঁস হয়েছিল তখন চার্চের বিধিনিষেধ আলগা হয়েছিল, তাই লোকে খোলা মন নিয়ে বিজ্ঞানচর্চা শিল্পচর্চা সাহিত্যচর্চা করতে পেরেছিল। 'লোকে' বলতে লক্ষ লক্ষ লোক নয়, হাজার হাজার লোকও নয়। অগ্রণী যারা হয় তাদের সংখ্যা এক দুই তিন গুণতে হয়। হয়তো পাঁচশো কি ছ'শোতে শেষ হয়ে যায়। সওয়া শতকের মধ্যে মাত্র ছ'শো জনের নাম পাওয়া গেছে, যাঁদের নিয়ে রেনেসাঁস আরম্ভ। তারপরে চার্চের উৎপীড়নে শতখানেক বছরের জন্যে স্থগিত। রাজন্যরা তেমন কিছু নির্যাতন করেননি। বরঞ্চ উৎসাহই জুগিয়েছিলেন। তখন থেকে রেনেসাঁস হচ্ছে সত্য ও সৌন্দর্যের মুক্তি।

সৌজন্যে : 'পুরোগামী'

বিনুর পূর্ব কথা

একটি আলোকরেখা কোন সুদূর দ্যুলোক থেকে ভূলোকে এসে একদিন মানবরূপ ধারণ করে। সবাই তাকে বিনু বলে ডাকে। শুনতে শুনতে তারও নামটি আপনার হয়ে যায়। একটু একটু করে সেও ভুলে যায় যে একদা সে ছিল এক নামরূপহীন আলো-রেখা একটু একটু করে মনে রাখে সে একটি মানুষ, একটি পুরুষ, একটি ব্যক্তি।

এখানে কেউ তাকে চেনে না, সেও চেনে না কাউকে। কিন্তু চিনতে চিনতে সকলেই তার চেনা হয়ে যায়। পরিবারে ও পরিবারের বাইরে সকলেই তাকে চেনে। পাড়া ও পাড়ার বাইরে। যারা জন্মসূত্রে আত্মীয় নয় তারাও পাতানো আত্মীয় হয়। আর তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পশু পাখি গাছপালকেও বিনু আপনার করে নেয়, তারাও তাকে। ভালবাসা পেতে পেতে ও দিতে দিতে সে বড়ো হয়ে ওঠে।

অক্ষর পরিচয়ের পর থেকে সে যা হাতে পেত তাই পড়ত। পাঠ্য অপাঠ্য বিচার করত না। করতে জানত না। একদিন সে চার ছয় ছত্রের একটি গদ্য লিখে বাড়ির এক জায়গায় টাঙিয়ে রাখে। যার নজরে পড়বে সে-ই পড়বে, এটা জানত। এটা কিন্তু তার মনের কথা ছিল না। বিশেষ একটি মেয়ে পড়বে এটাই সে মনে মনে চেয়েছিল। মেয়েটি পড়বে আর ভাববে, বিনু তো সামান্য ছেলে নয়। আর কেউ যা পারে না বিনু তা পারে। সে কবিতা লিখতে পারে। সে একজন কবি।

মেয়েটির প্রশংসাই তার কাম্য ছিল। কিন্তু বিশেষ করে সেই মেয়েটির প্রশংসা কেন? তবে কি বিনু তাকে ভালোবাসত ও তার ভালোবাসা কামনা করেছিল? না, বছর এগারো কি বারো বছর বয়সে সে বাসনা জাগেনি। বাড়িতে অনেক কাব্যগ্রন্থ ছিল। স্কুলের লাইব্রেরীতে তো ছিলই! বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে পড়তে বিদ্যাপতির এ দুটি পদ তার মর্মে গেঁথে যায়ঃ

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তবু হিয় জুড়ন না গেল।"

আরো বড়ো হয়ে সেও লিখতে চেয়েছে এমনি দুটি কথাই। সে রূপমুগ্ধ। সে প্রেমবদ্ধ। একদিন সেও হয়ে উঠত একজন বৈষ্ণব কবি। সেই মধ্যযুগের মতো ; মধ্যযুগের পাশ্চাত্য প্রেমিক কবিদের সঙ্গেও বৈষ্ণব কবিদের কিছু সাদৃশ্য ছিল।

বিদ্যাপতির যেমন লছ্মা দেবী, চণ্ডীদাসের যেমন রামী, দান্তের তেমনি বিয়াত্রিস, পেত্রার্কের তেমনি লরা। নরনারীর সম্পর্ক পরিণয় মূলক নয়, প্রেমমূলক।

বৈষ্ণব সাধকরা তাঁদের সঙ্গিনীদের বলেন তাঁদের প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গেই নারীর তুলনা। ওতে নারীর মর্যাদা বাড়ে। বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণের চেয়ে রাধার মর্যাদা বেশি। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ত্রুবাদুর কবিদের চোখেও তাই। সেকালের নাইটরাও সেই মর্মে কবিতা লিখতেন। এক এক নাইটের আরাধ্যা এক এক লেডী। যার সঙ্গে পরিণয় সম্পর্ক নেই। কামগন্ধহীন প্রণয় সম্পর্ক। নিজের বিবাহিতা সহধর্মিনীকে উদ্দেশ্য করে প্রেম নিবেদন সেকালের কবিদের কারো রীতি ছিল না। তাঁদের মতে পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফূর্তি হয়, স্বকীয়াতে নয়।

কলেজ জীবনের পূর্বেই বিনু অনেক ইংরেজি বই পড়েছিল। কলেজ লাইব্রেরী লুট করে ইংরেজিতে অনূদিত বিস্তর ইউরোপীয় গ্রন্থ পাঠ করেছিল। দেশের দিক থেকে যা পাশ্চাত্য, কালের দিক থেকে তা আধুনিক। বিনু ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উপনীত হয়। সে কেবল ভারতের সন্তান নয় বিংশ শতাব্দীরও সন্তান। বিংশ শতাব্দীকে ভালো করে চিনতে হলে তার পশ্চিম মুখে যাত্রা করা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম ইউরোপই আধুনিকতার মুখ্য স্রোত। মুখ্য স্রোতে অবগাহন না করলে নয়। পশ্চিমের প্রতি তথা আধুনিকতার প্রতি সে এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে।

তখন সেটা অসহযোগ আন্দোলনের আমল। দেশ যতদিন না স্বাধীন হচ্ছে ততদিন দেশেই থাকতে হবে। যেতে হ'বে গ্রামে। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হ'বে। করতে হ'বে চাষবাস বা কারিগরি। লিখতে হ'লে জনগণের হৃদয় স্পর্শ করার মতো লেখা। তারা যেমন অকৃত্রিম, তাদের কথাবার্তা যেমন অকপট তেমনি অকৃত্রিম ও অকপট হ'বে তাদের জন্যে রচিত কাহিনী বা কবিতা। তাদের উপর তথাকথিত সভ্যতার কৃত্রিমতা ও কপটতা চাপিয়ে দিতে চাওয়া অনুচিত। এই বিষয়ে টলস্টয় যা বলেছেন তাই সার কথা। রুশোও তো বলেছেন প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে। গ্রামে ফিরে যাওয়াও প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া। গান্ধীজীর উপদেশই গ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথও তো ডাক দেন—

'ফিরে চল মাটির টানে।'

বিনু পড়ে যায় দারুণ দোটানায়। জীবন নিয়ে সে কী করবে? কেমন করে কাটাবে? কোথায় কাটাবে? তার ধারণা ছিল সে বেশিদিন বাঁচবে না। তার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেও তেমনি দুব্‌লা পাতলা। শেলী, কীটস পড়তে পড়তে তারও মনে হয়েছিল ত্রিশ না পেরোনোই রোমান্টিক। যৌবন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও যেন চলে যায়, এই মর্মে সে একটা কবিতাও লিখেছিল। কিন্তু তার আগেই যেন সে তার জীবনের কাজ সারা করে যেতে পারে।

সে ভাবতে পারেনি যে ইউরোপে গিয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে গা মিলিয়ে নিতে নিতে তার লেখালেখির পরিকল্পনাও পালটে যাবে। জীবনের সব দিক দেখাতে হলে লিখতে হয় মহাকাব্য বা এপিক। একালে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে বিরাট

ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো এপিক উপন্যাস। যেমন রম্যা রঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ' বা টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস'। বিনুর সাধ যায় তেমন একটি এপিক লিখতে, যদিও তার সাধ্য কেবল লিরিক।

একটা প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে সে যখন ইউরোপে যায় তখন তার বয়স তেইশ বছর। দু বছর বাদে দেশে ফিরে এসে রাজকর্মের অবকাশে সে যখন তার পাঁচখণ্ডের উপন্যাস লিখতে শুরু করে তখন তার বয়স পঁচিশ বছর। সে বয়সে টলস্টয় বা রঁলা অত বড়ো উপন্যাসে হাত দেন নি। জীবনের অভিজ্ঞতা কম। সৃজনের অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু বিনুর কি অপেক্ষা করার জো ছিল? পঁয়ত্রিশ বছরের আগেই তাকে তার বৃহৎ উপন্যাস সম্পূর্ণ করতে হ'বে। কিন্তু কেন? কী দরকার অত বড়ো উপন্যাস লেখার? কেনই বা সে সাধ করে অমন একটা দায় নিজের ঘাড়ে চাপায়? টাকার জন্য নিশ্চয়ই নয়। ওটা তার প্রেমের পরিশ্রম। সে একজন স্রষ্টা ও দ্রষ্টা।

যার প্রধান পটভূমিকা ইউরোপ তা কি বাংলাদেশের মহকুমায় বা জেলা সদরে বসে লেখা যায়? কিছুদিন পরেই বিনুর ইউরোপের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যেত। লিখতে গিয়ে সে বিপাকে পড়ত, যদি না অপরিচিতা এক নারী তার জীবনে পশ্চিম দেশ থেকে আবির্ভূত হতেন। গ্রীক নাটকে যেমন আসমান থেকে দেবতা নেমে আসেন। এরপর থেকে তিনি তাকে পরামর্শ দিয়ে সাহচর্য করতে থাকেন।

কিন্তু সহধর্মিনীর সাহচর্যে উপন্যাস লেখা এক জিনিস আর পুলিশের সাহচর্যে অপরাধ নিবারণ ও জেলের সাহচর্যে অপরাধ দমন অন্য জিনিস। অহিংস নৈরাজ্যবাদী বিনু পুলিশ বা জেল কোনোটাতেই বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদী না হলেও সেও বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু রাজকর্মে নিযুক্ত থাকলে তার আগেই শুকিয়ে যাবে বিনুর অন্তঃকরণ, যা তার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস। তাকে হতে হচ্ছে দিন দিন হার্ড হেডেড তথা হার্ড হার্টেড। এমন মানুষ যার মস্তিষ্ক যেমন কঠিন হৃদয় তেমনি কঠোর। সারস্বত সমাজে হয়তো সে একজন ইনটেলেকচুয়াল বলে গণ্য হ'বে, কিন্তু একজন আর্টিস্ট বলে নয়। অথচ আর্টিষ্ট হতেই তার দূরাকাঙ্ক্ষা। কেউ যখন বলে বিনু একজন কবি তখন সে ধন্য হয়ে যায়। সে বর সরস্বতী সবাইকে দেন না। যাঁরা পান তাঁরাই তাঁর বর-পুত্র! এক্ষেত্রে সে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তিনি মহাশিল্পী। সে তাঁর মতো মহান্ না হলেও সেও তাঁরই মতো রূপদক্ষ হতে চায়।

বিনু উপলব্ধি করে অপরাধ নিবারণ ও দমনের প্রকৃষ্ট উপায় লোকটির অন্তর পরিবর্তন। ভয়ের শাসনে কিছুতেই তা হতে পারে না। প্রেমের প্রভাবেই সেটা সম্ভব। বিচারককে হতে হ'বে দয়াময়ী মাতা ও ক্ষমাশীল পিতা। সাহেবরা তো দাবি করেন যে সরকার মা বাপ। কতক হিসাবে সেটা সত্য। কিন্তু মোটের উপর সরকারের যে ভাবমূর্তি সেটা একটা বিরাট নৈর্ব্যক্তিক শাসনযন্ত্রের। বিনু সেই যন্ত্রের ক্ষুদ্র একটি অঙ্গ। তাকে আইন মেনে কাজ করে যেতে হয়। সে দয়াও করে না, মায়াও করে না। করলে উপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। পুলিসও চটে। পুলিসের চোখে সে

একজন প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী, আর জাতীয়তাবাদীদের চোখে সে একজন প্রকাশ্য দেশদ্রোহী।

কিন্তু একথা বললে সত্যের অপলাপ হ'বে যে সে তত্ত্বগতভাবে অহিংস নৈরাজ্যবাদী বলে কার্যক্ষেত্রেও তাই ছিল। বিশের দশক শেষ হবার পূর্বাহ্নে তার ইংরেজ জেলা শাসক তাকে বলেন, "আমরা চলে গেলেই জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে। স্বাধীন ভারত আত্মরক্ষা করবে কি করে?" বিনু আশা করে জাপানীরা আক্রমণ করবে না। সেটা কিন্তু যুক্তি নয়। সেটা বিশ্বাস। সে বিশ্বাস দূর হয় চল্লিশের দশকে। কলকাতায় জাপানী বোমা যখন পড়ে বিনুর কাছে তখন গোপন নির্দেশ আসে জাপানীরা এলে কী কী করতে হ'বে জেলা শাসককে, জেলা জজকে। ইংরেজরা যে বর্মা রক্ষা করতে পারল না সেটা তো স্পষ্ট। বাংলাদেশ রক্ষা করতে পারবে না সেটাও সম্ভবপর। অথচ ভারতীয়রা যে একাই দেশরক্ষা করতে পারবে এটার মতো প্রস্তুতি কোথায়?

ত্রিশের দশকে বিনু দেখে, হিন্দু মুসলমান কথায় কথায় দাঙ্গা বাধাচ্ছে আর দোষ দিচ্ছে ইংরেজদের। তাদের সংহত করতে যদি নেতারা অক্ষম হন তাহলে তো বিনুর মতো রাজ কর্মচারীদেরই সে কাজ করতে হ'বে। হ্যাঁ, গ্রেফতার করতে হ'বে, জেলে পাঠাতে হ'বে, নাচার হলে গুলী চালাতে হবে। পারতপক্ষে সৈন্য তলব করা চলবে না। তলব করলে সৈন্যদলের কর্তাকেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হ'বে। বিনুকে ততদূর যেতে হয়নি। সে নিজের হাতেই সব ক্ষমতা রেখেছে। কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হয়েছে। সে দেশকাল অহিংস নৈরাজ্যবাদের জন্যে প্রস্তুত নয়।

ব্রিটিশ অপসারণের পরও কমিউনিস্টদের সহিংস বিপ্লব প্রয়াস লক্ষ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। জনগণ অহিংস বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত নয়। বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের দ্বন্দ্ব হিংসার সঙ্গে প্রতিহিংসার বলপরীক্ষা। তার পরিণতি হ'বে অরাজকতায়। বিনু যদি ক্ষমতার আসনে থাকে তাকে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আইন কানুনের প্রয়োগ করতে হ'বে। পুলিসের সাহায্যে, জেলের সাহায্যে, দরকার হলে সৈন্যদলের সাহায্যে। দেশ নৈরাজ্য করলে কাল তা মানেনা। নৈরাজ্য অরাজকতা নয়। জনগণ বরাবরই একজন না একজন রাজার অধীনে থেকেছে। সে রাজা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক আর ইংরেজই হোক। রাজতন্ত্র ছেড়ে প্রজাতন্ত্র বরণ করলেও রাষ্ট্র জিনিসটা থাকবে আর তার সেই চারটি অঙ্গই কায়েম হবে। পুলিশ আর আদালত আর জেল আর সৈন্য।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ না করলে, কখনো ম্যাজিস্ট্রেট ও কখনো জজ না হলে, ভয়ঙ্কর সব পরিস্থিতির সম্মুখীন না হ'লে বিনুর প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা হতো না। সে থিয়োরী নিয়েই দিন কাটাত। তবে কি অভিজ্ঞতার ফলে তার আদর্শের পরিবর্তন হল? না, শুধুমাত্র স্বীকার করতে হল যে এই শতাব্দীতে নয়, বোধহয় আগামী শতকেও নয়, হয়তো তার পরের একশো বছরেও নয়, কিন্তু একদিন না একদিন সমাজে কেউ অপরাধও করবে না, কেউ দণ্ডদানও করবে না। রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে।

বিনুর মনে হয় সে পড়ে গেছে এক আখমাড়াই কলে। যদি আরও বেশিদিন বহাল থাকে তার চাকরিতে তবে ভিতরকার রসকষ বেরিয়ে যাবে, বাকি থাকবে শুধু ছিবড়ে। তার সতীর্থদের পক্ষে সেটা উন্নতির সোপান, কিন্তু তার পক্ষে অবনতির। তার সেই তথাকথিত এপিক উপন্যাস সমাপ্ত হয় আটত্রিশ বছর বয়সে। সেই সময়ই পদত্যাগ করে পশ্চাৎ অপসরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু বিকল্প তো আবার এক চাকরি। গ্রামে গিয়ে চাষবাসের সেই পুরাতন স্বপ্ন সে ভুলে যায়নি, কিন্তু যুদ্ধকালে অবাস্তব। মন্বন্তর আসন্ন। পরবর্তী ন'বছর ধরে বিনু পায়চারি করে। ন যযৌ। ন তিষ্ঠৌ। দেশের স্বাধীনতা তার নিজের স্বাধীনতা নয়। বরং আরো অক্ষমতা। ইতিমধ্যে তার সাহিত্যসৃষ্টি মাথায় উঠেছিল।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে বিনু সেই সিদ্ধান্তটি নেয় যেটি তাকে, আর শিল্পী সত্তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। কোনো উপর-ওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হয় না। কোনো নিচেওয়ালাকে চালনা করতে হয় না। সে তার ইচ্ছা-মতো বাঁচে। তার সৃষ্টিশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। সৃষ্টিশক্তিও একপ্রকার আগুন। যে আগুন নক্ষত্র নীহারিকায় জ্বলছে সে আগুন বিনুর অন্তরেও। তাকে জ্বালিয়ে রাখাই তো তার সাহিত্যিক হওয়ার পূর্ব শর্ত। সঙ্গে সঙ্গে তার দীর্ঘ আয়ুরও। নতুবা সে কবে মরে যেত।

তার জীবনের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় সাতচল্লিশ বছর বয়সে। সেইরকম বয়সে প্রমথ চৌধুরীর প্রার্থনা ছিল দ্বিতীয় যৌবনের।

> "হারানো প্রাণের ফের ব
> সভয়ে চলিনু ফের বাণীর ঃ
> যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান
> আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে
> সেদেশে প্রবেশি গেল মনের আক্ষেপ
> করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।"

একদা বিনুর প্রার্থনা ছিল যৌবন চলে গেলে যেন জীবনও চলে যায়। প্রথম যৌবন রইল না। কিন্তু দ্বিতীয় যৌবন তার স্থান নিল। তাই জীবন হলো দীর্ঘতর। এটা অপ্রত্যাশিত। জীবনের তৃতীয় পর্ব দ্বিতীয় যৌবন এনে দেয়। বহুদিন ধরে তার মনে লালিত হচ্ছিল আর একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনার সাধ। এবার তার জন্যে চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি। প্রেমের উপন্যাসের ভাষা হ'বে প্রেমিক প্রেমিকার মনের মতো ভাষা। কোমল মধুর কান্ত পদাবলী, প্রকারান্তরে বৈষ্ণব কবিতা। আধুনিক যুগ থেকে বিনু ফিরে যায় মধ্যযুগে। মননশীলতা থেকে হৃদয়বত্তায়। যৌবনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনে অন্তর্জীবনে। মাঝখানে কেটে গেছে ত্রিশ বছর। কত কি ঘটে গেছে জগতে। লিখতে বসে সেসব ভুলে যায় বিনু।

কাহিনীটা ছিল বেশ রোমান্টিক। এক অচেনা অদেখা তরুণ নায়ককে চিঠি লিখে

জানায় তার বিয়ে হয়েছে তার অনিচ্ছায় এমন একজনের সঙ্গে যাকে সে ভালোবাসে না, যার অন্য প্রণয়িনী ছিল ও আছে, যার শয্যা থেকে মুক্তির জন্য সে সংগ্রাম করে চলেছে। কোথায়ই বা সে যাবে? পিতৃগৃহে নয়, সেখানে সকলের ধারণা অমন স্বামী আর হয় না। একাধারে জমিদার ও কংগ্রেস নেতা। ওদের ধারণা নায়িকা বিমুখ বলে তার স্বামী অনাসক্ত।

প্রথম দর্শনেই প্রেম, কিন্তু নায়িকা এমন দুটি বাক্য উচ্চারণ করে যা নায়ককে চমকে দেয়। তার স্বামী তাকে ধর্ষণ করেছে। সে তার স্বামীকে বলেছে গর্ভপাত করবে। নায়কের পরামর্শ চাই। নায়ক বলে, না, না, ওতে অজাত সন্তানের প্রতি অন্যায়। নায়িকা জানতে চায়, তাহলে মুক্তির কি উপায়? মুক্তি না পেলে তো আবার ধর্ষণ, আবার সন্তান। তা হলে কি সে আত্মহত্যা করবে? নায়ক বলে, না, না। ওতে নিজের প্রতি অন্যায়।

নায়িকার এক আত্মীয়কে নায়ক বিশেষ শ্রদ্ধা করত। কালজ্ঞ, ত্যাগী, নির্ভীক দেশ সেবক। তিনি তার বন্ধু হন। দুই বন্ধুতে মিলে নায়িকার মুক্তির দায় মাথায় তুলে নেয়। কিন্তু মাঝপথে তার বিয়ে হয়ে যায়, নায়ক নিঃসঙ্গ। তা সত্ত্বেও সে তার অঙ্গীকারে স্থির থাকে। নায়িকার পুত্রসন্তান লাভের পর স্বামী স্ত্রীতে সন্ধি হয়। আপাতত নায়িকা স্বেচ্ছা বন্দিনী। তার মুক্তির প্রশ্ন সন্তান বড় না হওয়া তক্ জরুরী নয়। সে নায়ককে বলে ততকাল অপেক্ষা করতে। নায়ক অনুভব করে যে বন্দিনীকে মুক্ত করতে এসে সে নিজেই বন্দী হয়েছে। তার নিজের মুক্তিই জরুরী। সে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা যাত্রা করে। প্রেমিক হিসাবে সে দোষী। প্রেমিকা হিসাবে নায়িকা নির্দোষ। নায়ক হেরে গেছে। নায়িকা জিতেছে।

কাহিনীটার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লেখার পর বিনুর মনে বিষম খটকা বাধে। প্রথম দর্শনে নায়িকা নায়ককে যে দুটি উক্তি শুনিয়েছিল সে দুটি কি রাখবে না বাদ দেবে? এই নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এমন সময় এক চিঠি। "ত্রিশ বছর আগে তোমাকে আমি বিশ্বাস করে যা বলেছি তা তুমি যদি প্রকাশ কর তবে তুমি বিশ্বাসভঙ্গ করবে। আমাকে না দেখিয়ে তুমি কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। করলে অভিশাপ দেব।"

বিনু লেখা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বছর দশেক বাদে তার মনে হয় তার বাবার মতো সেও একষট্টি বছর বয়সে দেহ রাখবে। মৃত্যুর পূর্বে অসমাপ্ত উপন্যাসকে সমাপ্ত করাই কর্তব্য। তার জন্যে যদি কিছু বাদ দিতে হয় তো তাও সই। বই থেকে দুটি বাক্য বাদ যায়। বিনুর ধারণা সে প্রেমের বেলায় হেরেছিল, লেখার বেলায়ও হারল। তার জীবনের তৃতীয় পর্ব শেষ হয় ছেষট্টি বছর বয়সে। দ্বিতীয় যৌবনও নিঃশেষ।

সৌজন্যে : 'জিজ্ঞাসা'

আমি কি ভুলিতে পারি

একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার সময় বুঝতে পারা যায় না এর প্রকৃত তাৎপর্য কি। এতদিন ধরে সবাই জেনেছিল এই উপ-মহাদেশের মুসলমানরা ধর্মে এক, অতএব এক জাতি এবং সেই কারণে পাকিস্তান নামক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু পাকিস্তানের গভর্নর জিন্না সাহেব ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন যে উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তাঁর ভাষণে তিনি উর্দুভাষা ব্যবহার করলেন না। তাঁর নিজের মাতৃভাষা গুজরাতি। যাদের সভায় তিনি ভাষণ দিলেন তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা। পরিষ্কার দেখা গেল পাকিস্তানের নাগরিকদের মাতৃভাষা এক নয়। তাদের সাহায্য নিতে হচ্ছে একটা বিদেশী ভাষার। সেই বিদেশী ভাষার জায়গায় জিন্না সাহেব যাকে বসাতে চান সেটা বাংলাভাষী মুসলমানের কাছে পরকীয় ভাষা। স্বকীয় ভাষা নয়। উর্দু ভাষা যাদের মাতৃভাষা, সমগ্র পাকিস্তানে তারা সংখ্যালঘু। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন সমগ্র পাকিস্তানে তারা সংখ্যাগুরু। সংখ্যালঘুর মাতৃভাষা উর্দুকে সংখ্যাগুরু বাংলাভাষীদের উপরে জোর করে চাপিয়ে দিতে গেলে প্রতিবাদ স্বাভাবিক। প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে গুলি করে থামিয়ে দেওয়া অন্যায়। এই যে অন্যায়-এর প্রতিকার কোথায়?

এটাই ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির জিজ্ঞাসা। এর উত্তর পাওয়া গেল একাত্তর সালে যখন বাংলাই হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ হলো বিদেশ। উর্দু হলো বিদেশী ভাষা। দেখা গেল ধর্ম এক হলেও রাষ্ট্র দুই হতে পারে, রাষ্ট্রভাষাও দুই হতে পারে, জাতিও দুই হতে পারে। আরো দেখা গেল যে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সবাই মিলে এক জাতি। এইসব কিছুর মূলে একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনা, যা অবিস্মরণীয়। আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি তারাও এটা ভুলতে পারি না। ঘটনার ঠিক এক বৎসর বাদে শান্তিনিকেতনে আমরা সেই দিনটিতে সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত করেছিলুম। তাতে যোগ দিয়েছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, কবি শামসুর রাহমান, কবি কায়সুল হক ইত্যাদি পাঁচজন। আজকাল একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে নানা স্থানে স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?

সৌজন্যে : একুশে স্মারক পত্রিকা.
বাংলাদেশ
হাইকমিশন,

গায়ত্রীমন্ত্রে আমার উপনয়ন হয়নি, হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতায়

গায়ত্রীমন্ত্রে আমার উপনয়ন হয়নি, হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতায়।

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

.. ..

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।'

বারো বছর বয়সে, এই কবিতা আমি আবিষ্কার করি আমাদের হাই স্কুলের কমনরুমে রক্ষিত 'সবুজপত্রে'। কী জানি কেন আমাকেই কমন রুমের চাবি দিয়েছিলেন হেডমাস্টারমশাই। ঢেঙ্কানালের মত একটি দুর্গম দেশীয় রাজ্য, একরাশ বাংলা মাসিকপত্র, তাদের মধ্যে অজ্ঞাত অখ্যাত 'সবুজপত্র', যার পাঠক একমাত্র আমি। আর সব পত্রিকা ফেলে 'সবুজপত্র' পড়ি রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর লিখনশৈলীর আকর্ষণে। 'চার ইয়ারি কথা'র তৃতীয় কিস্তি সোমনাথের কথা প্রথমেই চোখে পড়ে। তার পরে অন্যান্য কিস্তি পড়ি। কে জানে কেন আমাকে নাড়া দেয় ইটারনাল ফেমিনিন। আমাকে ডাক দেয় ভীনাস ডি মাইলো।

'সবুজপত্র' চেয়েছিল ভারতের পুনর্যৌবন, প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমন্বয়, চলিত ভাষার ব্যবহার। আর্ট কথাটিও পড়ি, বুঝতে পারিনে। এই কয়টি আইডিয়া আমাকে সেই বয়স থেকেই ভাবায়, আমাকে হাতছানি দেয় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে রূপরসের রাজ্য আছে তার দিকে। বাড়ির লাইব্রেরিতে ইতিমধ্যে পড়া হয়ে গেছল কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র। স্কুলের লাইব্রেরি ও প্রতিবেশীদের পুস্তক সংগ্রহ থেকে পাই রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নবীনচন্দ্র সেন, রজনীকান্ত, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার। 'প্রবাসী' পাই হেডমাস্টার মশাইর বাড়ি থেকে। পরে নিজেই গ্রাহক হই। ষোল বছর বয়সে আমার প্রথম বাংলা রচনা টলস্টয়ের একটি উপকথার অনুবাদ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

তার এক বছর বাদে কলেজে ভর্তি হয়ে জনা চারেক সহপাঠীকে নিয়ে ব্রতী হই সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দেবার অনুশীলনে। আরম্ভ হয়ে যায় আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস 'সবুজযুগ'। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় লেখা। পাঁচ বছর পরে অনুভব করি যে

আমাকে তিনটির একটি ভাষা বেছে নিতে হবে। আর সেটি আমার মাতৃভাষা তথা 'সবুজপত্রে'র ভাষা। আমার সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী।

কলেজ লাইব্রেরি ছিল ইউরোপীয় নাটক, উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধের খনি। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান, নরওয়েজিয়ান, সুইডিশ সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎ। ফলে আমি ভিতরে ভিতরে ইউরোপীয় হয়ে উঠি। ইউরোপের ইতিহাস আমাকে দোলা দেয়। মনে হয় আমার জীবন বৃথা যদি ইউরোপে যেতে না পারি। কামনা একদিন সত্যি সত্যি পূর্ণ হয়। প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে প্রত্যক্ষ করি ভীনাস ডি মাইলো আর মোনালিসা। ইটারনাল ফেমিনিন।

প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়কে মাথায় রেখে লেখা হয় 'পথে প্রবাসে' ও ছয় খণ্ডের 'সত্যাসত্য'। জীবনের ও যৌবনের চোদ্দ বছর কেটে যায় এই দুটি বই লিখে শেষ করতে। প্রাচ্যকে আমি ভুলিনি। ইউরোপে থেকেও আমি গীতা উপনিষদ পড়েছি। শাক্ত পরিবারে জন্ম, বৈষ্ণব পরিবারে মানুষ, রামায়ণ, মহাভারতের স্তন্যে লালিত। আমি কি প্রাচীকে ও প্রাচীনকে ছাড়তে পারি। কিন্তু একই কালে আমি আধুনিক ও প্রতীচ্য সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য, থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে নৃত্য ভালবাসি। মধ্যযুগের গির্জা ও ক্যাথিড্রালও আমাকে আবিষ্ট করে। সৌন্দর্যের কোনও জাত ধর্ম নেই। বৈষ্ণব ধর্মের মত খ্রিস্টধর্মও প্রেমধর্ম। খ্রিস্টানদের উপাস্য প্রেমময়। আর বৈষ্ণবদের উপাস্য লীলাময়। আমি লীলাবাদী। তাই আমার ছদ্মনাম ছিল লীলাময়। লীলাময়ের জীবনসঙ্গিনী হলেন লীলা রায়।

'সত্যাসত্য' সমাপ্ত হয় আমার আটত্রিশ বছর বয়সে। আমার ধারণা ছিল আমার মায়ের মতো পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই মর্ত্য থেকে বিদায় নেব। কিন্তু লীলা রায় তা হতে দিলেন না। মায়ের মত আদর যত্নে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। আমার এক ওড়িয়া কবিতায় আমি লিখেছিলাম যে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার জীবনও যায়। যেমন শেলি, কীটস, বায়রনের। ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপর আমার রাগ ছিল। কেন তিনি আশি বছর বাঁচলেন। ব্রাউনিং-এর উক্তি আমি বিশ্বাস করিনি। তাঁর রাব্বাই বেন এজরা বলেছিলেন, 'Grow old along with me, the best is yet to be.'

কিন্তু বিরাশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারলুম বলেই আমার তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাস 'ক্রান্তদর্শী' চার খণ্ডে শেষ করতে পারলুম। ভারতের পুনর্নবীকরণই তার মূল বিষয়। তার আগে ছেষট্টি বছর বয়সে সারা হয়েছিল দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস 'রত্ন ও শ্রীমতী'। চিরন্তনী নারীর অন্বেষণ। লীলা রায় আমাকে ছাব্বিশ থেকে অষ্টাশি বছরে পৌঁছে দিয়ে নিজেই বিদায় নিয়েছেন। ভাবছিলুম তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য কোথায় পাব টাকা। আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ-এর একটা সুরাহা করে দিয়ে আমাকে ভাবনামুক্ত করলেন। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এ টাকা দিয়ে লীলা রায় ট্রাস্ট হবে। তিনি বিস্তর অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন। যথাসম্ভব প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৪

"এটি আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে পঠিত ভাষণ।"

আমার রবীন্দ্রনাথ

উড়িষ্যা থেকে ভেসে এসেছিলুম বঙ্গে। প্রাথমিক স্কুলজীবন ঢেঙ্কানাল ও কটকে, কলেজের পাঠ বিহারে, পাটনা কলেজে। তারপর আই.সি.এস. হবার সুবাদে ইংরেজ প্রশাসনিক কাঠামোতে পোষ্টিং পেলুম বেঙ্গল ক্যাডারে হাকিমের কাজ, কখনো জজ, কখনো ম্যাজিস্ট্রেট, জেলায় জেলায় ঘুরে বাংলা ও বাঙালিকে দেখা এবং লোকসংস্কৃতির অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। বাংলার সেটা নবজাগরণের যুগ। একদিকে গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ বিদেশী শাসন অপশাসন দমন পীড়ন শোষণের বিরুদ্ধে. অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাকে বাংলার যুবশক্তির উত্থান। আমি আকৃষ্ট দুটোতেই তবু নন্‌ভায়োলেন্স্ আমার মনের কথা। এই দোটানার জীবনে যখন আমার ভাসমান অবস্থা আমি হাল ধরে দাঁড়ালাম, পাল উড়িয়ে হাওয়া ধরলাম, কিছুটা স্থিতি পেলাম রবীন্দ্রনাথের নেপথ্য অনুপ্রেরণায়।

আই. সি. এস. পদের জন্য শিক্ষানবিশী করতে হয়েছিল বিলেতে, থেকেছি লন্ডনে ও য়ুরোপের নানা শহরে নগরে। সেই সময়কার লেখা এদেশে ছাপা হত বিচিত্রায়, পরে বই হয়েছিল 'পথে-প্রবাসে'। বীরবল প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদ পেলাম, বললেন, প্রথম চালেই বাজীমাৎ। সেটা গদ্যের জন্য, তাঁর বাংলা গদ্যরচনা স্টাইল ছিল আমার আদর্শ মডেল।

দেখা করি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। পেলাম তাঁর শুভেচ্ছা, ভাবনা ও ভাষা দুটোর জন্যই প্রশংসা. এবং আরো শেখার জন্য উৎসাহ, আমার প্রাপ্যের চেয়েও বেশি। আসলে আমার কিন্তু মন ভরলো না। আমার স্বপ্ন কবি হবার, সেটা তাঁকে বলি বা বোঝাই কি করে? যাহোক, দ্বিতীয়বার দেখা করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হল কিছুদিনের মধ্যেই। এবার শ্রদ্ধা ভক্তি জানিয়ে তাঁর হাতে দিলাম সদ্য প্রকাশিত আমার প্রথম কবিতার বই 'রাখী'। যখন তিনি বললেন রাখী নামটা তাঁরও কল্পনাতে ছিল, কিন্তু আমি ওই নামে আগেই বই করে এনেছি শুনে তো আমার খুব আনন্দ। সামান্য কিছুটা পড়লেন, ভালোও বললেন, ভুলও ধরিয়ে দিলেন, বললেন, আচ্ছা পড়ে দেখি, তোমাকে জানাবো। ১৯৩০ জানুয়ারী প্রথম সপ্তাহেই এসে পৌঁছল তাঁর চিঠি। যদ্দুর মনে পড়ে, কবিগুরু লিখেছিলেন 'রাখী' কবিতাগুচ্ছ পড়ে তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছে। তবে কিছু সম্পূর্ণ ভালো, আবার কতগুলো যেন পুরনো ধাঁচের পিছিয়ে থাকা। অবশ্য আমার কবিতার মধ্যে সহজ নৈপুণ্য, আবেগের নিবিড়তা, ছন্দের গতিলীলা—এসব উল্লেখ করে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। আমি তখন ২৫-২৬ বছর বয়সের সম্পূর্ণ অজানা অপরিচিত নবাগত

বাংলা কবিতার জগতে। তাঁর এমন গুণগ্রাহিতা আমার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছিল। বাংলায় আমার ছড়া যতটা সহজ, কবিতা ততটা হয়নি। তবু রেওয়াজ করে চলেছিলুম। কবিতা লেখার দিন আমারো ছিল—বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবনের সঙ্গে তখন বেশ ভালোই যোগ সম্পর্ক। ছন্দ, রস ও সৌন্দর্যবোধকে আমি প্রধান অবলম্বন করেছিলুম কবিতায়---তার মূলে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সিরিয়াস্‌লি চিন্তা করবার বয়স থেকেই কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আমি ভারতীয় ক্লাসিক ঐতিহ্যের পরম্পরাভুক্ত বলে মনে করেছি। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির সঙ্গে একই ধারায় তাঁর উন্মেষ ও বিকাশ। কাব্যকৃতিতে তাঁর শিকড় বাংলা তথা ভারতের মাটিতে। বিংশ শতকে এটাই তাঁকে অনন্যতা দিয়েছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবু তিনি তো বিশ্বকবি। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর জন্যে মর্যাদার আসন পাতা। য়ুরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান তাঁর খুবই প্রিয়, তবু স্বদেশের ভাবরসেই তাঁর পুষ্টি। ক্লাসিকাল বলতে স্থিতির ইঙ্গিত বোঝায় প্রচ্ছন্ন রক্ষণশীলতা। সে অর্থে অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে ক্লাসিকাল বলছিলেন। সম্পূর্ণ রোমান্টিকও তিনি। শেলী, কীট্‌স্‌, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার যে রোমান্টিক টান, আগ্রহ, ঔৎসুক্য তা ওই কারণেই,—পিওর রোমান্টিসিজম্‌।

ত্রিশের দশকের মধ্যপর্বে যখন "সত্যাসত্য" এপিক লিখতে শুরু করি—ছয় খণ্ডের উপন্যাস, তখন আমি তাঁর গদ্যে মোহিত। শুধু তাই নয়, আমি প্রভাবিত হয়েছিলুম তাঁর সংস্কারমুক্ত মানবপ্রেমে, তাঁর বিশ্ব মানসিকতায়। ভারতীয়, তবু বিশ্বজনীন। তাঁর পদচিহ্ন ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে পথ খোঁজাটাই হয়ে উঠেছিল আমার সাধনা। সনাতন ভারতের বেদ উপনিষদের সঙ্গে য়ুরোপের ধ্যান জ্ঞান মননের সমন্বয়ে এক নূতন জীবন দর্শন। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা, প্রত্যয়, নূতনের সন্ধান, যুগযুগ ধাবিত যাত্রা মানুষের পদধ্বনিতে শিহরণ। এভাবেই এলো আধুনিকতা। সব মিলে বাংলার রেনেসাঁস। এলো গতিশীলতা—'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে'। আমার চিন্তায় ও লেখায় আমি তখন ধরতে পেরেছিলুম নতুন স্টাইল। তবু কিন্তু আমার লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। লীলা রায় ও আমি মিলে যতটা পারি তাঁকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলি। কিন্তু অতটা পারব কেন? তাঁর সঙ্গে কর্মজীবনেও সাক্ষাৎ হয়েছে—শিলাইদা, কুস্টিয়া, রাজশাহীতে। আবার শান্তিনিকেতনেও। লালনের গান, লোকসঙ্গীত ও ছড়া—এসব নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলুম তাঁরই পথ ধরে। ছোট গল্পে তো তিনি রাজার রাজা। আমিও হাত দিলুম ছোট গল্পে, কিন্তু গল্পে আমার নিজস্ব ফর্ম।

ছড়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আমার খুব সিদ্ধহস্ত মনে হয়নি। কিন্তু লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অদ্ভুত ঔৎসুক্য। পল্লীজগতের মানুষের জন্য অগাধ প্রেম। গ্রামে পৌঁছানোটা সেভাবে আমার হয়ে ওঠেনি। আমার দৌড় শান্তিনিকেতন পর্যন্ত। ভুবনডাঙ্গা পেরিয়ে সুরুল গ্রাম তাঁর যেন আপন বাড়িঘর কঙ্কালীতলায় গড়ে তুললেন শ্রীনিকেতন, পল্লীমঙ্গলই হল তাঁর সাধনা। দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ ও এল্‌মহার্স্ট সাহেবকে

অবলম্বন করে তিনি এগিয়ে গেলেন ভাগ্যহত দীনদরিদ্র সাধারণ গ্রামবাসীর সেবায়, তাদের কুমোরপাড়ায়, তাঁতীপাড়ায়, তাদের ইলামবাজারের পথে পথে। সব কিছুই যেন তাঁকে করতে হবে। আমার পক্ষে বহুদূরের ব্যাপার। আকৃষ্ট ছিলাম, কিন্তু পারিনি। যে বিষয়ে আমার পরম বিস্ময়, সেটা তাঁর বিশ্বভারতী। সব দেশেই আমি, আমার দেশেও সবাই—এ ছিল তাঁর স্বপ্ন। "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"—বিশ্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে অপূর্ব মেলবন্ধন। সবাই মিলে এক মানুষ জাতি। সংগঠন ও সেবার কাজে তাঁর বহু সময় গেছে, শ্রম দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন। আমি সবটুকু সমর্থন করতে পারতুম না। লেখার কাজে তাঁর ভাঁটা পড়ত যখন কর্মের জোয়ার। দেশের পক্ষে এটা ক্ষতি বলে মনে করেছি। বিশ্বভারতীর টাকা যোগাতে নৃত্য গীতের দল নিয়ে বার্ধক্যের প্রান্তে পৌঁছেও ঘুরছেন ভারতের শহরে নগরে। নান্দনিক কাজের দোহাই দিয়ে কি এটা সমর্থন করা যায়? গান্ধীজী খবর পাঠালেন—এভাবে স্বাস্থ্য ও সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। টাকার যোগাড় গান্ধীজী করে দিয়েছিলেন। ভাবতুম, কবিগুরু কি এ কাজের জন্য? লিখতে বসুন আরেক খানা 'গোরা' উপন্যাসের মত সংস্কারমুক্ত ধর্মাধর্মের দ্বন্দ্বমুক্ত, একান্তভাবে মানবতাবাদের নুতন এপিক্। 'গোরা' যতই পড়েছি ততই আপ্লুত হয়েছি, এ যেন মানবতার এক নূতন জীবনদর্শন। রবীন্দ্রনাথ থেকে যখন শিক্ষালাভ করেছি নানাভাবে, সাহস পেয়েছি চিন্তায় ও লেখার কাজে, তেমনি তিনি নান্দনিকতার এক গভীর উৎস, সেখান থেকে আহরণ করেছি ইচ্ছেমত। অশেষ তাঁর গান। সব ফুরোলেও তাঁর গান চিরকালের—কথায় ও সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল ধরে মধুর আনন্দরসে ভরাবে মানুষকে—সব মানুষকে।

Sahitya Akademi Fellowship 1989, Acceptance Speech by Annada Sankar Ray

Fellowship of the Sahitya Akademi is an honour I particularly appreciate. I happened to be one of the Founder Members of this institution thirty-five years ago. I was privileged to sit at the same table as Jawaharlal Nehru, S. Radhakrishnan, Abul Kalam Azad, K. M. Panikkar, Hazari Prasad Dwivedi, Jainendra Kumar, Uma Shankar Joshi, Humayun Kabir and five others. One might call it India's literary cabinet of fourteen members presided over by Nehru as an outstanding author. I played a part in deciding who were to be awarded prizes for Bengali, Oriya and Assamese.

I have now reached the age of eighty-five. I wonder how many of my colleagues are still alive. I take this opportunity to pay my homage to the great departed. They laid the foundations well. May the Akademi grow from strength to strength ! I am grateful to the present members for electing me one of the Fellows. They have put me in the best company. Mulk Raj Anand and Vinayak Krishna Gokak are old friends.

Many mistake my first name for Ananda. It is Annada, one of the names of Mother Durga. Annada Sankar taken together means the same as Uma Shankar. Annada is a variation of Annapurna, the giver of food. I was born in a traditional Sakta family. When I was eight years old my father and mother became Vaishnavas. Every evening I heard my mother singing from Jayadeva's Gitagovinda and my father reciting from Vidyapati's Padavali. Their rhyme and rhythm moved me. Every week the local Vaishnavas came to our house and sang Lila Kirtan songs from the Padavalis of Chandidas, Jnanadas and Govindadas. Those were about the Lila of Radha and Krishna, the Eternal Lovers. As I grew up I retained the quintessence of Vaishnavism which I may call Lilavada. Later I took the pseudonym of Lilamaya Ray in Bengali. Soon after that I met and married the lady whom I renamed Lila Ray. In the Life of Sri Chaitanya by Krishnadas there is a passage where Ray Ramananda tells the saint that the greatest of all objects of sadhana is the love of Radha. I accepted it as a messagge for me.

The next great object of sadhana is, so far as I am concerned, the Art of Writing. When I was twelve years old I was struck by the Bengali magazine, Sabuj Patra (Green Leaf), edited by Pramatha Chaudhuri. The ruling ideas of the stories, poems and essays published there were Youth, Rejuvenation of India. East-West Synthesis, Eternal Feminine, Art, Spoken Language. Too highbrow for me at that age, but as I grew up I understood what Rabindra, Pramatha and their circle were conveying to the Bengali elite. Five years later when I went to college five of us formed a group of writers who came to be known as the Sabuj Dal with ideas more or less akin to those of Sabuj Patra. Our voices were not heard at first but as time passed the 'Sabuj Era' came to be recognised in the histories of modern Oriya literature. Right in the middle of that twelve year period I gave up writing in Oriya and concentrated on Bengali. I had already contributed to Prabasi and Bharati came essays and poems, apart from the translation of one of Tolstoy's tales.

Tolstoy and Gandhi arrived in my life about the same time when I was sixteen, the one with his Twenty-three Tales and the other with his Hind Swaraj (Indian Home Rule). Their meassage was populist whereas that of Sabuj Patra was elitist. "Go and live in a village, share the toil of the peasants and craftsmen, attain harmony with Nature, have no illusions about civilisation with its industrialism and militarism, its artificiality posing as art." As I grew up and read Anna Karenina I said to myself, "I would rather write a novel like this than tales like those." I continued to feel the pull of the rural people living in close proximity with Nature and producing folk songs and folk tales which I loved. I might turn to them one day, but meanwhile I must visit the West. The pull of the West was stronger. Life was not worth living without a glimpse of Europe and its treasures and a glance at Venus de Milo at Paris.

A kind providence made this possible at the age of twenty-three, The elation of my meeting with the West was like that of a young man with a young woman. My travel impressions recorded in Pathe Prabase (On the Way and Abroad) were serially published in the Bengali monthly, Vichitra. It was appreciated by both Tagore and Chaudhuri and other men of letters. Chaudhuri offered to write a introduction to the book. Since its first chapter was written in 1927 sixty-two year havê passed ; two in England and sixty in Bengal. The major outcome of my sojourn in Europe was my six-volume novel, Satya Asatya or Satyasatya (Truth and Untruth). The story was placed

mainly in England and the characters were mainly Indians. Almost all the current political, economic, social and philosophical problems were discussed.

Before I thought of writing this long novel in five (later in six) volumes I interviewed Rabindranath Tagore at Santiniketan and Romain Rolland at Villeneuve (Switzerland) on the subject of Art. My question was. "Is Art too good, to be human nature's daily food ?" To this Tagore's answer was to the effect that Art was like Higher Mathematics and called for preparation on the part of the reader or the viewr. Rolland's answer was exactly the opposite. During the Renaissance every craftsman truned out beautiful things for everyday use. He was a believer in the people's capacity to enjoy art without any preparation. Between these two opposite points of view I chose to follow a middle course. I would go half the way towards the people. They should come half the way towards me. If they did not care to perform their part of the journey I was not going to travel all the way towards them. The result was that I become neither a populist nor a popular novelist. Later in my life I took to writing what is called Chhara in Bengali. Light verse like nursery rhymes turned out by common folk. I have attained a fair amount of popularity as a Chharakar after some forty years of practice. I am close to Rolland's requirement. No preparation is demanded of the reader or the listener. Chharas are in the oral tradition. They can be set to music. Yet I am dissatisfied. I wanted to be called a poet, not a Chharakar. Poetry I have neglected under pressure of circumstances.

After a twelve year break, during which I wrote Chharas, essays and short stories mainly, I undertook to write one more long novel. this time in seven parts. Of them three would be named Ratna O Srimati after the hero and the heroine. The first two parts were not difficult to write. But as I proceeded to write the third I was faced with both inhibition and prohibition. I remembered the words of a European mountaineer I met a Almora. He said, "A climber should know when he is defeated by the mountain. If he takes one step more he will perish." I realized that the novel should be left where it was. If I persisted in writing the third part I must omit or dilute a piece of the dialogue between the hero and the heroine. I was entirely opposed to any compromise. I announced that the second part was the last. But I remembered the words of Gandhiji. He said to his followers. "If you begin something you must complete it." For ten years so I went on debating in my mind whether I should complete what I had begun

even at the cost of changing a piece of conversation or leave the story unfinished. My moral conscience forbade me to tell what might be harmful to other people. On the other hand, my literary conscience would not let me leave the story untold after having aroused the curiosity of my readers. Finally, I made up mind to end the debate by altering a few sentences to my infinite regret. Eighteen years have passed since then and I now think I did the right thing, having no better option. The mountain had defeated me.

I was sixty-seven and did not expect to live longer. My mother died at the age of thirty-five and my father at sixty-one. Having given twelve years of my life to Satyasatya and seventeen years to Ratna O Srimati I was unwilling to take up another long novel. I therefore contented myself with short stories, essays and Chharas until I felt on overwhelming desire to write another long novel on the theme of Renewal of India. To write or not to write, that was the question. It gave me no peace for several years. How could I begin something I might not live to end ? At last I embarked upon my last long novel, Krantadarshi (The Seer), at the age of seventy-five, leaving it to God whether it was His will that I might live up to eighty in order to complete it in four volumes. While writing it often felt that I was merely the instrument of an unseen presence that prompted me from within. When I was rising in bed after my midday meal the unseen presence would say, "Slave! Arise. Go back to your desk. There is no time to lose." It was indeed a race against time. The story commenced with Hitler's invasion of Poland on the 1st of September, 1939 and moved through India's struggle for Independence, the Muslim minority's did for a separate State, Partition and the British withdrawal amidst chaos and violence, concluding on the 31st of January, 1948, when the dead body of Mahatma Ghandhi was cremated.

It was a miracle that I was allowed to live up to the age of eighty two, Quite unexpectedly Krantadarshi developed into a sequel to Satyasatya Together the two novels make a ten-volume saga in Bengali literature. Three of the characters re-common, though under different names. Mahatma Gandhi is there in both the novels as an epic hero indirectly guiding the steps of one of the leading characters, a Gandhian idealist. He represented the East in the theme of East-West thesis and anti-thesis. They reached no synthesis but only a compromise.

Had I been allowed to write all the contemplated seven parts of the Ratna sequence it might have become a second saga on the theme of

the Eternal Feminine. I managed to write two more parts under two other names, but the last two I dared not attempt for fear of being defeated by the mountain again. Providence does not grant all the wishes of a mountaineer. An author may aim high, but know where and when to stop.

Now at the age of eighty-five I might stop writing altogether, if I had not some old promises to keep ; some poems, some ballads, a summing up of literary experience and a short novel on the Quest of Beauty. All my life I have worshipped three deities : Truth, Love and Beauty. Truth and Love have my puja offerings at their feet in the form of novels and short stories and poems. Beauty has to be propitiated before I depart.

The Creator has endowed me, an insignificant creature, with a precious particle of his own infinite creative power. The only time I forgot this trust was in my crazy pursuit of higher magisterial power. This spell lasted nearly three years. I came to my senses when my second son died all of a sudden. I attributed the tragedy to my dereliction of duty as a creative artist, my swadharma. But it was not so easy to renounce paradharma without adequate provision for the family. I had to mark time till this was made possible by a kind Providence twelve years later.

Providence has been kind to me on so many crucial occasions that I believe it will help me keep my creative fire burning until I have finished my life's work.

সৌজন্যে : 'সাংস্কৃতিক খবর'

অন্নদাশঙ্কর স্মরণে

জ্যোতিভূষণ চাকি

সেঞ্চুরি না হলেও সেঞ্চুরি তো প্রায় করেই ফেলেছিলেন। তাঁর সারাটা জীবন যেন এক সার্থক ক্রিকেটার জীবন। দেশে-বিদেশে যত জায়গাতেই গিয়েছেন, কত মানুষকে আপন করেছেন। শেষে একজন বিদুষী বিদেশিনীকে জীবনসঙ্গিনী করলেন। আমরা তখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে মফস্‌সলের ছাত্র। তবু নাম মনে এসেছে কারণ জজ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি তো ছিলেন নিত্যভ্রমণশীল। যখন কলকাতায় এলাম তখন তিনি লেখনী চালনার ব্যাপারে সব্যসাচী। আমাদের তখন হরিণশিশুর মতো শিং গজিয়েছে মাথায়, পরখ করবার জন্য উইয়ের ঢিবিতে ঢুঁ মেরে চলি। শব্দগুলোকে ছন্দে বাঁধার চেষ্টা করি, আর নিজেই মনে মনে বলি 'কিমিদংব্যাহৃতং ময়া'। পত্রিকাও প্রকাশ করি। কী মারাত্মক সব দুঃসাহস। হ্যাঁ, ওই পত্রিকার সুবাদেই অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ—ওঁর লেখা চাই। কিন্তু উনি লেখা দেবেন কি? দেখাই যাক না। আশ্চর্য, দু-একটি সহজ প্রশ্নের পর বললেন—'আজ কী বার—বৃহস্পতি। রোববারে লেখা নিয়ে যেয়ো।' এমন জয়ের আনন্দ তো আর পাইনি। তারপর ক্রমশ লেখা বুঝতে চেষ্টা করছি নিজেও লিখছি, লেখকদের কারও কারও সঙ্গে পরিচয়ও ঘটছে। ইতিমধ্যে একটি বই সম্পাদনা করতে গিয়ে এক ঝাঁক সাহিত্যিক কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। বইটা পাঁচ বছর বয়সের শিল্পী কুশল চক্রবর্তীর ছবি, আর সেই সঙ্গে বড়োদের ছড়া নিয়ে। বইটার নাম 'আমার ছবি তোমার ছড়া'। কুশলের আঁকা ছবি দেখে ছড়া লিখে দিতে হবে ওইসব দিকপালদের। প্রথমেই অন্নদাশঙ্করের কাছে গেলাম। তিনি কুকুর নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে রত একজনের ছবি দেখে সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন—

আমার কুকুর নয়, কুকুরের আমি
ও চললে আমি চলি, ও থামলে থামি।

তাঁর ছড়ায় মাঝে মাঝে জীবনের গভীর সত্যগুলো যেমন ফুটে ওঠে, এ সেইরকম একটি ছড়া। 'কুকুরের আমি' যেন 'তেলের শিশি'র চেয়েও দামি!

তারপর অনেকটা দিন গড়িয়ে গেল। ছুটন্ত অন্নদাশঙ্কর তখন আস্তে হাঁটেন। তবে মঞ্চে ওঠবার সময়ে কাউকে ধরতে হয় না। আমরা যদি সাবালক হয়ে থাকি তিনি আমাদের অভিভাবক। ধেড়ে খোকাদের অনেক কুকাণ্ড তিনি থামিয়ে দেন উদ্যত বাক্‌যবুকে।

সেটা ১৯৮৬ সাল। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা হল। তাঁরই সভাপতিত্বে বাংলা আকাদেমির নানা বিভাগের কাজ এগিয়ে যেতে লাগল। আকাদেমির নতুন ভবনের শিলান্যাস তিনিই করলেন। ১৯৯১-তে সেদিন ভাষণে বলেছিলেন, 'আমাদের তো আঠারো মাসে বছর, এই নতুন ভবন আমার জীবৎকালে আমি দেখে যেতে পারব কি না সন্দেহ।' কিন্তু কিমাশ্চর্যতঃপরম্। ১৯৯৩-তেই নতুন ভবনে ভাষণ দিতে পারলেন

তিনি। আকাদেমির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর একটু আগে থেকে। তখন আমাদের কর্মশালা ছিল ইনফরমেশন সেন্টারের দোতালায়। সেখানে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরেতে তখন একটা অভিধানের কাজ চলছে অন্নদাশঙ্করেরই প্রেরণায়।

বাংলা আকাদেমির অন্যতম প্রধান কাজের মধ্যে অভিধান রচনাকে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। 'আমাদের অভিধানগুলোয় দোষ', তিনি বলতেন, 'এদের কোনো নতুন সংস্করণ হয় না। আর পরবর্তী অন্যান্য রচিত অভিধানগুলি হয় পূর্ববর্তীদের অনুসরণে—যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্। ফলে তাদের কার্যসাধন হয় না মোটেই।' আর একটি বিষয়ের ওপরেও তিনি বিশেষ জোর দিতেন। সেটি খাঁটি বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনার দিকে। 'এখন যে সব ব্যাকরণ রচনা হয়, তা সংস্কৃত ব্যাকরণের হেরফের মাত্র। বাংলা ভাষায় নিজস্ব চলনের ছাপ তাতে পড়ে না। অথচ ও দেশে ভাষা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে অপূর্ব সব ব্যাকরণ তৈরি হচ্ছে।'

এসব কথা বারবার বলেছেন। সত্যি সেই কবেকার চলন্তিকা কি এখনও চলন্তিকা! হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বাংলা ভাষার অভিধান আমাদের গর্ব করার বস্তু হলেও তা কি আজকের দিনের বাংলা ভাষার বহুমুখী প্রয়োজন মেটায়? অভিধান ব্যাকরণ ও বানান সংস্কারের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশকে আদর্শ না হলেও অগ্রবর্তী বলে মনে করতেন।

একদিন বললেন, 'আপনারা বানান সংস্কারের ব্যাপারে ও বাংলায় অভিধানকারদের সঙ্গে বসুন। দু-বাংলার ভাষাই যখন এক তখন দু-বাংলার বানান সংস্কারে একটা ঐকমত্য দরকার।'

বাংলা আকাদেমির বার্ষিক সভা বা বিশেষ সভাগুলিতে তিনি শরীর খারাপ নিয়েও উপস্থিত হয়েছেন। শুধু ভাষা সাহিত্যে নয় যে-সব সমস্যা আজ আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছে সেগুলোর সমাধান কোন্ পথে হতে পারে সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করতেন। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ তিনি যে দেশকে কত গভীরভাবে ভালোবেসেছেন তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলতেন, 'যুগ আমার জনক দেশ আমার জননী।'

বেশিদিন তিনি বাঁচতে চাননি, যৌবন ভোগ করতে করতেই তিনি চলে যাবেন তাই ভেবেছিলেন। আমাদের ভাগ্য ভালো, রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করা এই চিরযুবা দিশারি দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আজ বিশেষ করে মনে পড়ে তাঁর আশুতোষ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটার কথা। যেখানে সাধারণ ও অসাধারণ সব মানুষের আনাগোনা ছিল। তিনি ছিলেন সকলেরই কাছের মানুষ। অন্নদাশঙ্কর ছিলেন বিশ্ববন্ধু, শুধু দেশের কল্যাণ নয়, সারা পৃথিবীর কল্যাণ ছিল তাঁর একান্ত ঈপ্সিত। উপনিষদের ভাষায় বলা যায়, 'সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু'। এই ছিল তাঁর কামনা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উক্তিটি ঃ

'এটা ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী। আমার কাছে এটাই সব চেয়ে মনে রাখবার মতো ব্যাপার। কারণ আমি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধ্যান করি। কিন্তু হিংসা বাদ দিয়ে। হিংসা প্রবেশ করলে মৈত্রী প্রস্থান করে। মৈত্রী প্রস্থান করলে স্বাধীনতাও তার অনুসরণ করে। সাম্য কি একা থাকতে পারে?' [আকাদেমি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদকীয়]

অসংকোচে আমরা তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং তাঁর নির্দেশ চেয়েছি। সে সুযোগ আর আমরা পাব না। আমাদের মনন ও চিন্তার ক্ষেত্রে দারুণ দগ্ধ দিনে বটছায়া যেন আমাদের মাথার উপর থেকে সরে গেল। তাঁর অভাব এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। মুক্তমনা এই মানুষটির উক্তি দিয়ে এই শ্রদ্ধানিবেদন শেষ করি ঃ

'এমনভাবে বাঁচতে ও কাজ করে যেতে হবে যাতে শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে মানবিক আদর্শের অনুসরণ করা যায়। আমি মানবিকতাবাদী ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে এর বিরোধ দেখিনে। প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে বিরোধ দেখলে আমি মানবিকতাবাদকেই শ্রেয় মনে করি। জনপ্রিয় হতেই হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই। হলে ভালোই, না হলেও ভালো। ক্ষুরধার পন্থা। জনপ্রিয়তার খাতিরে বা অর্থপ্রাপ্তির জন্য তার থেকে বিচ্যুত হওয়া আত্মরক্ষা নয়। আত্মাকে হারানো। সারা জগৎটাকে যদি আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পাই অথচ আপনার আত্মাকেই হারিয়ে ফেরি তা হলে আমার এমন কী লাভ হল? যীশুর এই প্রশ্নটি আমি তেমনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যেমন করি মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। যাতে আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব?'

সৌজন্যে ঃ 'বাংলা বই' বাংলা আকাদেমি

মানবপ্রেমী অন্নদাশঙ্কর

সৈয়দ আলি আহ্‌সান

আগে অন্নদাশঙ্কর রায় টলস্টয়ের উপর লেখা তাঁর চটি বইটি আমাকে পাঠিয়েছেন শিরোনামের নিচে নিজ হাতে লিখে দিয়েছেন 'জাপানের কথা আজও ভুলিনি।' মনে পড়ল ১৯৫৭ সালে আমরা জাপানে কিছুদিন একসঙ্গে ছিলাম। আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের একটি সম্মেলনে আমরা টোকিওতে মিলিত হয়েছিলাম। সে সময় অন্নদাশঙ্করকে দেখেছিলাম অসম্ভব কৌতূহলী, জীবনময় এবং তরুণের মতো সর্বমুহূর্তে আগ্রহে প্রদীপ্ত। যা চোখে পড়ছে তাকে ভালো করে দেখছেন, যা দেখছেন তাকে ভালো করে জানবার চেষ্টা করছেন এবং সব কিছুতে উল্লসিত হচ্ছেন। তিনি এক সময় কোন একটি প্রবন্ধে যেন লিখেছিলেন, যা সনাতন তা নতুনের মধ্যে ফিরে ফিরে সপ্রকাশ। মানুষের চোখ নিত্য নতুনের প্রেমিক। যে তার প্রেমের মূল্য বোঝে সে তাকে নিত্য নতুন করে দেখায়। এভাবে নতুন করে দেখার মধ্যে আনন্দকে একজন মানুষ আকাঙ্খা করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। টোকিওতে একদিন একটি পুরোনো মন্দিরের সামনে অনেক ছোট পাথর পড়ে আছে দেখলাম। পথচারীরা যারা যাচ্ছে এক একটি পাথর মন্দিরের ছাদে ছুঁড়ে চলে যাচ্ছে। অন্নদাশঙ্কর একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন এ-প্রথাটির তাৎপর্য কি? লোকটি বললো, যিনি পাথর ফেলছেন তিনি এ আশায় ফেলছেন যে তিনি আবার এখানে ফিরে আসবেন। অন্নদাশঙ্কর বললেন, "বেশ ভালো প্রথা তো ফিরে আসি বা না আসি, ফিরবার প্রত্যাশাটি বেঁচে থাকুক।" এই বলে তিনি একটি পাথর মন্দিরের ছাদে ছুঁড়ে দিলেন। এভাবে শিন্টো মন্দিরের চত্বরে মানুষ সমান উঁচু পাথরের প্রদীপাধার দেখে তিনি কৌতূহলী হয়েছেন. জিজ্ঞেস করেছেন এগুলো কিসের জন্যে। স্থানীয় লোকেরা বলেছে, "পিতৃ-পুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই প্রদীপাধারের মধ্যে উত্তরপুরুষেরা প্রদীপ জ্বেলে যায়।" অন্নদাশঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, "আমিও কি একটি প্রদীপ জ্বালাতে পারি না?" মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে বললেন, "দিতে পারেন তবে কেন দেবেন? যাঁর স্মৃতিতে প্রদীপ জ্বালাবেন তিনি তো আপনার কেউ হন না।" অন্নদাশঙ্কর বললেন, "মানুষ হিসাবে তিনি আমার পূর্বপুরুষ তাই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবো অন্নদাশঙ্কর একটি নীল রংয়ের মোমবাতি কিনে প্রদীপাধারের একটি প্রকোষ্ঠে জ্বালিয়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম "নীল রংয়ের কেন?" তিনি বললেন "নীল রং হচ্ছে সান্ত্বনার রং, বরাভয়ের রং। আমি অতীতের কাছ থেকে সান্ত্বনা চাই, বরাভয় চাই।" অন্নদাশঙ্করকে আমি এইভাবে জাপানে প্রাণের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে আবিষ্কার করি। জাপানেরই আর একটি ঘটনা উল্লেখ করবো যে ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্নদাশঙ্করের অসীম সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা সুস্পষ্ট হয়। কনফারেন্সে আগত এশীয় দেশসমূহের প্রতিনিধিদের ভারতের রাষ্ট্রদূত একটি

মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে আমি নিমন্ত্রিত হইনি।

ইমপেরিয়াল হোটেল থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় যখন ভোজে যাচ্ছেন তখন আমাকে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম "কোথায়?" কেননা তখনও আমি এই নেমন্তন্নটার ঘটনা জানিনা। অন্নদাশঙ্কর রায় পরে কথা হবে এই বলে চলে গেলেন। বিকেলে মিঃ প্রভাকর আমাকে বললো, "আজ দুপুরে অন্নদাশঙ্কর এক মারাত্মক কাজ করেছেন। খেতে বসে রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করলেন, "পাকিস্তানের প্রতিনিধি উপস্থিত নেই কেন? আরও বললেন, যিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং এশীয় প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা সভায় তাঁর উপস্থিত থাকার অধিকার আছে। যদি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আমন্ত্রণ না জানানো হয়ে থাকে তাহলে তিনি খাদ্যগ্রহণ করবেন না। রাষ্ট্রদূত তাঁর অফিসের গাফিলতির জন্য এ ত্রুটিটি ঘটেছে এই বলে রেহাই পেলেন।" আমি সন্ধ্যার দিকে অন্নদাশঙ্করকে খুঁজে বের করে এইজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম. কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম এটা করার কি দরকার ছিলো? তিনি বললেন, "আমি রাজনীতিবিদ নই, তাই মানবহিতৈষণার ক্ষেত্রে যা অপরাধ তাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি এবং প্রতিবাদ করি।" সে সময় অন্নদাশঙ্করকে খুব ক্ষুব্ধ দেখা যাচ্ছিল। একজন মানুষের শিরায় শিরায় অক্ষয় যৌবনের উষ্ণ রক্তপ্রবাহ না থাকলে এ প্রকার আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্নদাশঙ্কর অস্তিত্বকে জরাগ্রস্ত করতে চান না এবং প্রেমে সকল মানুষকে আপন বলয়ের মধ্যে আকর্ষণ করতে চান।

ছাত্রজীবনে অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি পড়েছিলাম। বিপুল আয়তনের একটি এপিক উপন্যাস বোধহয় বাংলা ভাষায় এই প্রথম। তাঁর এই বিপুল আয়তনের উপন্যাস ছয় খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল। প্রত্যেকটি খণ্ড ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক একটি খণ্ড ছিলো তিন শ' পৃষ্ঠার মত। 'সত্যাসত্য' এর কয়েকটি খণ্ডের নাম আমার মনে আছে 'যার যেথা দেশ', 'কলঙ্কবতী', 'দুঃখমোচন' এবং 'মর্তের স্বর্গ'। উপন্যাসের জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, বহুদর্শিতার প্রয়োজন এবং পরের মন জানাও অত্যাবশ্যক। উপরন্তু উপন্যাসের জীবন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নয় বা তার পরিপূরক নয় বা তার সম্প্রসারণ নয়। উপন্যাসের জীবন তার আপনার জীবন, তার নায়ক নায়িকার জীবন, নায়ক-নায়িকার সঙ্গে যুক্ত বহু মানব-মানবীর জীবন, জীবনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম বা নিয়তি, জীবনের বৃহত্তর পটভূমি। উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়। ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে যেতে বা ঊর্ধ্বে উঠতে না জানলে উপন্যাস লেখা চলে না। আমি এ কথাগুলো অন্নদাশঙ্করের 'উপন্যাসের সাধনা' নামে প্রবন্ধ থেকেই উপস্থিত করছি। অন্নদাশঙ্কর 'রত্ন ও শ্রীমতী' নামে আর একটি এপিক উপন্যাসের সূত্রপাত করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের যে লীলাব্যঞ্জনা তারই প্রতীকে এই উপন্যাসটি রচিত। সূত্রপাতে আকর্ষণ, প্রণয়-জিজ্ঞাসা এবং প্রণয়-পরীক্ষা। পরবর্তীতে

প্রণয়কে কামনার অগ্নিদহনে বিশুদ্ধ করে জানবার চেষ্টা। অবশেষে সকল সম্পর্কের বাইরে গিয়ে চিত্তের গভীরে প্রণয়কে আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে গেলেন আর ফিরলেন না সেদিন থেকেই রাধার সাধনা হলো চিত্তের গভীরতম প্রকোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করা। প্রেমের এই অভিব্যঞ্জনাকে তিনি আধুনিক জীবনের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থের শ্রীমতী হচ্ছে রাধা, রত্ন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি আধুনিক জীবনের মধ্যে বৈষ্ণব রসের আস্বাদনকে কি করে সার্থক করবেন?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন "বৈষ্ণবরসের আনন্দকে প্রকাশ করতে হলে দ্বিতীয়বার সেই অনুভূতির রাজ্য ফিরে যেতে হবে। সমাজের কোনো ছবি আঁকা অথবা পরিবর্তন ঘটানোই সাহিত্যিকের আসল লক্ষ্য নয় আমি বহুজনের জীবনে বহুকাল ধরেই জীবন লাভ করতে চাই। সীমার ভিতর পুরতে জানা আর্টের বর্ণপরিচয়।"

অন্নদাশঙ্কর এককালে ব্রিটিশ আমলে দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। কিন্তু সাংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিলো না বলেই তিনি সাহিত্যের অপরিমিত প্রাণলোকের অধিকার পেতে চেয়েছিলেন। তাই চাকরির কর্মপ্রবাহ থেকে দূরে চলে গেলেন এবং সাহিত্যের একটি সার্বক্ষণিক প্রাণপ্রবাহে নিজেকে মিশিয়ে ফেললেন। তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক বার বলেছিলেন, পল্লী ও নগর উভয়কে উপভোগ্য করতে পারা চাই। শুধু একবার চোখ দিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া উপভোগ করা নয়। সাহিত্যের প্রতি, দেশের প্রতি এবং পৃথিবীর উপর একটি কর্তব্য আছে বলে তিনি ভেবেছিলেন এবং সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে চাকুরী ছেড়েছিলেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় সহজে দৃষ্টিগোচর অথবা লক্ষ্যগোচর চেহারার মানুষ নন শীর্ণকায়, গায়ের রং ময়লা। হঠাৎ সামনে দিয়ে চলে গেলে চোখে প্রায় ধরাই পড়ে না কিন্তু তাঁর চোখে চোখ রেখে চোখ ফেরানো যায় না। এতো একাগ্র দীপ্ত চোখ আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি। তিনি যখন কথা বলেন, তখন তার চোখ শান্ত মনে হয় তাঁর কণ্ঠস্বর শাণিত কিন্তু উগ্র নয় বরং যে কথা বলেন তা বিশ্বাসের সঙ্গে বলেন এবং সুনিশ্চয় হয়ে বলেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমরা শহরের লোকেরা ভাবি আমরাই দেশ, আমরা যা ভাববো তাই দেশের ভাবনা, আমরা যাই বলবো তাই দেশের বক্তব্য। কিন্তু আমরাই তো এই দেশের সব নই। আমাদের বিরাট অংশ তো গ্রামে রয়েছে, তাই আমি খাঁটি দেশজ শব্দ শুনবার জন্য কান খাড়া করে থাকি, এবং সেই খাঁটি শব্দগুলো আমি পল্লীগানের মধ্যে পাই। তাই আমি নগরে না থেকে গ্রামের মধ্যে যেতে চাই।' তিনি মহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন এই কারণে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন এবং লোকসঙ্গীত সংগ্রহের সূত্রে তিনি মন্তব্য করেছেন দ্বিধাবিভক্ত হলেও লোকসাহিত্য অবিভক্ত কেননা লোকচিত্ত এক ও অবিভাজ্য। তাই মনসুরউদ্দীনের লোকসঙ্গীত সংগ্রহে অন্নদাশঙ্কর উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি যখন কলকাতায় কাজ করি (দেশ বিভাগের পূর্বে) তখন লোকসাহিত্যের স্বরলিপি তৈরির

কাজে এবং তা ধরে রাখবার চেষ্টায় একজন প্রাণবান ইংরেজ পুরুষকে দেখেছিলাম। তিনি ডক্টর বাকে। ডঃ বাকে অন্নদাশঙ্করের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, বলেছিলেন, তাঁরই সাহায্যে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে।' অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' কলকাতায় বিচিত্রায় যখন ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রমথ চৌধুরীরও খুব ভালো লাগে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, আকবর বাদশার দরবারে এক নবীন গুণী এলেন। তাঁর আলাপ শুনে বড়ো বড়ো ওস্তাদরা মাথা থেকে পাগড়ি খুলে দিলেন। এখন থেকে ইনিই শোনাবেন আমরা শুনবো। অন্নদাশঙ্কর হচ্ছেন সেই গুণী। অন্নদাশঙ্করের বিবেচনায় শিল্পের কাজ হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম হতে পারে একনিবিষ্ট, পরিধি করতে পারে নিখিল মানবকে, নিখিল প্রাণকে, নিখিল বিশ্বকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলাম সপরিবারে তখন তাঁর কাছ থেকে সর্বমুহূর্তে সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছি। আমরা পারিবারিক অসুবিধার জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন এবং সর্বদা আশ্বাস দিতেন, বলতেন, "ভগবানের ইচ্ছায় সব হয়। কি তাঁর ইচ্ছা জানতে হবে। করতে গিয়ে যদি হারাতে হয় যা কিছু প্রিয় যদি না থাকে পাবার আশা, তাহলেও করতে হবে তাঁর ইচ্ছা পূরণ।" বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কট বিমোচনের জন্য যে একটি সাহায্য কমিটি গঠিত হয় বিচারক এস এ মাসুদকে নিয়ে তিনি তার একজন সদস্য ছিলেন এবং সুশীল ভদ্র ও সুশীল মুখার্জী নামে কলকাতায় দুজন সজ্জন ছিলেন। সভাগুলো হয়েছে প্রায়শ অন্নদাশঙ্করের বাড়িতে। সভার কার্য উপলক্ষে আমরা অন্নদাশঙ্করের বিচিত্র কথকথা শুনেছি। আমার দৃষ্টিতে অন্নদাশঙ্কর রায় একজন অসাধারণ পুরুষ, যাঁর কাছে মানবপ্রেমই হচ্ছে মুখ্য। যদি একবাক্যে কাউকে মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে হয়—হিন্দু হিসাবে নয় অথবা মুসলমান হিসাবে নয়, তবে যে ব্যক্তির দিকে আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করবো তিনি হচ্ছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর রচনা যেমন আমাকে মুগ্ধ করেছে তাঁর রসিক চিত্তও আমাকে ততোধিক মুগ্ধ করেছে। স্বচ্ছ দৃষ্টির সন্ধানী আলো ফেলে তিনি কোথাও অন্ধকার রাখেন নি। তাঁর সমস্ত রচনার পশ্চাতে একটি বিদগ্ধ জীবনকে অনুভব করা যায় তা যেমন উজ্জ্বল তেমন করুণ। অন্নদাশঙ্করের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই।

সৌজন্যে ঃ 'মান্দাস'

উজ্জয়িনী ও তার আত্ম-অন্বেষণ

অশ্রুকুমার সিকদার

অন্নদাশঙ্কর যখন 'সত্যাসত্য' রচনায় হাত দিয়েছিলেন তখন উদ্দেশ্য ছিল 'এপিব তথা রূপক' হবে উপন্যাসটি।[১] অচিরেই 'রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল'।[১] নায়ক-নায়িকা তিনজনের তিন পন্থার কথা বলেছেন প্রত্যাহৃত ভূমিকয়, সুধীর মাগ ইনটুইশনের, বাদলের ইনটেলেকটের, উজ্জয়িনীর আত্মনিবেদনের। উপন্যাসের আইডিয়া মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল কুশীলবেরা হুকুম মানে না লেখকের তাই উজ্জয়িনীর পন্থা আত্মনিবেদনের থাকে না ; উপন্যাসের শেষে দেখা যায় পন্থ যাই হোক, লক্ষ্য হয়ে উঠেছে আত্মানুসন্ধান। নায়ক-নায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা আর প্রয়াসের মহত্ত্ব দিয়ে যদি হয় উপন্যাসের এপিকত্ব, তাহলে 'সত্যাসত্য' আধুনিক এপিক কারণ তার মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্ত সমস্যা জটিলতা, নতুন নতুন সামাজিব অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ, মানবকল্যাণের নানান পরস্পরবিরোধী আদর্শকে অতি নিপুণভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। একদিকে যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, নৈরাজ্যবাদের ভাবনা, অন্যদিকে উদারনীতি ও সমাজতন্ত্রের বিরোধ, ফ্রি ট্রেডের সঙ্গে প্রোটেকশনিজমের বিরোধের পুরনো বিতর্কগুলো উঠে এসেছে, তারই সঙ্গে বিচার করা হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রীয় মতবাদগুলির—সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ, কম্যুনিজম্, ডিকটেটরশিপ, স্ট্যালিনিজম্ ও বিপ্লববাদের নানা তন্ত্রের। সুধীচরিত্রের মাধ্যমে এসেছে স্বরাজের প্রশ্ন, গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা ও সার্বভৌম প্রয়োগের সমস্যা। পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে যুদ্ধবর্জন, অস্ত্রত্যাগ ও শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়ানুভূতির তুলনা, পরিবেশ ও জৈব উত্তরাধিকারের বিতর্ক, মনস্তত্ত্ব ও মিস্‌টিসিজম্, দেশকালের নূতন ধারণা, বিবাহবন্ধনের চিরন্তনতার প্রশ্ন। অর্থাৎ সেই সমস্ত সমস্যা যা প্রথম সমরোত্তর স্বত্ত্বরোপের চিত্তকে ক্রমাগত আলোড়িত ও বিচলিত করেছিল। এই উপন্যাস-সমষ্টি আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ হয়েও কেন্দ্রাভিমুখী, সেখানে মানবকণ্ঠের বিপুল কোলাহল, তার দর্শনে আধুনিক জীবন প্রতিবিম্বিত বলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল, 'সত্যাসত্য'-এ একটি মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও বিশালতা রয়েছে।'[২]

কিন্তু রূপকের দাবীর মতো এপিকের দাবীও অবশ্য পরে লেখক তুলে নিয়েছিলেন বলেছিলেন, 'সত্যাসত্য' শুধুই বৃহৎ উপন্যাস।[৩] হয়তো নায়ক বাদলের চরিত্রের

বায়বীয়তার জন্যেই এটা বলা। বাদলের মানসিক পরিবর্তনের তীব্রগতি ঘূর্ণিপাকের সঙ্গে তার চরিত্রের অগ্রগতি সমতা আনতে পারেনি। 'কমিউনিস্ট বাদল, মিস্‌টিক বাদল', নানা বাদলের দেখা পেলাম বটে কিন্তু তার অন্তিম পরিণতিতে কোনো সত্য জিজ্ঞাসার অপরিহার্য ফল বলে মেনে নেওয়া গেল না। বড় বড় রাশি বসানো হলো। যোগফলে এত বড় শূন্য সেই রাশিগুলিকে মিথ্যা করে দিল বলে বাদলের মাত্রা দুর্বল হয়ে গেল।'[৫] বাদল মানুষের মুক্তিসন্ধানের প্রতীক হয়ে থাকল, সেই সন্ধান তার চরিত্রে সত্য হয়ে উঠল না ; তাই গোরার ভারত-জিজ্ঞাসা, শচীশের বা জাঁ ক্রিস্তফের আত্মজিজ্ঞাসা যেমন বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে, বাদলের সন্ধান তেমন বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না। বাদলের মতের অগ্রগতির সঙ্গে বাদলের চরিত্র তাল রাখতে পারে না। অপরপক্ষে বাদলের বন্ধু সুধী, যাকে উপন্যাসের দ্বিতীয় নায়ক বলা চলে, যার মধ্যে লেখকের গান্ধীবাদী ও টলস্টয়পন্থী বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে, সেই স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ, ভারত-আত্মার প্রতিভূ সুধীর কোনো অগ্রগতি নেই।

একেবারে শেষে উজ্জয়িনী ও কুমারকৃষ্ণ দে সরকারের তীব্র কোনো কোনো প্রশ্নে সে বিচলিত ও সংশয়ান্বিত হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটের উপর সে নিজের প্রজ্ঞানুভূতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ। ইউরোপের বিতর্কমূলক পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে তার অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার ঘটেছে বটে, কিন্তু আদর্শের বর্মপরা এই মানুষটির মৌলিক প্রকৃতির কোনো রূপান্তর ঘটে নি। সে যেন সত্যের নৈর্ব্যক্তিক রূপকই থেকে গেছে। বাদলের বাষ্পময় ঘূর্ণাবর্ত বিশ্বাসের ভিত্তি পায় না, আর সুধীরের কোনো সন্ধানময় পরিক্রমা নেই। তুলনায় তৃতীয় চরিত্র উজ্জয়িনীর আত্মানুসন্ধান তাই আমাদের আকৃষ্ট করে বেশি।

'স্বাধীনতার চর্চাই আমাদের দেশে নেই, স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত অবিশ্বাস করি.......'[৬] এই কথা যেমন আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সত্য, তেমনি সত্য ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও। 'সত্যাসত্য'-এর শেষ খণ্ডে নায়িকা উজ্জয়িনী জানায় আত্মআবিষ্কারের কঠিন কাজই এখন তার কাজ এবং সেই কাজে নেমে সে জেনেছে 'স্বাধীনতাই সংসারের সেরা সুখ।' যে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতাই স্বীকৃতি পায় না, সেই ব্যক্তি যদি আবার নারী হয় তাহলে তো কথাই নেই, সেই সমাজের মানুষ উজ্জয়িনীর স্বাধীন আত্ম-আবিষ্কারের আধুনিকতা এই উপন্যাসের একটি প্রধান প্রসঙ্গ। অবশ্য সেই মুক্তির আধুনিক ভাবনাটিকে রূপায়ণের জন্য সুবিধাজনক পটভূমি হিসেবে লেখক বেছে নিয়েছেন ইউরোপকে, আমাদের কর্তাভজা শাস্ত্রমানা দেশকে নয় ; ইউরোপকে—যেখানে সামাজিক মুক্তির ও মনের মুক্তির প্রয়াসের ইতিহাস দীর্ঘ এবং রোমাঞ্চকর। আর উজ্জয়িনীর আত্ম-আবিষ্কারের ইতিহাসকে জানতে হলে তার সঙ্গে প্রতি তুলনা করতে হবে 'নৌকাডুবি'-র কমলার ও 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার। কথাটা অন্নদাশঙ্কর নিজেই তুলেছেন। 'কমলা যদি ইউরোপে জন্মাতো, রমেশকে ভালবেসে

ভালবাসার সাজা সইত, বিবাহের উপায় না থাকলে কেঁদে ব্যর্থ হয়ে যেতো। কিন্তু নলিনাক্ষের ঘর করতে রমেশের ঘর ছাড়তো না, কিম্বা রমেশের জন্যে বেশ্যা হয়ে যেতো না। শুধু সধবাদের পক্ষে কেন, আমাদের বিধবাদের পক্ষেও পুনর্বিবাহ বেশ্যা হয়ে যাবার সামিল পাপ। স্বামী তো তাদের কাছে মানুষ নয়, যে একটি মানুষকে হারালে বা ভুলে গেলে আরেকটি মানুষকে বিবাহ করবে।' দ্বিতীয় উদাহরণ বিমলার। নিখিলের সঙ্গে ন'বছর ঘর করার পর বিমলা যদি খবর পেতো নিখিল আসলে তার কেউ নয়, সন্দীপই তার স্বামী, তবে বিমলা সন্দীপের পায়ের ধুলো নিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটাতো। 'নিখিল যে সন্দীপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা সন্দীপের চেয়ে তাকে বেশি ভালবাসে এটা আকস্মিক। নিখিল যদি তার দাদাদের মতো মাতাল ও বেশ্যাসক্ত হতো আর সন্দীপ হতো সাক্ষাৎ যীশুখ্রীষ্ট ও বিমলাগত প্রাণ তবু বিমলা শেষ পর্যন্ত নিখিলেরই থাকত এবং পরপুরুষকে কিছুকাল মনে মনে ভালবেসেছিল বলে হয়তো কঠিন আত্মনিগ্রহ করত।' আরো লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর, 'বিমলাকে নিখিলের হারাবার প্রশ্নই ওঠে না, বিমলা তো কোনদিন নিখিলেরই ছিল না, সে তার স্বামীর।' সুতরাং ব্যক্তি নিখিলকে চিরটাকাল স্বামীত্বের প্রতিমার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকতেই হবে, এই তার শাস্তি। 'নিখিল যে নিখিল বলেই একজনের প্রিয় এ উপলব্ধি তার কোনোদিন হবার নয়।'" 'সত্যাসত্য' উপন্যাস নিয়ে অন্নদাশঙ্কর চেয়েছিলেন 'নৌকাডুবির প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করতে, ঘরে বাইরের পরিণামকে উলটিয়ে দিতে।' তা হলে সত্যাসত্য একদিন থেকে কমলা ও বিমলার উত্তরসুরি উজ্জয়িনীর কাহিনী।

উজ্জয়িনী যে স্বাধীনতা চায় তার অন্য নাম নিজত্ব বা প্রাতিস্বিকতা। সেই লক্ষ্যে সে সহজে পৌঁছায়নি। তার এই যাত্রাও অসত্য থেকে সত্যে যাত্রা, আধুনিক সত্যের দিকে যাত্রা। তার সে কঠিন, বিপদসঙ্কুল, পঙ্কিল, অসরল যাত্রার ইতিহাস 'সত্যাসত্যে'-এ বিধৃত। বাদলের বাবা চেয়েছিলেন বিলেত যাবার আগে বাদল যেন বিয়ে করে যায়। যাকে ভালবাসে না তাকে বিয়ে করতে যদিও প্রিন্সিপেলে বাধে, তবু বাদল বিয়ে করতে রাজি হয় সুধীরের পরামর্শে। বাদল চায় ডিভোর্সের পথ খোলা রেখে বিয়ে করতে, আর সুধী বলে 'বিয়ে করে প্রমাণ করে দে বিয়ে বলতে কিছুই বোঝায় না।' বাদল তার নীতি ব্যাখ্যা করে চিঠি লিখলে উপন্যাসের প্লটের প্রয়োজনেই সেই চিঠি উজ্জয়িনীর হাতে পৌঁছোয় না। ফলে ঘটে যায় বিয়ে, তৈরি হয় পরবর্তী জটিলতার ভিত। উজ্জয়িনীর ডাক্তার বাবা ছিলেন যেন 'চতুরঙ্গ'-এর শচীনের জ্যাঠামশাইয়ের তুল্য, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও মেথডের প্রবক্তা। বিয়ের সম্ভাবনায় উজ্জয়িনী অনুভব করে তার জীবন যেন এতদিন অর্ধাশনে কেটেছে, কোনো রসের পরিবেশন ঘটেনি জীবনে; বাদলকে প্রথম দৃষ্টিতে তার ভাল লাগলেও বাদলের কাছ থেকে তার রসের পিপাসা কোনো সায় পায় না। সে ব্যবহার করে, যেন স্বামী নয়, দাদা। উজ্জয়িনীকে উপহার দেয় ডি. এইচ. লরেন্সের বই, তাতে লেখে উজ্জয়িনীর কুমারীকালের পদবী, গুপ্ত।

বিয়ের অব্যবহিত পরেই বাদল চলে গেল বিলেতে। বাদলের অনুপস্থিতিতে বিরহিণী তার স্মৃতি রোমন্থন করে। এক বিছানায় রাত কাটানোর স্মৃতি, বাদলের লাজুক অথচ বাচাল স্বভাবের কথা তার মনে পড়ে। স্বামী কথাটা উচ্চারণ করতে সে শরমে শিউরে ওঠে। প্রেম কথাটা সে বইতে পড়েছে, এখন বোঝে তার একটা অর্থ সঙ্গকামনা। কিন্তু বিয়েটা আসলে উজ্জয়িনী একাই করলো, বাদল হল নামমাত্র বর। দেহেমনে তাই উজ্জয়িনী কুমারীই রয়ে গেল। বাদলের দেওয়া ইবসেনের A Doll's House পড়ে ভাল বোঝেনি জানালে সুধী তাকে লেখে, 'স্ত্রী দাবী করছে নূতন সামঞ্জস্য, নূতন সহমর্মিতার আদর্শ। নতুবা সে যেন একটি পুতুল।' এই কথার তাৎপর্য উজ্জয়িনী বুঝেছিল অনেক পরে, এখনো তার মর্ম বোঝার মানসিক পরিণতি তার ঘটে নি। সেও নোরার মতো ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল।

পাটনায় স্বামীহীন শ্বশুরালয়ে এলো উজ্জয়িনী। এখানে প্রতিবেশিনীর সরল দাম্পত্যজীবন তাকে দেয় এক অনাস্বাদিত স্বাদ। বৌটি শাশুড়িকে ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনায় আর সে মুগ্ধ হয়ে দেখে। তাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আধ্যাত্মিকতার স্থান ছিল না, বৈজ্ঞানিক মেথডে দীক্ষিত তার বাবা ছিলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয়বাদী। আর এখন ধর্ম-গ্রন্থে উজ্জয়িনী পেল যেন ভিটামিনের স্বাদ। নিরীশ্বরবাদী যুক্তিবাদী জ্যাঠামশাইয়ের প্রভাব কাটিয়ে বিপরীত রসের সন্ধান যেমন শচীশ পেয়েছিল লীলানন্দের আশ্রমে তেমনি। সে পড়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' 'ভক্তমাল' গ্রন্থ। ভক্তিমার্গের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার মন, প্রতিবেশিনী বীণার শাশুড়িই যেন হয়ে ওঠে তার গুরু। নিরামিষ খেতে শুরু করে, ধর্মালোচনায় তদ্গত মনে যোগ দেয়। শ্রীরাধিকার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মেলায় উজ্জয়িনী। ভাবে কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে মরবে, বৃন্দাবনে গোপী হয়ে জন্মাবে। এই রসের সাধনা যে বাদলের অনুপস্থিতির প্রতিক্রিয়া, কৃষ্ণ যে উজ্জয়িনীর ক্ষেত্রে বাদলের অভাবজনিত মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ করছে তা স্পষ্টতর হয়ে যায় যখন জানতে পারে ধ্যানে বসলে তার মনশ্চক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ক্রমশ বাদলের মূর্তি হয়ে ওঠে। উজ্জয়িনী যখন নোরার ধরনে সুধীকে জানায়, সংসারে নয়, সংসারের বাইরে তার জীবনকাঠি, তখন সুধীভাবে উজ্জয়িনীর এখন তো ভাবপ্রবণতারই বয়স। এই বয়সে মানুষ আত্মপীড়ন করে, গুরু মানে, মহৎ হবার সংকল্প করে, পারে না বলে আক্ষেপ করে। কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই। 'উজ্জয়িনী নিজের বানানো মূর্তি নিজের হাতে ভাঙবে।'[২১] এক আতিশয্যের জায়গায় আসবে অন্য আতিশয্য, সমন্বয়-সংযমের সময় আসবে পরে। ইতিমধ্যে সুধী খবর পায় উজ্জয়িনী গৃহত্যাগ করে তীর্থযাত্রী হয়েছে।

সেই নিষ্ক্রমণের আগে মেয়ে বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়েছে জেনে বাবা যোগানন্দ দেখতে এসেছিলেন মেয়েকে। মহা নাস্তিক বাবাকে দেখাশোনার ফাঁকে উজ্জয়িনী কৃষ্ণসেবা করে, কীর্তন গায়। ইতিমধ্যে এক মাতাজী উজ্জয়িনীর শ্বশুরালয়ে এসে উপস্থিত হলে

মহা অনর্থ বাধে। যোগানন্দ অবাক হয়ে ভাবে এইসব ইতরলোককে কীভাবে উজ্জয়িনী প্রশ্রয় দিচ্ছে। লীলানন্দ স্বামীর পায়ে শচীশ হাত বুলিয়ে দেওয়াতেও এইভাবে শ্রীবিলাস আঘাতে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে উজ্জয়িনী ভাবে মাতাজীকে মাসিমার মতো মনে করার সামান্য নৈসর্গিক স্বাধীনতাটুকুও কি তার থাকবে না? এই নারী কৃষ্ণগতপ্রাণা, কিন্তু পাটনার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরের সঙ্গে মুঙ্গেরে যেতে তার মন ওঠে নি, কারণ পাটনার 'এ বাড়ি যে এখনো বাদলকে ধেয়ায়।' দীনহীনদাস বৈরাগীকে নিয়েও তার সমস্যা কম হয় না। একদিকে স্বগৃহে মহাজনসেবায় সে যেমন তৃপ্ত, অন্যদিকে হাকিম শ্বশুর কর্তৃক বৈরাগী বিতাড়নে সে ক্ষুব্ধ। কবি ত্রিভঙ্গমুরারি মিশ্র কবিতায় উজ্জয়িনীর বন্দনা করে তার যেন ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সে আর দেহের অযত্ন করবে না কৃচ্ছ্রসাধনার বশবর্তী হয়ে, রূপলাবণ্যের যত্ন নেবে, কারণ তার এ দেহ তো ভোগায়তন নয়, এ যে কৃষ্ণসুখাধার। মাতাজী মাসিমার দেওয়া গুরুর পাদোদক মেশানো জল খেয়ে বিবমিষায় মরে উজ্জয়িনী, বাবার কাছ থেকে পাওয়া বৈজ্ঞানিক সংস্কার কেটেও কাটে না তার। পরে অবশ্য জীবাণু আক্রমণের ভয়, বিবমিষা সে জয় করে। মাতাজীর সংসারত্যাগ ও বৈষ্ণবী হওয়ার কাহিনী শুনে সে ভাবে, অস্পৃষ্ট দেহ তার, শুচি তার আচরণ, তাহলে সে কেন গোপীদের মতো কৃষ্ণকে পাবে না। আবার তার ভাবাবেগপূর্ণ কান্না মাতাজী দেখে ফেললে সে অপ্রস্তুত হয়। লেখকের মন্তব্য পেয়ে যাই, 'অহো অভিজাত কন্যা'! 'তোমার প্রাইভেসির সংস্কার সকল সংস্কারের সেরা।' উজ্জয়িনী এখন কৃষ্ণ-অনুগামিনী হওয়ার জন্যে, আত্মনিবেদনের জন্যে প্রস্তুত। তার সর্বদেহ রসে টসটস করছে যেন পূর্ণ মধুকোষ তার দেহ। বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বলে সে এ বাড়িতে ছিল, বাবাই যখন নেই তখন এ বাড়িতে থাকার আর কারণ নেই। সে ব্রজে যাবে।

নির্মমভাবে কাটলো চুল, পরে নিল বাদলের ধুতি পাঞ্জাবী, পুটলিতে কৃষ্ণের পট। 'বাবা, তুমি আর একবার সমর্পণ করলে। এবারে বৃহৎ সংসারের পরম নিয়ন্তার হাতে। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।' ইশারায় জানা গেল, বাদল তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই কৃষ্ণে তার সর্বসমপণ। ওদিকে যখন অনুসন্ধানের প্রহসন চলেছে ততক্ষণে ট্রেনে চেপে বসেছে উজ্জয়িনী ; স্বাধীনতার আনন্দে, নতুন উদ্দীপনা ও দায়িত্ববোধে মাতোয়ারা। ট্রেনের সহযাত্রিণী যখন তাকে ভাবে বিধবা, তখন সে মনে মনে বলে, 'আমার কানু যে অমর, আমি চিরজীবন অবিধবা। আমি জন্মজন্মান্তর অবিধবা।' এই সহযাত্রিণী টিকিট কিনে দেয়, নিয়ে আসে তাকে কাশীর বাড়িতে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করায়। জেনে নেয় উজ্জয়িনীর কাহিনী—স্বামীর সঙ্গে সংযোগহীনতা আর বাবার মৃত্যুর কথা। আর সুশীলাই তাকে সাবধান করে দেয়, 'দেখো, যেন সামান্য পুরুষকে কানু বলে ভুল কোরো না।' আর অসুস্থ অবস্থায় প্রলাপের ঘোরে সে যা বলেছে তাতে বোঝা যায় তার বৈষ্ণবীয় আকৃতি সমস্তই পুঁথির বিদ্যা, তার কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যক্ষ অনুভূতিজাত নয়, পুস্তকের রাজ্যের স্বপ্ন। উজ্জয়িনী যখন জানে সুশীলাবতী

আসলে বাইজী, তখন তার মন একেবারে বিমুখ হয়ে ওঠে। সুশীলাও ক্ষুব্ধ হয়েছিল উজ্জয়িনীর প্রতিক্রিয়ায়। অপরিচিত অভিজ্ঞতার সামনে এসে বারেবারেই উজ্জয়িনী থমকে দাঁড়ায়, বিমুখ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিরূপতাকে জয় করে। এইভাবে এগিয়ে চলে তার আত্মানুসন্ধান। যেমন গুরুর পাদোদক মেশানো জলপানে তার বিরূপতাকে সে অতিক্রম করেছিল, তেমনি অতিক্রম করে সুশীলার বেশ্যা পরিচয়ে তার বিমুখতাকে। বরং পেশাদার গায়িকা সুশীলার প্রশংসা কীর্তন গানে তার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে।

কাশী থেকে বেরিয়ে এই আত্মিক অভিযাত্রিণী চলেছে বৃন্দাবনের পথে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে। থার্ডক্লাসের একাকার এই অভিজাতকন্যার প্রাইভেসিবোধকে পীড়িত করে। শ্রীহীন শহর, বানর, দোকানদার, ভিখিরির উৎপাত তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটাতে চায়। কিন্তু পারে না, অটো-সাজেশসন বা স্বতঃঅভিভাবনার দৌলতে সে আত্মহারা। 'সে আছে ব্রজধামে, সে আছে গোপীজনবল্লভের লীলানিকেতনে, সে আছে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন-বাসরগৃহে এই মহতোমহীয়ান নিত্য সৌভাগ্যের পটভূমিকায় তার বহুবিধ অনভ্যস্ত আচার ও অভিজ্ঞতা নিষ্প্রভ হয়ে ধন্য হয়েছে।' উজ্জয়িনী কৃষ্ণের মুখের ধ্যানে মগ্ন। একদিন নামগানের আসরে, সে গেয়ে ওঠে গান, "লহ জীবন-যৌবন হ'লো মাধুরী নিবেদন" সচকিত হয়ে ওঠে শ্রোতা, খ্যাতি রটে যায় তার কীর্তনমাধুর্যের। এই মগ্নতার জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলো এক মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, যা অন্য দিক থেকে কৌতুকজনকও বটে। সুশীলাবতীর সতর্কতা অগ্রাহ্য করে সে সামান্য পুরুষকেই ভাবল তার আরাধ্য কানু। ত্রিভঙ্গ বংশীধারী এক লম্পটকে কানু ভেবে সে প্রণাম করে। তার কণ্ঠলগ্ন হয়। কিন্তু যৌনসংযোগের জন্য সেই মেকি কানু কাপড়ে হাত দিতেই চমক ভেঙে যায় তার। 'যে প্রকৃতি তাকে মিলনোন্মুখ করেছিল সেই প্রকৃতি তাকে সহসা বিমুখ করলো।' অন্যসব বিরুদ্ধ অভিজ্ঞতার মতো এই বিমুখতাও জয় করতে চেয়েছে উজ্জয়িনী। কানুকে সে কেন ফিরিয়ে দিল এই ভেবে অনুতাপে অনুশোচনায় নিজেকে সে জর্জরিত করেছে। পরের রাতেও আত্মনিবেদনে সে যখন অবশ, তখন জ্ঞান পেয়ে আবিষ্কার করে পরনে শাড়ি নেই তার, কে যেন তার অন্তর্বাস খোলার চেষ্টা করছে। সে তো সব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, তবে কেন এই দস্যিপনা। তখনো সে ভাবে কুকুরের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ মুখে দিতে যেদিন বাধবে না সেদিন হবে সিদ্ধিলাভ।' কিন্তু খাঁটি বিলিতি ব্লুমার্স তো মেকি কানু জন্মে দেখে নি! তার দস্যুতা অক্ষমতাজনিত ইতর গালিগালাজে অবশেষে চৈতন্য হয় উজ্জয়িনীর ; এতো কানু নয়, কোন দস্যু এ! বিজাতীয় অন্তর্বাসের কল্যাণে সে বেহায়া লম্পটের হাত থেকে রক্ষা পায়। নায়িকাদের সতীত্ব রক্ষায় লেখকদের কতো কৌশলের কথাই না ভাবতে হয়। যাই হোক, অশুচিতার জন্য অনুতাপে তার মনে জেগে ওঠে আত্মহত্যার চিন্তা। ভাবে বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে কাশীতে, কৃষ্ণ ছেড়ে করবে শিবের আরাধনা। এমন সময় পুরোনো

পরিচিত বিভূতি ও বাদলের বন্ধু সুধীর সঙ্গে সাক্ষাতে আর আত্মানুসন্ধানের আর এক পর্বের অবসান হয়।

সুধী আর বিভূতি তাকে খুঁজতেই এসেছিল। বিভূতির কুকুর ড্রামণ্ডকে দিয়ে, নারীবেশী লম্পট ভূষণলালের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ঘটিয়ে উজ্জয়িনীর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হয়। সে সুধীকে বলে, 'আমি পরিত্যক্তা শুধু পতির নয়, পরমপতির।' কলঙ্কিনী সে, অশুচি! গৃহে তার প্রবেশ নেই, গৃহবধূদের থেকে সে দূরে। সে চলে যাবে সুশীলাবতীর কছে, বারাঙ্গনাই হবে সে। সুধী পরামর্শ দেয় সামান্য স্খলনকে বাড়িয়ে না দেখতে, ক্ষণিককে চিরন্তন মনে না করতে। আর উজ্জয়িনী তার জীবনের এক পর্বের চূড়ান্ত ব্যর্থতার মুহূর্তে অকপট স্বীকারোক্তি করে, 'আমার স্বামীকে আমি প্রথম দিন থেকে ভালবেসে এসেছি, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, আজো, এখনো।' এখন আবার সন্দেহ হয় যে স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল বলেই মাত্র তার এই আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস। সুধী অবশ্য জানায় উজ্জয়িনীর উপর বাদলের কোনো বিরাগ নেই। ওর রাগ উজ্জয়িনীর সঙ্গে বন্ধনের উপর, বন্ধনমাত্রেরই উপর। উপদেশের কণ্ঠস্বর যার গলায় চট করে চলে আসে, সেই সুধী তাকে 'কলঙ্কবতী' উপন্যাসের শেষে পরামর্শ দেয়—'তুমি হও জীবনশিল্পী। জীবনকে পরতে পরতে পর্বে পর্বে আপন হাতে সাজাও। গান শিখতে যাচ্ছিলে লীলাবতীর কাছে। মনে কর, তোমার জীবনটিই একটি গান।'

উজ্জয়িনী চলে এলো বিলেতে মা সুজাতার সঙ্গে। উজ্জয়িনীকে নিয়ে সুধীর উদ্বেগ ও দায়িত্ববোধকে অশোকা ঈর্ষা করে, যেমন ঈর্ষা করে সুধীর প্রতি সুজাতার মৌন আত্মনিবেদনকে জজকন্যা অশোকা, সে ভালবেসে ফেলেছে ভারত আত্মার সন্ধানী ইন্দ্রনাথকে। ঈর্ষাপরায়ণা অশোকা সুধীকে বলে, 'বাদলের মতে বিবাহ ব্যাপারটা তো মিথ্যাচার, বশ সে করবেই উজ্জয়িনীকে। গাছ যদি লতাকে আশ্রয় না দেয় তবে মাটি তার কী করতে পারে! তাকে স্বনির্ভর হতে হবে।' তাকে, অর্থাৎ উজ্জয়িনীকে। উপন্যাসের স্ট্রোকচারের অশোকাকে এনেছেন লেখক উজ্জয়িনীর সঙ্গে বৈপরীত্যময় প্রতিতুলনার প্রয়োজনে। আমরা দেখবো অন্যকে স্বনির্ভর হতে বলে যে অশোকা সে নিজে স্বনির্ভর হতে জানে না। অশোকা চায় তার বাবা-মায়ের মনোমত সুপাত্রের গুণ অর্জন করুন সুধী। 'শিবকেও তারা সম্মান করবেন না ডিগ্রি না দেখলে। তাই শিবকেও হতে হয় ডক্টর শিব।' তাতে সুধার অন্তরের সায় না থাকায় অশোকা পিতামাতার মনোনীত পাত্র স্নেহময়েরই বাগ্দত্তা হয়। অর্থাৎ স্বনির্ভর হতে পারে না। সম্পর্ক ভেঙে যাবার পরে অশোকার চিঠির জবাবে শেষ চিঠিতে সুধী তাকে লিখেছিল, 'খুশি, তুমিও স্বনির্ভর হও।' অশোকা কিছু গতানুগতিকতায় নির্ভরশীল হলো, স্বনির্ভর হতে পারল না।

বাদলের বাবা চায় বাদল যেন একবছর উজ্জয়িনীর সাথে সহবাস না করে। গৃহত্যাগিনীর যৌনশুচিতা যাচাই করে নিতে হবে। এদিকে উজ্জয়িনী কঠিন তপস্যায়

রত। সে এখনো রাধাভাবে অবিচলিত। শুধু কানুর আসনে বাদলকে বসিয়েছে, আগে যেমন বাদলের শূন্য আসন পূর্ণ করেছিল কানুকে দিয়ে। বিলেতেও এসেছে বাদলের সান্নিধ্যের আশায়। 'আমি চাই যে তিনি তিনিই থাকুন আর আমি হই তাঁর ছায়ার মতো অনুগতা।....আমি যদি আত্মনিবেদনের সুযোগ পাই তো আমার সুখের সীমা থাকবে না।' মিস স্ট্যানহোপের আশ্রমে বাদল আছে শুনে তার প্রতি ঈর্ষা জন্মায় উজ্জয়িনীর মনে। অন্যের মুখে আবার যখন বাদলের উপলব্ধির কথা শোনে তখন সে অভিভূতের মতো শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়ে যায়। কী করবে সে ভেবে পায় না, একবার ভাবে বাদলের 'দূরবর্তিনী বান্ধবী' হবে, আবার ভাবে মায়ের প্রস্তাবিত ক্লিনিকে নার্স হয়ে প্রয়াত বাবার ইচ্ছা পূরণ করবে। কিন্তু নার্সের কাজে উজ্জয়িনী অন্তর থেকে সায় পায় না। ও তো ভালবেসে সেবা নয়, শুকনো কর্তব্যপরায়ণতা ; প্রসঙ্গত সে বলে কল্যাণের নামে, মঙ্গলের নামেই পৃথিবীতে সবচেয়ে অন্যায় হয়। 'যাকে চিনি না, জানি না, ভালবাসি না, ভালবাসাতেও মতি হয় না, তাকে বিয়ে করে, তার সন্তানের জননী হওয়া কি বিশ্রী ব্যাভিচার, কল্পনা করতেও ন্যাক্কার বোধ হয়। অথচ পৃথিবীর অর্ধেক দেশে এই হচ্ছে নারীর নিয়তি ও সতীর আদর্শ।' একদিকে স্বামীত্বের আইডিয়া বা প্রতিবার প্রতি সংস্কারবদ্ধ আনুগত্যের বশেই হয়তো সে প্রায় অচেনা বাদলের কাছে আত্মনিবেদন করতে চায়, অন্যদিকে 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনীর মতো উপলব্ধি করে ভালবাসাহীন দাম্পত্য আসলে ব্যাভিচার। এই সংস্কারমুক্ত উপলব্ধি অর্জনের পিছনে ইতিমধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে কুমারকৃষ্ণ দে সরকারের ভূমিকা! অন্নদাশঙ্কর নিজেই তো 'সত্যাসত্য' প্রসঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র কথা মনে করেছেন, সুতরাং সন্দীপের সঙ্গে কোনোকোনো দিক থেকে দে সরকারকে মিলিয়ে দেখতে বাধা কোথায়? সন্দীপ বিমলাকে বুঝিয়েছিল নরনারীর 'অ্যাফিনিটি একটা কেন? অ্যাফিনিটি হাজারটা।'[১১] সে জানিয়েছিল শুধু দেশের স্বাধীনতা চাই না, 'মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই।'[১২] সে জানিয়েছিল প্রথার নিগড় মানুষে মানুষে স্বাধীনতা সম্পর্কের পথে বাধা হবে কেন? সন্দীপের ধরনে বিবাহপ্রথা ও নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে উজ্জয়িনীর সঙ্গে অলোচনা প্রসঙ্গে দে সরকার তার সংস্কারগুলিকে ভাঙে। বিবাহপ্রথা চিরন্তন নয়, অর্বাচীন। বিবাহ-বন্ধনের বাইরে সন্তানের জন্ম হয়েছে বহু যুগ ধরে। বিবাহ ছাড়া এখন যে মিলনকে পাপ মনে করা হয় সেটা সংস্কারমাত্র। নানা দেশের বিবাহপ্রথাও বিচিত্র, একদেশে যা সমাজ-অনুমোদিত, অন্যদেশে তাই ব্যাভিচার। উজ্জয়িনীও বলে, 'বাঘিনীর যে স্বাধীনতা আছে, নাগিনীর যে স্বাধীনতা আছে, নারীর তা নেই কেন?' নারী তোমাদের পোষা গরু, পোষা মুরগী ও পোষা কুকুরের মতো গৃহপালিত জীববিশেষ!....ওরা (অর্থাৎ নাগ-নাগিনী, বাঘ-বাঘিনী) সঙ্গী-সঙ্গিনী, ওরা স্বাধীন যুগল। এরা কর্তার ইচ্ছায় সঙ্গত.....।' যখন উজ্জয়িনী সামাজিক অনড় বন্ধনের বাইরে মানুষের সম্বন্ধের স্বাধীনতার কথা বলে, তখন স্তম্ভিত সুধী উজ্জয়িনীর পিছনে দেখে সরকারের ছায়া। উজ্জয়িনী বিলেতে

পদার্পণের আগেই দে সরকার তার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। নারীমাত্রেরই উপাসক সে, সেই মানসিক প্রবণতার বশে সে মনে মনে প্রথম থেকেই উজ্জয়িনীর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা যেন স্বতন্ত্র ও গভীরতর। সুধী দে সরকারকে সাবধান করতে গেলে সে জানায় সুধী-অশোকার প্রেম যদি হতে পারে তবে উজ্জয়িনী-র প্রতি ভালবাসায় আপত্তি কেন? উজ্জয়িনী যে পরস্ত্রী সেটা আইনের দোষমাত্র, ভালবাসার পথে সেটা বাধা হতে পারে না। আইনসম্মত স্বামী বাদলের পক্ষে কোন ভালবাসা নেই। আর উজ্জয়িনীর পক্ষে যেটা আছে 'তা হিন্দু নারীর সংস্কার, ও বস্তু ভালবাসা নয়।' বাদলের প্রতি উজ্জয়িনীর আনুগত্য 'স্বামীত্বের প্রতিমার' প্রতি আনুগত্যমাত্র। 'হিন্দুর মেয়ে হিন্দুসমাজে বাড়লেও, হিন্দুস্তানের মেয়ে ইউরোপ মাড়ালেও স্বামী তার কাছে মানুষ নয়, স্বামী পট প্রতিমা।....প্রতিমাভঙ্গের জন্যে দে সরকার নিষ্ঠুররূপে প্রস্তুত হয়েছিল, তার ধনুর্ভঙ্গ পণ প্রতিমা ভঙ্গ করবেই।' তাহলে উজ্জয়িনীর কাছে যেমন বাদল তেমনি সে-ও, দুজনেই তখন হবে সমকক্ষ। দে সরকারের প্রতিমাবিদ্বেষ অনেক দিনের। সে এক বিধবা মেয়েকে ভালোবেসেছিল অতীতে। কিন্তু মৃত স্বামীর প্রতিমার প্রতি সেই বিধাবাটির আনুগত্যই হয়ে উঠেছিল বাধা। এবারে দে সরকার সহজে ছাড়বে না। বাদল তার বন্ধু হলেও যে বাদলের উপর স্বামীত্বের প্রতিমা আরোপিত সেই বাদল তার শত্রু। বাদলেরও শত্রু, বাদলের নিজত্ব তাতে আড়ালে অনড়। স্বামীত্বের আবরণ ছেদ করলে সেটা হবে বাদলের প্রতি বন্ধুকৃত্য। উজ্জয়িনীর প্রতিও এ তার সৌজন্য। 'উজ্জয়িনী সতী হবে কী করে যদি সত্যদর্শিনী না হয়? তেমন সতীত্বের মূল্য যা সত্যের নিকষে যাচাই হয় নি?'

উজ্জয়িনীর শিক্ষাভিলাষ সেও আসলে তার মুক্তি অভিলাষের প্রমাণ। সে বেহলা পিয়ানো বাজাবে, ঘোড়ায় চড়বে, সাঁতার দেবে। সে মি. ব্লিজার্ডকে বলে, 'ভারতের মেয়েরা কারো তোয়াক্কা করে না। না, ইংরেজের, না গান্ধীর, না যীশুর, মা মনুর। সব আদর্শই পুরুষের পোষাক, পুরুষের তৈরি।' যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, তেমনি শরীরেও সে লঘু হতে চায়। হতে চায় ইংরেজ মেয়েদের মতো স্বাস্থ্যোচ্ছল, আত্ম-নির্ভর, স্বাবলম্বী। তারা পুরুষের খুশির উপর নির্ভর করে না, হৃদয়বৃত্তি-মান-অভিমানে বিচলিত হয় না তারা। কিন্তু এখনো এসব কথা তার মনের উপরস্তর থেকেই উঠে আসছে। উজ্জয়িনীর সংস্কারমুক্তি এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। পরে ইউরোপ ভ্রমণকালে ইউরোপীয় মেয়েদের দৃষ্টান্তে মা হবার স্পৃহাও সে ত্যাগ করবে। অবশ্য নিস্পৃহ হবে মানে নিষ্কাম তা নয় ; বাইরে যিনি আধুনিকা, সেই মা সুজাতা তো এই কথা শুনে রীতিমতো শকড্ হয়েছিলেন। পরামর্শ দিয়েছিলেন, ঐ দেশের মেয়েদের খারাপটা না শিখতে। সে যাইহোক, এদিকে আশ্রমে বাদলের খ্যাতি শুনে ভাবে তার বাবা মানুষ চিনতেন। বাদলের মতো মানুষ একটু পাগলাটে হয়। তার মস্ত সুখ তার স্বামী মহাপুরুষ। বলেই ভাবে, বাদল কী অর্থে স্বামী। আনুষ্ঠানিক স্বামী? লোকচক্ষে স্বামী? আইনের স্বামী?

সব প্রশ্নকে থামিয়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত 'স্বামী হচ্ছে স্বামী, এই হচ্ছে চরম উত্তর।' কিন্তু জোর করে প্রশ্নকে থামিয়ে দেওয়া যায় না, ভিতরে ভিতরে ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে উজ্জয়িনীর। দে সরকার খবর আনে বাদলের আশ্রমত্যাগের। আশ্রমত্যাগে তা সঙ্গিনী মার্গারেট না মার্জোরী। শুনে অপমানে ঈর্ষায় কালির ছাপ পড়ে উজ্জয়িনীর মুখে। হাহাকারের মতো শোনায় তার বেদনার্ত জিজ্ঞাসা 'আমি কি করব?' সেবার কাজে তার আগ্রহ নেই, অসংখ্য কাজ আছে, কিন্তু কোনো কাজেই প্রবৃত্তি নেই। মার্গারেটের তার ব্রতের সহধর্মিনী করে নিয়েছে জেনে সে উতলা। মরণ কামনা করে, কিন্তু সেই কামনাও সত্য নয়। বাদলের প্রতি তার স্ত্রীর জীবনব্যাপী কর্তব্যের স্থলে তেমনি কোনো জোড়া কর্তব্য খুঁজছে উজ্জয়িনী।' 'কি করবো! ওগো আমি কি করবো। উজ্জয়িনীকে পাগল করে তোলে 'যদি সে পতঙ্গ হতো তাহলে জানতেই পারত না সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে সে মানুষ! তাই নিরন্তর জিজ্ঞাসা, বেঁচে কি হবে, কার জন্যে বাঁচবো, কার কাছে আমার আদর? সুধী সান্ত্বনা দিয়ে বলে, জীবন কাউকে বঞ্চনা করে না। আমরা বঞ্চিত এটা আমাদের ভ্রম। তাঁর যেমন আমরা খেলনা তেমনি খেলার সাথীও।'—এই সব গতানুগতিক আস্তিক্যবাদী ভোলানো কথায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে উজ্জয়িনী, আদৌ আস্থা স্থাপন করতে পারে না সে।

এমন সময় ললিতা রায় এলেন লন্ডনে, যিনি একদা উজ্জয়িনীকে পড়িয়েছিলেন। সন্তানের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে : অসম্ভব ভালবাসতেন যে স্বামী সেই নিবারণও হঠাৎ মারা গেছেন। নিবারণ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন সঙ্গীহীন একা। ললিতাও বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন সঙ্গীহীন, একা। পূর্ণ পাত্র সহসা শূন্য হয়ে গিয়েছিল তাঁর, তিনি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার আঘাতে জেনেছেন নীড় সুন্দর হলেও নীড় অস্থায়ী। ললিতাকে দেখে উজ্জয়িনীর নিজের দুঃখের ভারকে তুলনায় লঘু বলে মনে হয়। উজ্জয়িনীর প্রশ্ন ছিল, 'কেন বাঁচবো?'—ভালবাসা পায়নি যেহেতু! ললিতা কিন্তু প্রশ্ন করতে চায়, 'কেন বাঁচাবো না?' স্তব্ধ হয়ে উজ্জয়িনী মেনে নেয় প্রশ্নের যৌক্তিকতা 'কেন বাঁচাবো না? কেন বুঝে নেব না আমার অধিকার? কিন্তু অধিকার মানে কি শুধু দাম্পত্যের অধিকার? পাটনায় শ্বশুরালয়ে থাকার সময় প্রতিবেশিনী বীণার বিবাহিত জীবনের সৌভাগ্য দেখে একদা উজ্জয়িনীর মনে লোলুপতা জন্মেছিল। আজ সে দেখে ব্লিজার্ড পরিবারের পুত্রবধূ ক্রিস্টিন বিবাহিত জীবনে সুখী হয়েও অতৃপ্ত। উজ্জয়িনীর মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে, 'তবে কি নারীর পক্ষে সুখের সংসারও সোনার শিকল, স্বামীর প্রেমও কোমল বন্ধন?' যে যতোই প্রাণবন্ত হোক, বিয়ের পর পোষা মুরগীর মতো সুস্থির, স্থিতু এবং মোটা। স্বামী-সন্তান যদি বনের পাখিকে পোষ মানিয়ে মুরগী বানায় তবে পোষ মানার চেয়ে মুক্তি শ্রেয়। 'যোগাযোগ'-এর কুমু যেমন বুঝেছিল নিজের জীবনে অভিজ্ঞতা দিয়ে, এমন কিছু আছে যা সন্তানের জন্য খোয়ানো যায় না। সেই 'এমন কি নারীর নিজত্ব, তার প্রাতিস্বিকতা। 'পোষা পায়রার বকম বকম যেমন পক্ষিত্বের

অপমান স্বামীসন্তানবতীর গৃহসুখ তেমনি নারীত্বের অপমান।' ললিতার বিরূপতা সে গ্রাহ্য করে না—মুখে তার সিগারেট। সে ইউরোপীয় পোষাক পরে, আত্মরক্ষার জন্যে রিভলবার নিয়ে ললিতার সঙ্গে আমেরিকা যেতে উদ্যত। তার পোষাক ও অস্ত্রে সুধীরের আপত্তি সে কানেই তোলে না। সে নারীবাহিনীর অগ্রগামিনী হবে, মেয়েদের সংগঠন গড়বে, শিকল ভাঙবে, বন্দী করবে, বাধাবে দাঙ্গা। কিন্তু আমেরিকা-যাত্রার আগেই সমস্ত 'টান-ভালবাসা'[১৫] নিয়ে সে ঝুঁকে পড়ে সুধীর দিকে। অন্যের সঙ্গে অশোকার বাগ্‌দান আসন্ন জেনে সুধীর প্রতি সহানুভূতিতে তার মন ভারাক্রান্ত। 'আমরা দুজনে কি করে একই দুর্ভাগ্যের অধিকারী হলুম?' চলে যাওয়ার আগের দিন তাকে দেখে মনে হয় সে কী যেন সম্পদ পেয়েছে।

কিন্তু গেল না সে আমেরিকা, গেল না সুধীর জন্যই। স্কটল্যান্ডে কদিন পাহাড়ে উঠে, সাঁতার কেটে, বাচ খেলে, মাছ ধরে, মোটের উপর বাঁচাতে শিখে সে ফিরে এলো আবার লন্ডনে—'যেমন স্বাধীন, তেমনি সপ্রতিভ, তেমনি দুরন্ত।' স্কটল্যান্ড থেকেই সুধীকে সে চিঠি লিখেছিল, স্বামী বলে কাউকে সে মানে না, তার জীবন তার একার। 'এ জীবন আমি যাকে খুশি উপহার দেব।' সে তার তথাকথিত স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করে তাহলে সেই অজুহাতে সে ডিভোর্স আদায় করে নেবে। সে স্থির করেছে সুধীকেই সে তার জীবন উপহার দেবে, যে যা ভাবে ভাবুক সুধীর সঙ্গেই থাকবে। আধুনিক কালে যাকে বলে লিভিং টুগেদার, এই প্রস্তাব দেন তারই পূর্বাভাস বিবাহিত মেয়ে নিঃসম্পর্কিত পুরুষের সঙ্গে বাস করবে, সমাজ যে তা অনুমোদন করে না, সেই ব্যাপারকে উজ্জয়িনী গ্রাহ্যও করে না। নিজের কলঙ্ক-অপবাদে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই, সে শুধু সুধীর কলঙ্ক নিয়ে ভাবিত। তার মনে পড়ে সুধীরের সেই স্বপ্নের কথা। সেই স্বপ্নে সুধী উজ্জয়িনীর কাছে প্রার্থনা করেছিল বৈরাগ্য, বিনিময়ে সে তাকে দিয়েছিল কল্যাণী হবার দীক্ষা। স্বপ্নের শেষ অংশটিকে উজ্জয়িনী মনে করে সুধীরের বানানো, স্বপ্নের উপর সুপার-ইগোর খোদকারি। সুধী স্বপ্নের মধ্যে আসলে তাকে কল্যাণী হবার দীক্ষা দেয় নি, দিয়েছিল অনুরাগিণী হবার দীক্ষা! 'মুখে মানুষ সত্যি কথা বলে না, স্বপ্নে বলে।' সুধী বৈরাগী হতে চায় হোক, সে হবে অনুরাগিণী। 'সত্যিকার ভালবাসা কখনো পাপ হতে পারে না। আমি প্রতিদানও চাইনে, প্রত্যাখ্যানও গায়ে মাখি না।' তার শুধু সঙ্গতৃষ্ণা। ছায়ার মতো অনুগত হবে, নেশা ফুরলে বরং সে আত্মহত্যা করবে। বাদলের অধিকারকে সে অস্বীকার করে, সুধীর প্রতি তার অনুরাগকে আদৌ অসামাজিক মনে করে না। একদিন ট্যাক্সিতে সুধীর সঙ্গে একত্রে যেতে যেতে বলেছিল, 'তোমার কাছে যতদিন থাকি আমার শারীরিক চেতনা থাকে না। আমি যেন অশরীরী আত্মা।......অমৃত আমার অন্তরে নেই। আছে আর একজনের স্পর্শে। 'সুধীর হাত ঠোঁটে ছোঁয়ালে সুধী বাধা দিতে পারে না আর। তার আত্মনিবেদনের তীব্রতায় স্বভাবত স্থিতধী সুধী এতদূর বিচলিত হয় যে সে ভাবে, 'কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী, কে কার বন্ধু, কে কার ভাই!

সামাজিক সম্পর্কই কি সব। সেই সম্পর্কই কি রিয়ল!' সুধীর প্রতি উজ্জয়িনীর এই প্রেম অশরীরী, প্লেটোনিক বলেই মনে হয়, তবু এই একবারই সুধীর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হয়েছিল। অচিরেই আত্মসংবরণ করে অবশ্য সে। সুজাতা গুপ্তকে পত্রমারফৎ পরামর্শ দেয় ক্লিনিক খুলতে, দায়িত্ব নেবে উজ্জয়িনী। কিন্তু উজ্জয়িনী জানায় সে শূদ্রাণী নয়, সেবা তার কাজ নয়। এই প্রসঙ্গেই সে ঘোষণা করেছিল, 'আত্ম-আবিষ্কার অতি কঠিন কাজ, আমি আপাতত তাই করবো। স্বতঃস্ফূর্তিই আমার জীবনের আলো।' চিন্তা নয়, মনন নয়, এই স্বতঃস্ফূর্তির আলোতেই সে আত্ম-আবিষ্কার করবে।

দে সরকার বাদল-সুধীর সমকক্ষ হতে পারেনি, সে শেষ পর্যন্ত মালঞ্চের মালাকর থেকে গেছে। সে নিজের পুরনো রচনা উজ্জয়িনীকে পড়ে শোনায়, আবৃত্তি করে 'সুরদাসের প্রার্থনা', শেলির I fall upon the thorns of life! I bleed!' হুইটম্যানের কবিতা—'my words are weapons'। প্রেমনিবেদনের, স্তবগানের অস্ত্র এই সব। কোনো হীন অভিসন্ধি তার নেই, সে শুধু 'চোখের চাতক।' এই দে সরকারকে সঙ্গী করেই সে কালর্সবাড গেল মায়ের আহ্বানে। কিন্তু খুব অনিচ্ছায়, যেহেতু সুধীকে রেখে যেতে তার মন চায় না। সহযাত্রী হলেও প্রথম প্রথম দে সরকার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না, এ মেয়ে বাইরে পর্দা মানে না বটে, ভিতরে ঘোর পর্দানশীন। বাধা অবশ্য ভেঙে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। পূর্বপ্রণয়ের কাহিনী বলে দে সরকার, হাতে হাত তুলে নেয়। সহযাত্রী হতে চায়, এই যাত্রার শুধু নয়, সমস্ত যাত্রার। উজ্জয়িনী কঠিন হয়ে জানায় সে সুধীদার সঙ্গে দেশে ফিরবে, দেশের স্বাধীনতার জন্য যোগ দেবে নারী জাগরণে—'সব আগে স্বাধীনতা, তার পরে আহার বিহার বংশরক্ষা।' এদিকে কুমার তাকে সখী বলেছে, যৌথ নৃত্যে তার দেহে তাপ জাগিয়েছে, সে যেন কুমারের সঙ্গে চলেছে নিরুদ্দেশে, 'তনুতে-অতনুর পরশমণিরাগ।' কুমারের দেওয়া গার্ডিনিয়ার শাখা বুকে চেপে ধরে, মধুর যন্ত্রণা উজ্জয়িনীকে আচ্ছন্ন করে। সকলেই জোড়া, সে কেন একা ; সইতে পারে না এই একাকীত্ব। হর্ষে সারা দেহে জাগে শিহরণ, নিদ্রার আরাধনা হয়ে যায় বৃথা। সুপ্ত যৌবনবোধ এতদিনে যেন জেগে উঠেছে। সুধীকে সুখী করতে অক্ষম, বাদলকে সুখী করা তো নারীর অসাধ্য, তবে কি সে কুমারকৃষ্ণের বিকল্প নিয়েই তৃপ্ত থাকবে। সে নিজেকে এখন কুমারী বলেই পরিচয় দেয়, আর দে সরকারও অবিবাহিত। 'তুমিও অবন্ধন, আমিও অবন্ধনা।' কিন্তু দে সরকার তার ভালবাসার যোগ্য কিনা এ প্রশ্ন জেগেই থাকে। ওদিকে দে সরকারও নারীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার রমণসুখ চায় না। উজ্জয়িনী সতী হোক, কল্যাণী হোক, সে শুধু তার খেলার সঙ্গী হতে চায়। 'জীবনে তোমার পার্টনার হওয়া প্রশ্নাতীত। কিন্তু নৃত্যে যেন আমিই তোমার পার্টনার হতে পাই।' আনাতোল ফ্রাঁসের গল্পের বাজীকর-নায়ক যেমন বাজীর খেলা দেখানো ছাড়া ঈশ্বরানুরাগ জানানোর অন্য উপায় জানত না, তেমনি খেলার সঙ্গীমাত্র হয়েই সে তার অনুরাগ জানাতে চায়। উজ্জয়িনী জবাবে জানায়, যেদিন যথার্থ স্বকীয়া বা স্বাধীন

হবে সেদিন খেলার সঙ্গীকে সে হয়তো অতিরিক্ত উপহার দিতেও কুণ্ঠিত হবে না গৃহিনী সে হবে না, মা হবে না, মুদির হিসেব রাখবে না, কিন্তু মন চাইলে সব করবে তার আর সুধীর মিলিত বাগানের মালাকর করে নেবে কুমারকৃষ্ণকে। ইতিমধ্যে একটি চুম্বন বিনিময় হয়ে যায় তাদের মধ্যে। উজ্জয়িনী কালর্সবাডে গিয়েছিল বালিকা, ফিরে এল পূর্ণ যুবতী। এই পরিবর্তনে দে সরকারের যথার্থই অবদান আছে অনুমান করে অভিভাবকদের ভঙ্গিতে সুধী তিরস্কার করেছিল তাকে। দে সরকার জানায় পুরুষমাত্রের ঘরসংসারের সন্তানের কামনা থাকে, কিন্তু উজ্জয়িনী সাফ জানিয়েছে এসবে সে উৎসুব নয়। উজ্জয়িনীর নামে যেহেতু কুলটা কলঙ্ক তাই তাকে বিয়ে করে বাবা-মাকে সুখী করা যাবে না। এতোই যেখানে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সেখানে প্রেমনিবেদন কেন, সেখানে বরং আত্মবিসর্জনের অপার্থিব আনন্দই অভিপ্রেত ছিল। সুধী এইসব সদুক্তি করায় দে সরকার প্রশ্ন করে, অশোকা বাক্‌দত্তা। তার সঙ্গে মিলনে অলঙঘ্য বাধা, তাই বলে কি সুধী তাঁকে কম ভালোবাসে? এই প্রশ্নে নির্বাক হতে হয় সুধীকে। আর আত্মবিসর্জন? 'আমরা গৃহহীন সম্পত্তিহীন।.....আমরা সর্ববিবর্জিত। তোমার সুনাম রটবে, তুমি হবে দেশমান্য সুধীন্দ্রনাথ। আমাদের কলঙ্কের দাগ মুছবে না....। আমাদের সম্বল তে পারস্পরিক সঙ্গসুখ। তাও বিসর্জন দিতে হবে?' দে সরকার প্রতিনায়ক নয়, মূলত বয়স্য, তার সংলাপের মধ্যে 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপের কণ্ঠস্বর বাজা স্বাভাবিক নয় তবু তারো জিজ্ঞাসা প্রতাপের সেই বিখ্যাত সংরক্ত 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী!' জিজ্ঞাসার অনুরূপ। আপাতত এখানেই জীবনশিল্পী হবার পথে, প্রাতিস্বিকতার পথে উজ্জয়িনীর আত্মআবিষ্কারের যাত্রা সমাপ্ত হয়। ছয় খণ্ডের বিপুল বিস্তার সত্ত্বেও সেই যাত্রা অসম্পূর্ণ।

'সত্যাসত্য' উপন্যাস মূলত তিনজনের কথা—বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনীর। এই তিনজনের আত্মিক যাত্রার আয়োজনকে কেন্দ্র করেই বৈশ্বিক বিক্ষোভ ও আন্দোলন এই উপন্যাস-সমষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত। বাদলের অবিমিশ্র বৃদ্ধিবাদ যে সব পরিবর্তন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মবিলোপী সেবাব্রত নিষ্ঠায় রূপান্তরিত হলো তা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। তর্ক-বিতর্ক তার বুদ্ধিবৃত্তির আস্ফালনমাত্র নয়, তার সমস্ত প্রকৃতির আত্মানুশীলন, একথা 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস বা টোমাস মান্-এর The Magic Mountain-এর চরিত্র সম্বন্ধে যতোটা সত্য, বাদল সম্বন্ধে ততোটা সত্য নয়। সে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে দ্রুত ধাবমান, কোনো আভ্যন্তরীণ চাপ এই বিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে বলে পাঠকের মনে আস্থা জন্মায় না। অপরপক্ষে, সুধীরের কোনো আত্মআবিষ্কার নেই ; উত্তরকালের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আর প্রথমাবধি অর্জিত স্বজ্ঞাপ্রসূত প্রত্যয়সমূহকে আরো জোরের সঙ্গে অনুমোদন করেছে মাত্র। যে আত্মপ্রতিষ্ঠ তার আবার আত্ম-আবিষ্কার কোথায়? 'অন্নদাশঙ্করের রূপকাভিপ্রায় সুধীতে শিল্পসম্মত হয়েছে,' একথাও মেনে নেওয়া কঠিন। বরং ভারত-আত্মার এই প্রতিভূ ক্রমেই যেন

খোঁড়া আর সংকীর্ণমনা হয়ে উঠেছে। বাদল-উজ্জয়িনীর বিচ্ছেদ, পৃথক থাকা সে মেনে নিতে পারে, কিন্তু পুনর্বিবাহ তার মতে কুৎসিত। 'সেই উৎসবের পুনরাবৃত্তি অসুন্দর।' উজ্জয়িনী কিন্তু ডিভোর্স চায়, পুনর্বিবাহ করবে কিনা জানে না, মন চাইলে করতেও পারে। জীবন তার কাছে এক ড্রিফ্‌ট, স্রোতে ভেসে যাওয়া। এইসব কথা সুধীর সংস্কারকে পীড়িত করে। নর ও নারী সম্বন্ধে তার স্বতন্ত্র্য ব্যবস্থাপত্র! আন্ট এলেনরকে সে বলে বাদল মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছে বলে মানবী নিয়ে ঘর করতে বাধ্য নয় সে। তাকে সে স্বমার্গচ্যুত হতে পরামর্শ দেবে না। কিন্তু উজ্জয়িনী গৃহত্যাগ করে তীর্থযাত্রী হয়েছে শুনে সে তাকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়ে আনার সংকল্প করে। উজ্জয়িনী যখন ডিভোর্স আদায়ে সুবিধা হবে বলে স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করে তখন সুধী স্তম্ভিত হয়ে যায়। স্ত্রী স্বামীর পদস্খলন প্রার্থনা করছে এটা তার বদ্ধমূল সংস্কারে ঘা দেয়। এতদিন সে উজ্জয়িনীর পক্ষে ছিল, কারণ সে ধর্মের পক্ষে ছিল ; এখন উজ্জয়িনী তার সমর্থন হারাল, কেন না সে নাকি ধর্মের সমর্থন হারিয়েছে। ধর্ম আর দেশজ সংস্কার সুধীরের কাছে একাকার। আর, দ্বিতীয়ত সে যা ভালো মনে করে সেটাই ধর্ম, এই রকম ভাবার মধ্যে এক ধরনের নৈতিক স্থূলতা আছে। উজ্জয়িনীর সঙ্গে একত্র বাসের সমাজবিগর্হিত কাজ তার কল্পনাতেও অসম্ভব। কার্লসবাড-ফেরৎ উজ্জয়িনী যখন বাদলকে বাদলদা, শ্বশুরকে মহিম খুড়ো বলে উল্লেখ করে তখন সুধীর চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কার টগ্‌বগিয়ে ওঠে। পতি বাদল আর প্রণয়প্রার্থী দে সরকারের মধ্যে বসে উজ্জয়িনী চা পরিবেশন করছে এই দৃশ্য সুধীরের অসহ্য লাগে। সুধীর মতে বিবাহ সামাজিক ক্রিয়া, এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি দুইজনের মতামতের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। সে স্বীকার করে কার্লসবাড প্রত্যাগত উজ্জয়িনী এখন ধীর স্থির শান্ত সমাহিত সহিষ্ণু, তার মধ্যে ঘটেছে দয়ামায়া দরদ বিনিময়ের বিকাশ, কিন্তু তার সতীত্ব নেই বলে সুধী বিমর্ষ। তার সতীত্বের ধারণা সনাতন ও সংকীর্ণ। বাদলের সঙ্গে উজ্জয়িনীর স্বতন্ত্র সম্পর্ক সে মেনে নিতে পারে, কিন্তু বাদলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও অপরের সঙ্গে সহবাসের আকাঙ্খাকে সে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ ভারত-আবিষ্কারের পথে গোরা যখন ক্রমেই উন্মেষিত হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে তার দৃষ্টির পরিধি, তখন ভারত-আত্মার প্রতিভূ সুধীরের দিগন্ত সংকুচিত হয়েছে।

তাই তিনজনের মধ্যে উজ্জয়িনীর আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনীই আমাদের আকৃষ্ট করে বেশি। উপন্যাসে আমরা তারই বিশ্বাসযোগ্য পরিক্রমার ইতিহাস অনুসরণ করি—নিতান্ত বিবাহিতা নারী থেকে প্রাতিস্বিকতায় সমুজ্জ্বল মুক্ত নারীতে রূপান্তরের ইতিহাস। কিন্তু তার বিবর্তনে কিছু সংশয়াত্মক প্রশ্ন জাগে। তার মুক্তির সাধনা অনেকটাই বাদলের আচরণের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত। বাদলকে সে বিয়ের প্রথম দিন থেকে ভালবেসে এসেছে, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। বাদল যদি তার প্রতি বিমুখ না হতো, তাহলে বীণার মতো দাম্পত্য মগ্ন হ'য়ে যেতো। তার নিজের ভাষায় সেও হয়তো হয়ে উঠতো পোষমানা

পুষ্ট গিরগিটি। কোথায় থাকতো তার কানুর উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা, তাছাড়া কানু তো আসলে বাদলেরই বিকল্প। তাই মাঝে-মাঝেই কানু আর বাদল একাকার হয়ে যায় ধ্যানে। বাদল তার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে আশ্রমবাসী হলেও উজ্জয়িনী সতীস্ত্রীর মতো তার ছায়েবানুগতা হতে পারত। যখন হতে চায় দূরবর্তিনী বান্ধবী তখনো সে আসলে তার সান্নিধ্যই কামনা করে। বাদলের সুখ্যাতি শুনে তাকে অতিমানুষ ভেবে গর্বান্বিতা হয় সনাতন সতীস্ত্রীর মতোই। এই স্বামীর বিমুখতার বেদনায়, এই স্বামী অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশছে ('কমরেডদের রাসলীলা') এই ঈর্ষায় তার আত্মানুসন্ধানের পথে যাত্রা। ব্যক্তিগতভাবে উজ্জয়িনীর প্রতি বিবাহপ্রকার বন্ধনের প্রতি বাদলের নীতিগত বিমুখতা শুধু নঞর্থকভাবে উজ্জয়িনীর আত্মআবিষ্কারকে আনুকূল্য দেয় নি, বাদল সদর্থকভাবেও তাকে ঐ পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে। বাদল যদি বাদলের মতো মুক্তমনা না হতো, হতো যদি সে সাধারণ কোনো মানুষ, তাহলে উজ্জয়িনীর রূপান্তর আদৌ ঘটত কিনা কে জানে। বিবাহে বাদলের আস্থা নেই, জৈবিক নিবৃত্তি বিবাহ ব্যতিরেকেও সম্ভব। বুর্জোয়া বিবাহ সে মানে না, যার পরিণতি পারিবারিক, চাকরি, শাড়ি, গাড়ি, ইনস্যুরেন্স, সন্তান! উজ্জয়িনী যদি অন্যকে বিয়ে করে সুখী হয় তাহলে সে খুব খুশি হবে। বাবা বিয়ে দিতে জোর করায় সে যে ধর্মঘট করে নি, সেজন্য সে অনুতপ্ত, ক্ষমাপ্রার্থী। নাকচ হোক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই তার প্রস্তাব। উজ্জয়িনী আমেরিকা যাচ্ছে শুনে বাদল তাকে bon voyage জানাতে আসে অকুণ্ঠচিত্তে। উজ্জয়িনী যখন বলে তখন তার কথাকে বাদল সানন্দভাবে সমর্থন করে। উজ্জয়িনী সুধীর একত্রবাস করতে চাইলে সুধী স্তম্ভিত হয়, কিন্তু মুক্তমনা বাদল তাদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান করে দেয়—'ফ্ল্যাট নাও আমার নামে। আর সেই ফ্ল্যাটে তোমরা দুজনে থাক।' বিবাহবন্ধনকে অস্বীকার করে উজ্জয়িনীকে আত্মানুসন্ধানের পথে এগিয়ে দিয়েছে। বাদলের এই সহায়ক ভূমিকা সম্পর্কে উজ্জয়িনী সচেতন এবং তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ। বাদলের সঙ্গে বিয়ের দৌলতেই সে বাবা-মায়ের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। বাদলও স্বামীত্বের দাবীকে অস্বীকার করে তাকে মুক্তি দিয়েছে। 'এখন বুঝেছি স্বাধীনতাই সংসারের সেরা সুখ।' যে বাদল অধীনতার মোহ ভাঙিয়ে তাকে স্বাধীনতার দীক্ষা দিয়েছে তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে কি করে! কিন্তু বাদল যদি বাদল না হয়ে অন্য ধরনের মানুষ হতো তাহলে উজ্জয়িনী আত্মআবিষ্কারের আভ্যন্তরীণ তাগিদ অনুভব করতো কি? এই সংশয় যেমন সঙ্গত, তেমনি এটাও ঠিক যে কোনো নিরাবলম্ব আইডিয়ার প্রেরণায় মানুষের আত্মিক রূপান্তর ঘটে না, ঘটে না অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্বে, বৈপরীত্যের সমন্বয়ে, ঘাতে ও প্রতিঘাতে। বাদলের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাই তাকে নিয়ে গেছে নিজেকে খোঁজার তীর্থ পরিক্রমায়। তবু সংশয় থেকে যায়। উপন্যাশস-সমষ্টির শেষ উজ্জয়িনী বাদলের কাছে ক্ষমা চায়, তার চরিত্রে সন্দেহ করেছিল বলে। সে স্বীকার করে, আগে যদি জানতো

বাদলের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তবে সে এতদূর এগোত না। অর্থাৎ বাদল কর্তৃক বিবাহবন্ধনকে অস্বীকার করার সঙ্গে বাদলের সঙ্গিনীদের প্রতি ঈর্ষাই তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। এই স্বীকারোক্তির ফলে উজ্জয়িনীর আত্মানুসন্ধান তার ভিত্তি হারিয়ে ফেলে। সে যখন, ঈষৎ যেন বিষণ্ণভাবেই, বলে, সে আর তার স্ত্রী নয়, অন্যকে ভালবাসে এখন, তখন বাদল জবাব দেয়, 'আমি স্বাধীন হলে কি তুমি অগত্যা স্বাধীন হও না?' তাহলে উজ্জয়িনীর মুক্তি কি যথার্থ মুক্তি নয়, সে কি নিতান্তই 'অগত্যা স্বাধীন'? তাই যদি হয়, তাহলে উজ্জয়িনীর আত্ম-আবিষ্কারের অভিযানও, বাদল ও সুধীর অনুসন্ধান ও রূপান্তরের মতোই, হয়ে যায় অনেকটা অতৃপ্তিকর।

অন্নদাশঙ্করের এই উপন্যাস-সিরিজ বিস্ময়কর এই কারণে যে, এইসব অতৃপ্তি তার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

উল্লেখপঞ্জী :

১। প্রত্যাহৃত ভূমিকা, যাব যেথা দেশ, ১৩৬২, পৃঃ ৭।

২। তদেব, পৃঃ ৮।

৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৬৯, পৃঃ ৫০৬।

৪। যার যেথা দেশ, পৃঃ ১৪।

৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৮০, পৃঃ ৩২৫

৬। অন্নদাশঙ্কর রায়, তারুণ্য, ১৩৫৫, পৃঃ ১৯।

৭। তদেব, পৃঃ ৬৭।

৮। তদেব, পৃঃ ৬৮।

৯। তদেব, পৃঃ ৬৯।

১০। তদেব, পৃঃ ৭০।

১১। উত্তরভাষণ, অপসরণ, ১৩৬৩, পৃঃ ৭।

১২। এই বাক্যটি যখন পড়ি বা পরে দে সরকারের কথা শুনি, তখন অন্নদাশঙ্করের 'তারুণ্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রতিমাভঙ্গ" প্রবন্ধটির কথা আবার মনে পড়ে যায়। অবশ্য এই প্রতিমাভঙ্গ সুধীরের পছন্দ হয়নি।

১৩। ঘরে বাইরে, রবীন্দ্র রচনাবলী শতবার্ষিক সং, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৪।

১৪। তদেব, পৃঃ ৪৪২।

১৫। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'অচিন বাগিনী' দ্রষ্টব্য।

১৬। চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২৩।

সৌজন্যে : 'মান্দাস'

ওড়িআ সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের দান

কুঞ্জবিহারী দাশ

'দয়ানিধি' ছদ্মনামে অন্নদাশঙ্কর ঢেনকানালেতে আসা একটি সার্কাস দলের বিরুদ্ধে 'উৎকল দীপিকা'তে একখানা পত্র লিখে ছাপিয়েছিলেন। এটি তাঁর প্রথম ওড়িআ রচনা। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। তার এক বছর পরে তাঁর প্রথম লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। আঠারো বছর বয়েসেতে তিনি ওড়িআ সাহিত্যে লেখা আরম্ভ করলেন। কিন্তু দুঃখের কথা মাত্র বাইশ বছর বয়সে ওড়িআ সাহিত্য থেকে তিনি বিদায় নিলেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে তাঁর সবকিছু ওড়িআ লেখা রচিত হয়। এগুলি 'উৎকল সাহিত্য', 'সহকার', 'সবিতা' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। চৌদ্দটি কবিতা, বাইশটি প্রবন্ধ, 'স্বপ্ন' নামে একটি গল্প, কয়েকটি চিঠিপত্র এই সবই তাঁর রচনা ; সব মিলিয়ে তিনশত পাতায় 'সবুজ অক্ষর' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি প্রথম ওড়িআ বারোআরি উপন্যাস 'বাসন্তী'র আদ্য তিনটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। 'উৎকল সাহিত্য'র 'যুগবীণা' বিভাগেতে তিনি বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

১৯২৩-তে 'উৎকল সাহিত্য'র সম্পাদক বিশ্বনাথ করকে লেখা চিঠিতে ওড়িআ সাহিত্যের প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখবেন বাংলাতে না ওড়িআতে এই নিয়ে তাঁর চিত্ত দোলায়িত হচ্ছিল। "অনেক দিন লেখার অভ্যাস---বিশেষতঃ ওড়িআ লেখা---ছেড়ে দিয়েছিলাম, বাস্তবিক আপনাদের উপর রাগ করেছিলাম। বাংলাচর্চা কলেজে এসে মনোযোগ সহকারে আরম্ভ করেছিলাম। বাংলা চর্চা করতে করতে মনে হল—ওড়িআ ভাষাকে ভুলে যাওয়া ভুল হবে। কারণ যাই হোক আমি ওড়িআবাসী বাঙালী। সে দেশের মাটিকে আমি ভালোবাসি। I. A. পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। তবুও 'খেলাঘরটা' লিখে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমরা কয়েকজন কলেজ পড়ুআ বন্ধু মিলে 'Nonsence Club' বলে একটি দল করেছিলাম এবং হাতেখেলা বহু ভাষার কাগজটি চালাচ্ছিলাম। যখন সেই কাগজটাকে তুলে দিলাম তখন সাহিত্যচর্চার পথ থাকল না। মাসিকপত্রে লেখা পাঠাতে হল। বিশেষত ওড়িআ মাসিক পত্রেতে। আমরা লেখাটি আপনি প্রকাশ করার দরুণ আমার ওড়িআ জ্ঞানের উপরে একটি প্রত্যয় এল। আমি ত ভেবেছিলাম অভ্যাস বিনা ওড়িআ লেখার কৌশল ভুলে যাব। ঠিক এই সময়ে একটি প্রবন্ধ লিখে কুড়ি টাকা পুরস্কারও পেলাম। ভাবলাম ওড়িআ লেখার প্রতি

অবহেলা করলে হবে না। ওড়িশার ভবিষ্যৎ আমারই তৈরি করব। সৌখীনভাবে ইংরেজী বাংলা লিখতে পারি..... কিন্তু seriously লিখতে হবে ওড়িয়াতে।"

ওড়িআ সাহিত্য থেকে অন্নদাশঙ্করের বিদায় অতি দুঃখদায়ক ঘটনা। এতে কোনো কোনো ওড়িয়া-প্রেমী আঘাত পেয়েছেন। কবি রাধামোহন গড়নায়ক কটাক্ষ করে লিখেছেন—

"কুঞ্জবন কোইলি তুমে
কুআর কোলে যতনে বড়ি,
গিআন ধন পাইলাক্ষণি
গোত্র স্মরি গলহে উড়ি।"

এই প্রতিভাশালী লেখক রাধানাথ ও রামশঙ্করের মত ওড়িআ সাহিত্যের দারিদ্র্য দূর করবেন বলে ভরসা ছিল। তা কিন্তু হতে পারল না। তবু লক্ষ্মীনারায়ণ সাউর সম্পাদিত 'সহকার'-এ লেখার সময় যে 'বঙ্গোৎকল' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন তা সত্য হয়ে থাকল।

তাঁর গদ্য ও পদ্য এক শ্রেণীর চিন্তার বাহক। উভয় ক্ষেত্রে তিনি চারণ। জাতীয় নিষ্ক্রিয়তা ও সামাজিক অথর্বতা দূর করার জন্য তিনি প্রয়াস করেছেন। জীবনকে কর্মমুখর করার জন্য "প্রলয় প্রেরণাতে" তিনি পাঞ্চজন্য বাজিয়েছেন। 'সৃজন স্বপ্ন' ও 'প্রলয় প্রেরণা'র মধ্যে ভাবাত্মক বিরোধ আছে বলে মনে হয়। একটি ক্রিয়া, অন্যটি প্রতিক্রিয়া ;একটি দুর্বর্ষ গতি, অন্যটি নির্জীব স্থিতি। কবির মনে দ্বন্দ্বজাত হয়েছে—কর্মী হবেন না কবি? পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে দেশ ও জাতির সেবা করবেন? অধঃপতিত দেশ যখন নানাভাবে তাঁর সেবা পেতে চায় তখন অলস স্বপ্নে নিমজ্জিত হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে বিলাস। বাস্তব জগতের আহ্বান থেকে সরে যেতে তিনি চাননি। অন্তরে পীড়িতের প্রতি সমবেদনা কি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তিনি যৌবন, প্রণয় ও সৌন্দর্যের পূজারী। উচ্ছ্বসিত তরুণ অন্তর তাঁর আকাশের মত দিগ্‌দিগন্তের প্রসারিত। হৃদয়ের হিল্লোল অবাবিত গতিতে প্রবাহিত, যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি দুর্গম। অন্নদাশঙ্করের কবিতা পাঠ করলে চিরতারুণ্যের প্রলেপ, চিরসবুজশ্রী যেমন অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়, অগ্নিশিখাতে তেমনি আত্মা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। বিশ্বের প্রতি কবির আত্মা যেন এক সূর্যমুখী ফুল, অনন্ত উজ্জ্বল সূর্যশ্রীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গদ্য রচনাতে তাঁর কবিতার ভাবগুলি স্পষ্টতর হয়েছে। তাঁর গদ্য যেন তাঁর কবিতারই এক বিশ্লেষণী রূপ। কোথাও বা গদ্য পদ্য পরস্পরের পরিপূরক। গদ্যতে অন্নদাশঙ্করের কাব্যাদর্শ, জীবনদর্শন ও সমাজসংস্কার-প্রবৃত্তি স্পষ্টতর রূপ পেয়েছে। মধুসূদনের 'বসন্ত গাথার' উপরে তিনি একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন। আর একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ব্রজনাথ বড়জেনার 'সমর তরঙ্গে'র

উপরে। প্রবন্ধটির নাম 'সমর ও সাহিত্য'। আদিম সমাজের গণমৃগয়া থেকে ঐতিহাসিক যুগের যুদ্ধের ধারা ও প্রাচীন মহাকাব্য থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যে সমরের স্থান ঐতিহাসিক ধারায় বর্ণিত হয়েছে। যেখানে সভ্যতা যত উন্নত সে সাহিত্যে তত বেশী মুখ্যস্থান লাভ করেছে প্রেম ও সৌন্দর্য, যুদ্ধ নয়। প্রবন্ধটি উদ্ধৃতিবহুল হলেও উন্নত ভাবসম্ভারে সমৃদ্ধ।

'ভারতের শিল্প' প্রবন্ধটি Percy Brown এর Indian Painting এবং Havell-এর Indian Sculpture and Painting অনুসরণে লিখিত। এই প্রবন্ধটি মৌলিক চিন্তার মুদ্রা বহন করে না ; এটি মুখ্যত সমসাময়িক শিল্পচিন্তার একটি সংকলন। কিন্তু দুরূহ শিল্পতত্ত্বে তিনি যে একজন রসিক, তা এই প্রবন্ধে স্পষ্ট।

'নর চক্ষুরে নারী' প্রবন্ধে নারীকে কেমন করে অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা কিম্বা দেবী বা দানবী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, যুগ যুগ ধরে নারীর সঙ্গে নর বাস করলেও তাকে কেউ বুঝতে পারে নি, লেখক তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে নারী হবে পুরুষের বান্ধবী, সহচরী। ওড়িআতে নারী জাগরণের উদ্দেশ্য লেখক এই সব প্রবন্ধ লিখতেন। এই প্রবন্ধটি 'Love and Marriage' গ্রন্থস্থিত হ্যাভ্‌লক্ এলিস্-এর ভূমিকার এক সুখপাঠ্য অনুবাদ।

১৯২৪ ডিসেম্বর মাসে লেখক শান্তিনিকেতনে যাত্রা করেছিলেন। দেশী-বিদেশী বহু মনীষীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, ছাত্রছাত্রীদের কর্মতৎপরতা, শান্তিনিকেতনের মেলা ও সপ্তপর্ণীতরুতলের প্রার্থনা ইত্যাদি বর্ণনা করে একটি সুন্দর ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। এটি তাঁর প্রথম ভ্রমণকাহিনী। এদিকে তাঁর প্রতিভার বিকশিত রূপ 'পথে প্রবাসে'তে দেখা যায়।

'উৎকল সাহিত্যে'র 'যুগবীণা' বিভাগেতে তিনি আনাতোল্ ফ্রাঁস, টমাস হার্ডি, জোসেফ কন্‌রাড, ইয়েট্স, রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ্, রোমাঁ্যা রোলাঁ, মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড শ প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এঁদের চিন্তার দ্বারা তাঁর আদ্য সাহিত্য রচনা পুষ্ট হয়েছিল। 'যুগবীণা'তে তিনি লিখেছেন—"যেমন বহু নদীর প্রাণপদ বারিপান করে হয় সাগর, তেমনি এ যুগের মহাকবি। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে এ যুগে কেউ মহাকবি হতে পারবে না।" একজন বিশ্বকবি বা মহান লেখক হওয়া অন্নদাশঙ্করের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল ও তার জন্য তিনি বহু অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতেন।

"উৎকল সাহিত্যে" তাঁর তিনটি খোলাচিঠি প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম চিঠিটি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর চার তারিখের লেখা 'প্রভাতী তারা'কে সম্বোধন করে। এটি বোধ হয় একটি প্রতীকী নাম, নারীজাগরণের সূচক। পত্রের তন্ময়তা এতে নেই, একে এক প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগবাণীর বাহক এই চিঠি।

তপস্যা কতে প্রস্তুত হও, প্রভাতী, তপস্যা করতে প্রস্তুত হও। জীবনেতে
তপস্যার স্থান কত উচ্চে তাহা আমি ক্রমশ বুঝতে পারছি। স্থির হয়ে ভাব,
কোন মন্ত্র তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বা
Self-realisation না সমাজ সংস্কার। আপাতত আমার কার্য্য নারীস্বাতন্ত্র্য
ও নারীর অধিকার সম্বন্ধে লোকমত গঠন করা। সাহিত্যের সাহায্যে
ওড়িআ, বাংলা ও ইংরেজী ভাষাতে এই কার্য আমি অবসরক্রমে করছি।
গল্প উপন্যাসের সাহায্যে Dickens প্রভৃতি দেশের তথা সমাজের অনেক
উপকার করতে পেরেছিলেন। 'Problem Novel' বা সমস্যামূলক উপন্যাস
অন্যান্য ভাষাতে বেরুচ্ছে। অন্যান্য দেশের নরনারী এসব Problem বিষয়ে
চিন্তা করছেন, ওড়িশাতে তুমি যদি প্রেরণামূলক একটি সাহিত্য সৃষ্টি করতে
পার, তবে তুমি অমর হয়ে যাবে।

লেখক এই পত্রে 'আলোক কুমার' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। নারী ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি লেখকের মনোভাব ও তাঁর লেখক জীবনের অভীষ্ট স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

দ্বিতীয় পত্রটি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর আঠারো তারিখেতে লেখা। যে 'বজ্রবাদল'কে সম্বোধন করেছেন তিনি বোধহয় বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক। বিষয় —বিবাহের আদর্শ। তৃতীয় পত্রটি ১৯২৫-তে লেখা, স্থান্ কপিলাস পাহাড়, মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবালীর সূচিপত্র পড়ে লেখক ওড়িআ সাহিত্যের গতিপ্রগতি কল্পনা করেছেন। প্রকাশিত একশ তিনটি রচনার মধ্যে একান্নটি পদ্য। অত্যধিক কবিতা দেখে আলোচক বিচলিত ও ব্যথিত হয়ে লিখেছেন ঃ

> বন্ধু, তুমি যদি ভাবতে থাক, দেশের কাব্যচর্চ্চার প্রাধান্যের অর্থ
> সৌন্দর্যবোধের আধিক্য—তাহলে তুমি ভ্রান্ত, তুমি স্বপ্নবিলাসী।
> কলকারখানা, চিমনির ধোঁয়া, স্টিমারের আওয়াজে জীবনসংগ্রাম তীব্র
> হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য বাড়বে, স্বপ্ন কমবে। যা সব প্রকাশিত হয় তা পদ্য
> না কবিতা? অধিকাংশ পদ্যের ছন্দ পঙ্গু, ভাব কৃপণ। পড়লে মনে রেখাপাত
> করে না, কিম্বা হৃদয়ে রঙ্গ ধরে না, কানে স্বর লেগে থাকে না। লেখকের
> পদ্য লিখে কোন্ সুখ? পাঠকের পদ্য পড়ে কি আনন্দ?
> যদি ছন্দবোধ থাকত, ওড়িআ কবিতা চতুর্থ শ্রেণীর না হয়ে অন্তত
> দ্বিতীয় শ্রেণীর হত।

খোলাচিঠিতে লেখক পরিস্থিতির প্রভাবে ম্রিয়মাণ বন্ধুকে উদ্‌বোধন বাণী শুনিয়েছেন ও ভবিষ্যৎ ওড়িশার উজ্জ্বলতম চিত্র দেখতে পেয়েছেন—অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়, অসংখ্য কারখানার চিমনি, বিস্তীর্ণ Agricultural Farm !

অন্নদাশঙ্করের জীবনদর্শন তাঁর ওড়িআ রচনাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি চির আশাবাদী, আনন্দবাদী কবি। জরা মৃত্যু ও ব্যাধির মধ্যেও

তিনি আনন্দের সুরধুনীপ্রবাহ দেখতে পেয়েছেন। এই দর্শন তাঁর বাংলা কবিতা, উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। দুঃখশোক, জরাব্যাধির সংসার, চির-অশ্রুতে আপ্লুত, ক্ষীণ, মলিন। সাহিত্যে, কবিতায় একে আবার প্রতিফলিত করে লাভ কি? পাঠক সংক্রমিত হবেন মাত্র। ধুলি, পাঁকের আবর্জনার মধ্যেই চিরআনন্দের চিন্ময় মূর্তি অঙ্কন করা কবির কাজ। বস্তুত এটাই জীবনের লক্ষ্য। আনন্দ থেকে জগতের জন্ম, আনন্দে তার প্রবাহ, আনন্দে তার বিলয়। অন্নদাশঙ্কর এই আনন্দদর্শনে বিশ্বাসী।

ধূসর বয়সেতেও তিনি সবুজ আছেন। চিরসবুজ, চিরতারুণ্যের পূজারী; প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, উৎসাহে পরিপূর্ণ উৎস, নব নব সৃজনের বিলাসী, চিরসংগ্রামী, কর্মতৎপর, বলিষ্ঠ, সতেজ প্রাণস্ফূর্তির জ্বলন্ত প্রবাহ—যা নতুন সমাজগঠনের জন্য প্রেরণা দেয়, মানবকে নব নব ভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে। স্বপ্ন এই প্রাণের নীড়, কিন্তু মাটির পৃথিবী তার বিচরণভূমি। এই প্রাণ বন্দীকে মুক্ত করে জমাট বাঁধা অন্ধকার গহ্বর থেকে, ললাটে চিরমুক্তির মুকুট পরিয়ে দেয়, চিরসংগ্রাম ও চিরবিজয়ের তিলক লাগিয়ে দেয়।

সৌজন্যে : 'মান্দাস'

অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনকথা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

এক

এক প্রাচীন শাক্ত পরিবারে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম। পিতা নিমাইচরণ, মাতা হেমনলিনী। যাঁর হাতে জন্ম তাঁর নাম মিসেস অ্যান্ডারসন। ধর্মে ক্রিশ্চান। যতদিন ঠাকুরদা শ্রীনাথ রায় বেঁচেছিলেন ততদিন বাড়িতে ধর্মীয় আচার বিচার চলত শাক্ত মতে। দুর্গাপুজোতে প্রতিমার পরিবর্তে একটা তরবারির পুজো করা হত শক্তির প্রতীক রূপে।

অন্নদাশঙ্করের যখন ছ-সাত বছর বয়স তখন ঠাকুরদা শ্রীনাথ রায়ের দেহান্ত ঘটে। তারপর নিমাইচরণ সপরিবারে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। ওড়িশার মৃত্তিকাজ সংস্কৃতি বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত। তখন থেকে বাড়িতে বৈষ্ণব আচার অনুষ্ঠানের শুরু। কীর্তন, মহোৎসবের আসরে চেনা-অচেনা বহু মানুষের সমাগম হত। মা গাইতেন জয়দেবের দশাবতার বন্দনা, বাবা গাইতেন বিদ্যাপতি। অন্যান্য কীর্তনিয়ারা বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনপদ গাইতেন। কীর্তন আসরে যাঁরা বাংলাতে মৈথিলিতে গান করতেন তাঁরাই আবার নিজেদের সংসারে ও হাটে-বাজারে কথা বলতেন ওড়িয়া ভাষাতে। এভাবে বাংলা ওড়িয়ার একটা সমন্বিত সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকেন অন্নদাশঙ্কর।

পদাবলি শুনে শুনে ছোটবেলাতেই অন্নদাশঙ্করের মর্মে গেঁথে যায় দুটি চরণ।

> জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়েন না গেল।

তখন থেকেই অস্পষ্টভাবে তিনি উপলব্ধি করেন রূপের দায় আর রসের দায়। তারপরে বছর বারো বয়সে স্কুলের কমন রুম লাইব্রেরিতে অন্নদাশঙ্কর 'সবুজপত্র' এবং তার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর তথা বীরবলকে আবিষ্কার করেন। এর বছর তিন-চার আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের থেকে 'সবুজপত্র'-এর রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভঙ্গি বিষয়-ব্যঞ্জনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। প্রথম জন নিবেদনের কবি আর দ্বিতীয় জন জাগরণের কবি। অন্নদাশঙ্কর জাগরণের কবি রূপেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চিনেছিলেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ১৯৯৪-র সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে অন্নদাশঙ্কর বলেন যে

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' ইত্যাদি পদগুলোই তাঁর জীবনের গায়ত্রীমন্ত্র।

রূপের দায়, রসের দায় আর জীবনের গায়ত্রীমন্ত্র ছাড়াও 'সবুজপত্র' থেকে অন্নদাশঙ্কর আরও দুটি বিশেষ ভাব পেয়েছিলেন। একটি হল ইটারনাল ফেমিনিন বা চিরন্তন নারীর ভাবনা আর একটি হল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন সাধনা। তাছাড়া কোন্ ভাষাতে লিখব আর কেমন করে লিখব এই দুটি প্রশ্নও বালক অন্নদাশঙ্করের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল 'সবুজপত্র'। পরবর্তীকালে এগুলি থেকে বিকশিত হয় তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসা।

দুই

এই সময় বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়ে ঢেঙ্কানালের কৃতী সন্তান রূপে দেশে ফিরে আসেন সারঙ্গধর দাস। ঢেঙ্কানালের যুবসম্প্রদায় সারঙ্গধরকে নিয়ে মেতে ওঠে। তাঁর সংবর্ধনার জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার উদ্বোধনী সংগীত লিখে দেন অন্নদাশঙ্কর। আমেরিকায় লেখাপড়া করতে করতে কীভাবে রোজগার করা যায়, সেখানকার সমাজ কত উদার, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কীভাবে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল—এসব বলে সারঙ্গধর যাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্করই সম্ভবত ছিলেন কনিষ্ঠতম। অন্নদাশঙ্কর স্থির করেন যেন তিনিও সারঙ্গধরের মতো আমেরিকায় যাবেন।

আমেরিকায় যাওয়ার জন্য অপর একটি প্রেরণা ছিল বাবা নিমাইচরণের একটি উক্তি, 'বড়ো হয়ে তুই ওয়াশিংটন হবি'। বাবা অন্নদাশঙ্করকে জর্জ ওয়াশিংটনের একখানি জীবনী দিয়েছিলেন। তখন আমেরিকা তাঁর কাছে স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র। কিন্তু ওয়াশিংটন হবার জন্য আশীর্বাদ করলেও বাবা মা যে তাঁকে কাজের সময় সত্যি সত্যি আমেরিকায় যেতে দেবেন না এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। ফলে তিনি মনে মনে আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করে সারঙ্গধরের পেছনে ঘোরাঘুরি শুরু করেন।

শুধু আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যানই করেননি, আমেরিকায় গিয়ে জীবিকা হিসেবে কী করবেন সেটাও তখনই অন্নদাশঙ্কর স্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি হবেন সন্ত নিহাল সিঙের মতো সাংবাদিক। তখন সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। মাসিক 'মডর্ন রিভিয়ু', সাপ্তাহিক 'টেলিগ্রাফ', বাংলা মাসিক 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকা আনিয়ে পড়তেন। লালা লাজপত রায়ের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাও আনান, কিন্তু যখন দেখেন যে সেখানা আসলে উর্দুপত্রিকা তখন তাঁর চক্ষুস্থির। তাঁর ভাবগতিক দেখে মা বুঝতে পারেন যে ছেলের মতলব হচ্ছে বাড়ি থেকে পালিয়ে আমেরিকায় পাডি দেওয়া। তখন তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে তাঁকে না জানিয়ে ছেলে কোথাও যাবে না।

কিন্তু অন্নদাশঙ্কর যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কটক গেলেন সেই অবসরে

মা হেমনলিনী নিজেই ছেলেকে কিছু না বলে অজানা কোন্ দেশে চলে গেলেন। পরীক্ষা দিয়ে ঢেঙ্কানালে ফেরার পথে অন্নদাশঙ্কর মায়ের চলে যাওয়ার খবর পেলেন।

অতঃপর সাংবাদিক হবার সংকল্প নিয়ে অন্নদাশঙ্কর এলেন কলকাতায়। সম্পাদকদের দরজায় দরজায় ধর্ণা দিয়ে অবশেষে বুঝলেন লাফ দিয়ে সম্পাদকের আসনে বসা সম্ভব নয়। তার জন্য অন্তত একটা গ্র্যাজুয়েশেনের ডিগ্রি চাই। এদিকে মেসে হোটেলে খেয়ে শরীরও খারাপ হচ্ছিল। কাকা যখন একবার ফিরে আসার জন্য সাধলেন তখন দ্বিরুক্তি না করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন। অর্থাৎ কটকে কাকার বাড়িতে। ভরতি হলেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে।

কোথায় ওয়াশিংটনের মতো স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করবেন তা নয়, ঢুকলেন গিয়ে ইংরেজের গোলাম তৈরির কারখানায়। পরাজয়ের লজ্জায় মাথা হেঁট। কিন্তু কটকের কলেজ জীবনে পেয়ে গেলেন চমকপ্রদ বন্ধুভাগ্য। বন্ধুদের মধ্যে সকলেই পরবর্তীকালে কৃতী হন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বিখ্যাত হন কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী এবং বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক। সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুদের সাহচর্যে অন্নদাশঙ্করের জীবন সম্পর্কিত পরিকল্পনায় পরিবর্তন সূচিত হয়। তখন তিনি আর সাংবাদিক হতে চান না, চান সাহিত্যিক হতে। কলেজের সাহিত্যপ্রেমী পাঁচ বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ননসেন্স ক্লাব নামে একটি সংস্থা। তাঁরা যে সাহিত্যধারা ওড়িয়ায় প্রবর্তন করেন তা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয় সবুজসাহিত্য নামে। বন্ধুরা পরিচিত হন 'সবুজগোষ্ঠী' নামে এক সবুজদলের মধ্যমণি রূপে স্বীকৃত হন অন্নদাশঙ্কর রায় স্বয়ং।

কলেজ জীবনে ইবসেন, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, বার্নার্ড শ,' ডিকেন্স প্রভৃতি উপন্যাস পড়ে পড়ে অন্নদাশঙ্করের মনে ইয়োরোপীয় সাহিত্য তথা ইয়োরোপীয় দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। এই কৌতূহল তীব্রতর হয় কটক র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম পাটনা কলেজে পড়তে এসে। বিশাল গ্রন্থাগারে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিশাল সম্ভার। রম্যাঁ রলাঁ, ডি. এইচ লরেন্স, ভার্জিনিয়া উল্ফ, এলেন কেই প্রভৃতির লেখা পড়তে পড়তে তাঁর মনে হয়, যদি ইয়োরোপে যেতে না পাবেন তাহলে জীবনটাই বৃথা। আমেরিকার জন্য আকর্ষণ রহিত হল, তার পরিবর্তে প্রবল আকর্ষণ জাগল ইয়োরোপে যাওয়ার জন্য। যেন ইয়োরোপটাই তাঁর আত্মার দেশ, তাঁর আসল স্বদেশ।

তিন

ইতিমধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছেন। প্রথমত কবি হিসেবে, দ্বিতীয়ত প্রাবন্ধিক হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে তখনও তাঁর প্রকাশ দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু 'প্রবাসী'র পাতায় তাঁর 'কৃষ্ণ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। তাছাড়া 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ 'পারিবারিক নারী সমস্যা' জাগিয়েছে অপ্রত্যাশিত বিতর্ক। অবশ্য এর আগেই কটক কলেজে ম্যাগাজিনে অধ্যাপক

শচীন্দ্রলাল দাস বর্মার An anti-feminist Cry কবিতাটির উত্তরে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন A Feminist Counter Cry নামে একটি কবিতা। ওড়িয়াতে 'নরচক্ষুর নারী' প্রবন্ধটি ওড়িশাতে নারী সম্পর্কিত চিন্তার ধারায় নতুন চিন্তার সূচনা করে। তাছাড়া 'প্রলয় প্রেরণা', 'সৃজন বেদনা' প্রভৃতি কবিতা আজও ওড়িয়া সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হয়। তখনকার কালে এসব কবিতা ছিল ওড়িয়া সাহিত্যের অভিনব সম্ভাবনা।

অন্নদাশঙ্কর যখন পাটনা কলেজে বি.এ. পড়ছেন ইংরেজি অনার্স নিয়ে তখন 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বারোয়ারি উপন্যাস লিখবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিশ্বনাথ কর সম্পাদিত 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর ও তাঁর বন্ধুবর্গ 'বাসন্তী' নামে একটি বারোয়ারি উপন্যাস লেখা শুরু করেন। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে 'বাসন্তী' এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এইটেই ওড়িয়াতে প্রথম বারোয়ারি উপন্যাস। আর অন্নদাশঙ্করের জীবনে 'বাসন্তী'র গুরুত্ব এই যে এইটেই গল্প-উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রয়াস।

অন্নদাশঙ্কর ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বি. এ. ইংরেজি অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। ওড়িয়া, ইংরেজি, বাংলা এই তিন ভাষাতেই তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করবেন, না তিনটির কোনও একটিতে করবেন? কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে কি একসঙ্গে একাধিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব? বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের সামনেও ছিল একই প্রশ্ন। ইংরেজি, না বাংলা? কিন্তু তিনি মনোনয়ন করেছিলেন ইংরেজি ভাষা। পক্ষান্তরে অন্নদাশঙ্করের কাছে প্রশ্নটা ছিল অপেক্ষাকৃত জটিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে তিনি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ কর্তৃত্ব। আর ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সবুজ যুগের প্রধান প্রবক্তারূপে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। ইংরেজি ও ওড়িয়ার তুলনায় বাংলাতেই তিনি অজ্ঞাতকুলশীল। পাটনা থেকে কলকাতায় এসে 'কল্লোল' পত্রিকার আপিসের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছেন, কিন্তু ভেতরে ঢোকার ভরসা পাননি। তবু তিনিই বাংলা ভাষাকে সাহিত্য সাধনার জন্য মনোনয়ন করলেন।

অন্নদাশঙ্করের সামনে আরও একটি প্রশ্ন ছিল, জীবিকার প্রশ্ন। একদা ভেবেছিলেন গান্ধীজীর বারদৌলি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে যাবেন। কিন্তু গুরুজনদের নির্বন্ধে ভরতি হলেন কটক কলেজে। মেধার দৌলতে বিহার-ওড়িশার মধ্যে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পেলেন প্রাদেশিক বৃত্তি। তখন বাধ্য হলেন পাটনায় এসে বি. এ. পড়তে। কারণ বি. এ. না পড়লে ওই বৃত্তি তিনি পেতেন না। ইতিমধ্যে ইয়োরোপীয় ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ে তাঁর উদগ্র ইচ্ছা ছিল ইয়োরোপ দেখবার, সেই যে বারো বছর বয়সে প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা'র সোমনাথের গল্পে ভেনাস ডি মাইলোর উল্লেখ পেয়েছিলেন তার দশ বছর পরে তাঁর মনে হল নিজের চোখে সেই বিশ্বসুন্দরীকে না দেখতে পেলে জীবনটাই বৃথা। কিন্তু কী করে যাবেন? সবচেয়ে সহজ উপায় হল আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। আরও একটা কারণ হল একজন বিপন্ন নারীকে আর্থিক ও নৈতিক নিরাপত্তা দান।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের পাণ্ডুলিপি

জাপান থেকে ফিরে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি

কিন্তু প্রথমবার আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় তিনি পঞ্চম স্থান পেলেও তাঁর পরিবর্তে সরকারি মনোনয়ন পেলেন যাঁরা তাঁরা প্রতিযোগিতায় তাঁর চেয়ে অনেক পেছনে স্থান পেয়েছিলেন। এই ব্যর্থতায় তাঁর জেদ চেপে গেল, পরের বারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেতেই হবে। ইতিমধ্যে তাঁর বন্ধু কৃপানাথ মিশ্র জানালেন যে 'বিচিত্রা' নামে বাংলায় একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃপানাথ খুব ভালো ভাবে চেনেন। কৃপানাথের মারফত অন্নদাশঙ্কর একটি প্রবন্ধ পাঠালেন 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের জন্য। প্রবন্ধটি 'রক্তকরবীর তিনজন' নামে 'বিচিত্রা'য় পত্রস্থ করে উপেন্দ্রনাথ আরও লেখা চাইলেন অন্নদাশঙ্করের কাছে। ততদিনে অন্নদাশঙ্কর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে ইংলন্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। 'বিচিত্রা'র সম্পাদককে জানালেন যে তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের কাহিনী কিস্তিতি কিস্তিতে লিখে পাঠাবেন। অবশেষে ১৯২৭-এর ভরা বর্ষায় শুরু হল তাঁর বহু বাঞ্ছিত ইয়োরোপ যাত্রা। একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের রাজপথেও তাঁর জয়যাত্রা শুরু হল। কারণ তাঁর ইয়োরোপ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে 'বিচিত্রা'য় শুরু হল তাঁর 'পথে প্রবাসে'র প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের খ্যাতির সূচনা।

উপন্যাস নয়, কবিতা নয়, নয় কোনও সৃষ্টিশীল সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী লিখেই অন্নদাশঙ্করের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ প্রবেশ। 'দেশ'-এর জন্য ১৯৯০-এ বর্তমান লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন ইটালিতে যাই তখন আমার ইউরোপ প্রবাসের অন্তিম পর্ব। কিন্তু ইটালির ইতিহাসে পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্ত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর্ব। মানুষের ইতিহাসে এক অশুভ অধ্যায়ের আরম্ভ।' স্পষ্টতই ১৯২৯-এ ফ্যাসিজমের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায়নি। কিন্তু যখন তিনি 'সত্যাসত্য' উপন্যাস লেখা শুরু করলেন তখন ইয়োরোপের ইতিহাসে ডিকটেটরশিপের প্রকৃতি ও স্বরূপ অনেকখানি পরিষ্কার রূপ পেয়েছে। 'পথে প্রবাসে'র ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে ইয়োরোপের প্রতি লেখকের গভীর ভালোবাসা। বৈনাশিক চরিত্রের পাশাপাশি সংযুবনী প্রতিভার প্রকাশ।

চার

ইয়োরোপে থাকাকালে অন্নদাশঙ্কর যখন ধারাবাহিক ভাবে 'পথে প্রবাসে' লিখছেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পাতায় তখন অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্য সচকিত হয়ে উঠল একজন নতুন শক্তিশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাবে। 'কল্লোল' পত্রিকার পক্ষ থেকে মুরলীধর বসু ও শিশির নিয়োগী তাঁকে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ইয়োরোপে সেটা যুদ্ধোত্তর মন্দার প্রতিক্রিয়া প্রবীণদের বিরুদ্ধে নবীনদের আন্দোলনের যুগও বটে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সংগতি রেখে অন্নদাশঙ্কর 'কালিকলম' পত্রিকায় সাতটি প্রবন্ধ লেখেন আর সেগুলির 'তারুণ্য' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে 'নীতি জিজ্ঞাসা', 'স্ত্রীপুরুষ', 'রবীন্দ্রাদিত্য', 'মনে মনে' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন

'কালিকলমে' ও 'কল্লোলে'। তাছাড়া তিনি যৌনজিজ্ঞাসাকে মানুষের একটি মৌল জিজ্ঞাসারূপে উপলব্ধি করেন। বহুকাল ধরে যৌনজিজ্ঞাসা ছিল প্রকাশ্যে আলোচনার অযোগ্য বিষয়। কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন যে আলাদীনের গুপ্তগুহার রহস্যের মত যৌনজিজ্ঞাসার বন্ধ অর্গলকে একালের বিজ্ঞানীরা অবারিত করে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছেন। সৃষ্টিজিজ্ঞাসা থেকেই যৌনজিজ্ঞাসার শুরু।

১৯২৯-এর অক্টোবরে অন্নদাশঙ্কর যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বাংলাসাহিত্যে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। কলকাতায় এসে তিনি কয়েকদিনের জন্য আমহার্স্ট স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে একটা হোটেলে অবস্থান করলেন। তাঁর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ পরিচয় করলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক। তাঁকে অচিন্ত্যকুমার সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন প্রমথ চৌধুরী ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সকাশে। প্রমথ চৌধুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'পথে প্রবাসে'র ভূমিকা লিখে দিতে চাইলেন। আর উপেন্দ্রনাথ চাইলেন 'বিচিত্রা'র জন্য একখানি উপন্যাস। প্রথমে অন্নদাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস লেখার বিষয়ে একটা আশঙ্কা ছিল। সেই 'বাসন্তী'র তিনটে কি চারটে পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন। তারপর ইংলন্ডে থাকতে লিখেছিলেন 'দুজনায়' নামে একটি গল্প। কিন্তু তখনকার কলের মানদণ্ডে ওই গল্প যে বিশেষ ওৎরায়নি এটা অন্নদাশঙ্কর ভালো করেই বুঝেছিলেন। অথচ মনে মনে দুরন্ত অভিলাষ যে একখানি উপন্যাস লিখে উলটে দেবেন রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য আর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পরিণতি। 'নৌকাডুবি'র গল্পাংশ সম্বন্ধেই ছিল তাঁর প্রবল আপত্তি। একজন পুরুষ ও একটি নারী কিছুকাল স্বামী ও স্ত্রী রূপে বাস করল, পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসল। তারপর তারা জানল যে তারা আসলে স্বামী-স্ত্রী নয়, বিয়ের অব্যবহিত পরে পরস্পরকে মুখ ও গড়ন দেখে ভালো করে পরিচয়ের তথা চেনার আগেই নৌকাডুবি হয়ে অপর এক দম্পতির সঙ্গে জুড়ি বদল হয়ে যায়। কিন্তু এরা যে এতদিন স্বামী স্ত্রী হিসেবেই জীবনযাপন করল তার কী হবে? চেনাশোনা নেই, কোনরকম ভালোবাসা নেই, আছে শুধু তৃতীয় পক্ষের খেয়াল অনুসারে কয়েকদিনের জন্য মিলন, তারপর আবার সেই তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছাক্রমেই আসে অনিবার্য বিচ্ছেদ। 'পারিবারিক নারী সমস্যা'র লেখক অন্নদাশঙ্কর অন্যরকম পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে নতুনভাবে যাচাই করতে চাইলেন।

একদিকে বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, আর একদিকে সমাজরে কাঠামোর মধ্যে এক দম্পতির সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ। সেইসঙ্গে বিশ্ব জুড়ে মানবিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বের বিপুল আলোড়ন। এইসব চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের গান্ধীবাদও এক নতুন মাত্রা। আবার তার সঙ্গে যোগ করলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনের কাহিনীকেঁ। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবল উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্নদাশঙ্কর শুরু করে দিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সত্যাসত্য'। সেটা ১৯৩০ সাল।

কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশ করতে থাকলেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। প্রথম কয়েক সংখ্যায় লেখকদের নাম থাকত লীলাময় রায়। কারণ বিশ্ব সৃষ্টিকে তিনি উপলব্ধি করেছেন স্রষ্টার লীলারূপে।

অন্নদাশঙ্কর তখন মুর্শিদাবাদ জেলার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। থাকেন অপর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিজেন মজুমদারের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ সদর বহরমপুরে এক বাসা ভাগাভাগি করে। আর সরকারি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং 'সত্যাসত্য' লেখার ফাঁকে ফাঁকে দু মাসের কঠিন পরিশ্রমে শেষ করে ফেললেন 'অসমাপিকা' নামে একখানি নতুন উপন্যাস। 'অসমাপিকা'র পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন 'তারুণ্য'র প্রকাশক এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের কছে। কিন্তু এম সি সরকার তখনই 'অসমাপিকা' প্রকাশ না করে পাণ্ডুলিপি ধরে রাখলেন নিজেদের সুবিধেমতো কোনও সময়ে প্রকাশ করার জন্য।

পাঁচ

ইতিমধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে গেলেন রবীন্দ্রসন্দর্শনে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ 'পথে প্রবাসে' পড়েছেন এবং তাঁর কাছে অন্নদাশঙ্কর রায় একটি সুপরিচিত নাম। তিনি জানতে চাইলেন, একজন আই. সি. এস-এর তো কর্মপ্রদেশ হিসেবে ভারতের যে কোনও প্রদেশ পছন্দ করার অধিকার থাকে, বাংলার চেয়ে যুক্তপ্রদেশই তো শান্তি, স্বাস্থ্য ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে কাম্য ছিল আর অন্নদাশঙ্কর নিজেও তো মানুষ হয়েছেন ওড়িশায় ও বিহারে, অর্থাৎ বাংলার বাইরে, তাহলে কেন নিযুক্তি চেয়ে নিলেন বাংলায়। উত্তরে অন্নদাশঙ্কর বললেন, তিনি চাকরির দিক থেকে বিষয়টাকে দেখেননি, দেখেছেন সাহিত্যের দিক থেকে এবং ইয়োরোপ দেখবার জন্য যেমন আই. সি. এস. হয়েছেন তেমন আই. সি. এস. হওয়ার সুযোগ নিয়ে বাংলা দেখবেন। প্রকৃতপক্ষে চাকরির সুবাদে তিনি যেভাবে বিস্তীর্ণ বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলে দেখছেন সেভাবে খুব কম বাঙালি সাহিত্যিক বাংলাকে দেখেছেন, জেনেছেন ও চিনেছেন।

অচিন্ত্যকুমারের বিবাহ হয় ১৯৩০-এর আগস্ট মাসে। এই বিবাহ উপলক্ষে বহরমপুর থেকে অন্নদাশঙ্কর এলেন কলকাতায়। বউভাতের অনুষ্ঠানে পরিচয় হল গৈরিকধারী নজরুল ইসলাম ও খদ্দরারী পোপাল দাস মজুমদারের সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ডি. এম. লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী গোপালদাসবাবু অন্নদাশঙ্করের কাছে প্রকাশার্থে একখানি নতুন উপন্যাস চাইলেন। মাত্র কয়েকদিন আগেই অন্নদাশঙ্কর 'অসমাপিকা'র পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত করেছেন। আর নতুন উপন্যাস বলতে ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় যা লিখেছেন সেই 'সত্যাসত্য'। অন্নদাশঙ্কর ভালো করে জানতেন যে 'সত্যাসত্য'র মতো সিরিয়াস গুরুভার উপন্যাসের প্রকাশক জুটবে না, তাই ভেবে রেখেছিলেন যে ওই উপন্যাস প্রকাশের ব্যয়ভারের অর্ধাংশ তিনি নিজেই দেবেন। কিন্তু গোপালদাসবাবু বললেন, তিনিই ওই উপন্যাস প্রকাশ করবেন, তবে তার আগে

চাই নতুন একখানি লঘুভার উপন্যাস। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে লেখা হল 'আগুন নিয়ে খেলা' উপন্যাসটি। এক-একটি পরিচ্ছেদ শেষ করেন আর বহরমপুর থেকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেন গোপালদাসবাবুকে! যেমন ঝড়ের বেগে অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসটি লিখলেন তেমনই ঝড়ের বেগে গোপালদাসবাবু উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন।

যখন লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে দুরন্ত দৌড় চলছে তখন পৃথিবীর বিপরীত প্রান্ত থেকে অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ নামে এক বিশ বৎসর বয়স্কা মার্কিন তরুণী লন্ডন থেকে ভবানী ভট্টাচার্যের সূত্র ধরে বহরমপুরে অন্নদাশঙ্করের কাছে এলেন। অচিরে সেই পরিচয় পরিণত হল প্রণয়ে এবং শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে। যাঁর নাম ছিল অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ তাঁর নতুন নাম হল লীলা রায়। মার্কিন বংশোদ্ভুতা স্ত্রীর এই নতুন নামকরণের মধ্যে নিহিত আছে অন্নদাশঙ্করের আধ্যাত্মিক ভাবনা। লীলা হল সৃষ্টি আর সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ। আর এই স্রষ্টাই হলেন পরমসত্তা। এখন থেকে ঘরণী লীলার মধ্যে অন্নদাশঙ্কর দেখলেন অন্যতর সৃষ্টির লীলা। 'সত্যাসত্য' রচনার পদে পদে ঘরণীই লেখকের সাহায্যকারিণী। ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে যতই দিন যেতে লাগল অন্নদাশঙ্কর ততই বিস্মৃত হতে লাগলেন পাশ্চাত্য আচারপ্রথার খুঁটিনাটি আর তখন সেগুলি পুষিয়ে দিতে লাগলেন লীলা রায়। 'সত্যাসত্য'র স্বরূপ সন্ধানে লীলা রায়ের যে একটা নেপথ্য ভূমিকা অছে তা অন্নদাশঙ্কর নিজেই বারবার স্বীকার করেছেন।

ছয়

বহরমপুরে এসে কর্মজীবন শুরু করার অল্পদিন পরেই, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে অন্নদাশঙ্কর আর অচিন্ত্যকুমার দুই বন্ধু মিলে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'লোকলক্ষী গর্ভিনী'। এই কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে যে গর্ভিনী নারীর যেমন একমাত্র চিন্তা হল গর্ভ রক্ষা করার তেমনই শিল্পীরও একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত, শিল্পের জন্য যে আবেগকে অন্তরে ধারণ করেছেন শিল্পী, তাকে কেমন করে লোকসমক্ষে উপস্থাপন করবেন। এই আদর্শ অনুসারে অন্নদাশঙ্করের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত ছিল কেমন করে সর্বাগ্রে 'সত্যাসত্য' লেখা সম্পূর্ণ করবেন। কিন্তু প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ' লেখার মধ্যে 'অসমাপিকা' আর 'আগুন নিয়ে খেলা' দুখানি উপন্যাস লিখেছেন, সেটলমেন্ট ক্যাম্পের ট্রেনিং নিয়েছেন, ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়েছেন এবং জীবনের একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিবাহ করেছেন। প্রথম খণ্ড লেখার পরে এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড 'অজ্ঞাতবাস' ১৯৩৩-এ এবং তার এক বছরের মধ্যে তৃতীয় খণ্ড 'কলঙ্কবতী' ১৯৩৪-এ এবং তার এক বছরের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড 'দুঃখমোচন' ১৯৩৫-এ লেখেন যদিও 'দুঃখমোচন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

অন্নদাশঙ্কর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জুডিসিয়াল ট্রেনিংয়ের জন্য প্রথমে চট্টগ্রামে ও তারপরে ঢাকায় বদলি হন। চট্টগ্রামে তিন মাস আর ঢাকায় নয় মাস থাকাকালে

‘অজ্ঞাতবাস’-এর অনেকখানি আর ‘কলঙ্কবতী’র খানিকটা অংশ লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখে ফেলেন ‘পুতুল নিয়ে খেলা’ উপন্যাসটি আর ‘প্রকৃতির পরিহাস’ পর্যায়ের কতকগুলি ছোটগল্প। এই রচনাগুলিতে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ভদ্রতার আড়ালে ভণ্ডামির রূপ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গান্ধীজির আবির্ভাবের সময় থেকে অন্নদাশঙ্কর গান্ধীবাদে অনুপ্রাণিত, তখন থেকে খদ্দরের ভক্ত, লন্ডনে থাকাকালেও মধ্যে মধ্যে খদ্দর পরতেন, চাকরিতেও খদ্দরের স্যুট পরতেন। সত্য ছিল যেমন গান্ধীজির পরীক্ষানিরীক্ষার একটা আবশ্যিক বস্তু তেমনই অন্নদাশঙ্করের জীবনেও। শুধু জীবন-দর্শনে ও জীবনযাপনে নয়, শিল্প সাধনেও। প্রকৃতপক্ষে গূঢ়তর অর্থে ‘পুতুল নিয়ে খেলা’ উপন্যাসে এবং প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিতেও তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার বিষয় শুধু শিল্পের রূপ নয়, সত্যের রূপও।

অন্নদাশঙ্কর যে বছর নদীয়ার জেলা শাসকের পদে উন্নীত হলেন সেই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছে আমরা একবার পেছন ফিরে অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যিক বিকাশের গতিপ্রকৃতি ঝটিতি আলোচনা করে নিতে পারি। শুরু করেছিলেন ওড়িয়া, বাংলা ও ইংরেজি তিন ভাষায় ও বিশ বছরে বয়সের মধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যিক রূপে চমকপ্রদ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু বাইশ বছর বয়সে স্থির করেন যে শুধু বাংলায় সাহিত্য সাধনা করবেন এবং সেজন্য বাংলায় থাকা যাবে ও বাংলাকে জানা যাবে এরকম কোনও জীবিকা মনোনয়ন করবেন। যে প্রদেশে ছিল স্থায়ী ঠিকানা সেই প্রদেশের বদলে বাংলায় এসে কবিতা ও প্রবন্ধের সঙ্গে শুরু করলেন উপন্যাস লেখা। বিবাহ করলেন মার্কিন দুহিতাকে। চার বছরের মধ্যে দুই সন্তানের জনকজননী। এই রায় পরিবারের নীরব সাধনা হল নিজস্ব বাংলাদেশ সৃষ্টি করা। এই বাংলা দেশ কোনও নথিভুক্ত অথবা মানচিত্রে সুচিহ্নিত স্থান নয়, এই বাংলা একটা অনুভবসাধ্য সত্তা।

সাত

নদীয়ায় জেলা শাসক হওয়ার পর থেকে অন্নদাশঙ্কর সরাসরি দায়দায়িত্বে এমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে সাহিত্যের সাধনায় অবহেলা হল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে শিল্পীর প্রথম কাজ হল শিল্প সৃষ্টি করা। কিন্তু সরকারি কাজে সুখ্যাতির দুরাশাতে তিনি কর্মবীর হয়ে ওঠেন। রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকাতে তিনি নিজেই লিখেছেন, ‘সেই যে মাথায় ভূত চাপে সে ভূত আর নামতে চায় না। আমি তিনটি বছর বন্যহংসীর পশ্চাদ্ধাবন করি।’ কিন্তু জেলা শাসকের দায়িত্বভারে থাকাকালে তাঁর সবকিছুই অসাংস্কৃতিক বা অসাহিত্যিক অন্বেষণে অপচিত হয়নি। এই সময় পাতিসরের জমিদার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজশাহী জেলা শাসক অন্নদাশঙ্করের এমন একটা যোগাযোগ ঘটে যার পরিণাম আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয়েছে।

তবে ওই যোগাযোগের কাহিনী বলার আগে উল্লেখ করি অন্নদাশঙ্করের বহুমুখী মানসিকতার একটি নতুন মুখ বা নতুন ধারা কীভাবে যুক্ত হল তার কথা। এই নতুন

ধারাটি হল সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রতিক সমস্যা সম্বন্ধে এক জিজ্ঞাসু ও সচেতন মনের প্রকাশ। সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ প্রসঙ্গগুলির মধ্যে দেশের সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলির অথবা বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির স্থান নেই, থাকলেও তা কবিতায় বা কথাসাহিত্যে বা নাটকে বিশেষ দেশ কাল ও পাত্রকে আশ্রয় করে পরিস্ফুট হয় শিল্পের ব্যঞ্জনায়। অন্নদাশঙ্কর সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রতিক জিজ্ঞাসাগুলিকে আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তব জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত করলেন, বুঝিয়ে দিলেন যে ব্যাধির সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা উদাসীনতা ব্যাধির হাত থেকে বাঁচার উপায় নয়, ব্যাধিকে নির্ণয় করে তার সঙ্গে মোকাবিলা করাই হল প্রকৃতি প্রতিকার।

অন্নদাশঙ্কর যখন নওগাঁর মহকুমা শাসক তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেই লবণ সত্যাগ্রহের দেশব্যাপী আলোড়ন নওগাঁবাসীদের তেমন ভাবে স্পর্শ করল না। আবার ওই যুগেই বাংলার নানাস্থানে, বিশেষত চট্টগ্রামে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিচলিত করল ব্রিটিশ প্রশাসনকে। অন্নদাশঙ্কর না চাইতেই তাঁর জন্য মোতায়েন হয়ে গেল দেহরক্ষী এবং তারা আইন মোতাবেক সর্বত্র তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অথচ নওগাঁতে সন্ত্রাসবাদও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। এর কারণ ছিল নওগাঁর সাধারণ মানুষ ছিল মুসলিম এবং গ্রামীণ মুসলিমরা ওই সব জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে ছিল নিস্পৃহ। অন্নদাশঙ্কর মহকুমা শাসক রূপে একবার হাতেনাতে দুজন ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। যখন তাঁদের গ্রেপ্তার করেন তখন তাঁদের একজন উপবিষ্ট ছিলেন খাটে, অপরজন মেজেয়। খাটের উপরে উপবিষ্ট ষড়যন্ত্রকারী হিন্দু আর মেজের উপরে উপবিষ্ট ষড়যন্ত্রকারী মুসলিম। মহকুমা শাসক তাঁদের সদরে চালান করলে জেলা শাসক পত্র পাঠ সেই মুসলিম ভদ্রলোককে মুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে সমাজের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের যে ভেদাভেদ বর্তমান তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে প্রশাসন। আর অন্নদাশঙ্কর অনুধান করেন যে হিন্দু মুসলমানের বিভেদটা বাস্তবে জমির মালিক জমির কৃষকের সমস্যা। এর ফলে জমি নিয়ে বিবাদ কী ভাবে জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে ধর্ম নিয়ে বিরোধে রূপান্তরিত হচ্ছে তার মামলা আসত আদালতে। ওইসব মামলাকে বলা হত সার্টিফিকেটের মামলা। স্পেশাল অফিসার ছিল সার্টিফিকেট মামলা করার জন্য।

নওগাঁর পরে জুডিসিয়াল ট্রেনিংয়ের জন্য অন্নদাশঙ্করকে বদলি করা হল চট্টগ্রামে ও ঢাকায়। তখন তিনি আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে দেখলেন যে শুধু বাংলায় নয়, পাঞ্জাবেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কৃষিজীবী, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে এবং যুক্তপ্রদেশ বিহার, বম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিমরা বাণিজ্যজীবী, সেখানে তারা আর্থিক দিক থেকে প্রভাবশালী কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে তারা দুর্বল অর্থাৎ সংখ্যালঘু। সংক্ষেপে এই হল দেশের সাম্প্রদায়িক বিন্যাসের চিত্র এবং তাদের আর্থিক অবস্থার চরিত্র। এই পরিস্থিতির সমাধান কল্পে ১৯৩২-এর অগাস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। স্বভাবতই তাতে প্রতিফলিত হয়েছে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হুকুমত কায়েম রাখার ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতি।

অন্নদাশঙ্কর যখন ঢাকায় ছিলেন তখন স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীরা তাঁর কাছে আসা যাওয়া শুরু করলেন। তাঁদের একজন যখন পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন তখন অন্নদাশঙ্করই সেই পত্রিকায় নাম দেন 'সবুজ বাংলা' এবং সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'মাদ্রাসী বাঙলা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধটিতে তুলনামূলকভাবে আরবি ফারসি শব্দবহুল এক দুর্বোধ্য বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রয়াসকে অন্নদাশঙ্কর মাদ্রাসা শিক্ষার কুপ্রভাব বলে সমালোচনা করেন। ওই পত্রিকা ছাড়াও আর একটি পত্রিকার বিশেষ প্রচার ছিল স্থানীয় সাহিত্য সমাজে—হাবিবুল্লাহ বাহার আর শামসুন নাহার দুই ভাইবোন পরিচালিত 'বুলবুল'। দুজনেই পরে বাংলার রাজনীতিতে ও সংস্কৃতিতে প্রসিদ্ধ হন। 'বুলবুল' পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর 'সাঙ্গা' 'জীবিকা', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। জনগণনার সময় সমাজের কতকগুলি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, ফলে সমাজ-চিত্রের বিশেষ কতকগুলি দিক যেমন ধর্ম, আচার-প্রথা, জীবিকা ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়। 'বুলবুল' পত্রিকায় অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধগুলি আমাদের সমাজের কতকগুলি ছায়াচ্ছন্ন দিকে অর্থপূর্ণ আলোকপাত করে। এবং এই সূত্রে বহু মুসলিম লেখক-লেখিকার সঙ্গে তাঁর পত্রসম্পর্ক স্থাপিত হয়। যাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাঁদের মধ্যে সুফিয়া এন হোসেন তখনই কবি হিসেবে সুপরিচিতা ছিলেন। তিনি পত্রে অন্নদাশঙ্করকে ওই সব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে গল্প-উপন্যাস লেখার জন্য পরামর্শ দেন। পরে যখন তিনি বেগম সুফিয়া কামাল নামে আরও প্রসিদ্ধ হন তখন আবার তিনিই হন সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ক অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধাবলীর একজন প্রধান প্রচারক।

দেশ ভাগের পরে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিশ্লেষণে এবং ওই বিষয়ে সমাধানের সন্ধানে অন্নদাশঙ্কর ক্রমশ এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তার সূচনা হয় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে। একটা বিশেষ ভৌগোলিক অভিব্যক্তির মধ্যে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও জমির জন্য সংগ্রাম, জীবিকার সংগ্রাম, ধর্মের জিগির, রাজনীতিবিদদের নেপথ্যচারিতা ইত্যাদি কতরকম প্রশ্ন যে ডালপালা ছড়িয়ে চারদিকের বাতাসকে ভারি করে তোলে তার অনুধাবনে অন্নদাশঙ্কর বাঙালি মনীষার এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ।

মানুষে মানুষে বিরোধের মূল কারণটা বা সত্যটা নানা রকম মতবাদ তথা তত্ত্বের পরিচ্ছদ পরিধান করে আবির্ভূত হচ্ছে ইতিহাসে। এটা শুধু এই দেশে নয়, বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রেও সত্য। এই মানদণ্ডে অন্নদাশঙ্কর বিচার করলেন বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে মুসোলিনী হিটলার ফ্রাঙ্কো প্রমুখ ডিকটেটরদের আবির্ভাবের পরিণামকে। যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর 'ডিক্টেটরশিপ' নামক প্রবন্ধটি লেখেন তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেকের কাছেই অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য ছিল। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কাছেও ছিল, তাই মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণে বাধেনি তাঁর। আর ১৯৩৯ সালে মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর জার্মানির নাৎসিবাদের প্রশস্তি রচনা করেন 'উই অর আওয়ার নেশনহুড্ ডিফাইন্ড'-এর ৩৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায়। পক্ষান্তরে ১৯৩৫-এই

অন্নদাশঙ্কর লেখেন, 'একই বীজ থেকে কী করে দুই জাতের চারা হতে পারে তা আমাদের সকলের জেনে রাখা ভালো। নইলে বুনব ডেমক্রেসি আর ফলবে ডিকটেটরশিপ।' এই স্বকালমনস্কতা তাঁর মহত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে অন্যান্য সৃষ্টিশীল লেখকদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আট

একটু আগে বলেছি যে জেলা শাসকের দায়িত্বভারে থাকাকালে অন্নদাশঙ্করের সময়টা পুরোপুরি বৃথা যায়নি। তিনি যখন ১৯৩৭ সালে রাজশাহীর জেলা শাসক তখন হঠাৎ একনি একটা টেলিগ্রাম আসে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আত্রাইঘাটে অন্নদাশঙ্করের উপস্থিতি কামনা করেছেন। গিয়ে দেখেন ঘাটে সারি সারি প্রজাদের ভিড়, দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো মুসলমানদের চোখে জল। সবাই বুঝতে পারছিলেন যে বাবুমশায়ের সঙ্গে এই তাঁদের শেষ দেখা। রবীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশঙ্কর স্টেশনের প্লাটফর্মে পাশাপাশি বসেন, ট্রেন এলে একসঙ্গে নাটোর পর্যন্ত যাত্রা। এই প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালে ধীমান দাশগুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর বলেন, "আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখোনা কেন? আমি সবিনয় নিবেদন করি, ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না। তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন।" বইখানিতে অনেকগুলি ছড়া ছিল। সেগুলি রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট ছড়া। মার্জিত, শীলিত ও সংস্কৃত। তার সঙ্গে ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের ধারণার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি প্রায়ই মনে মনে নাড়াচাড়া করে। ছড়া লিখতে হবে।

লন্ডনে শিক্ষানবিশী কালে অন্নদাশঙ্কর গোটা তিনেক ছড়া লিখেছিলেন। তখন সেগুলি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'মৌচাক' পত্রিকায়। আসলে সেগুলি ছড়ার মত পদ্য। যা হোক তারপর আর ছড়া লেখা নিয়ে ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের কথায় আবার নতুন করে ভাবলেন, উৎসাহিত হয়ে লিখে ফেললেন কতকগুলি লিমেরিক, কতকগুলি ক্লোরিহিউ এবং একটি রুথলেস রাইম বাংলা ছড়ায় কিছু কিছু বিদেশি ঢং আমদানি হল বটে, কিন্তু বাংলা ছড়ার মজা ঠিক জমল না।

এদিকে সরকারি কাজের চাপে 'সত্যাসত্য' লেখা কার্যত বন্ধ। রাজশাহী থাকাকালে একবার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে মাঝরাতে বিছানা থেকে উঠে ছুটতে হল কলেজ হস্টেলে ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রমকে সামলাতে। সেদিনকার মতো দাঙ্গা নিবারণ সম্ভব হলেও সমস্যাটার নিবাকরণ হয় না। ইতিমধ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এই ব্যবস্থা ফজলুল হকই তখন বাংলার একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। তিনি মুসলিম ছাত্রদের 'আমাদের বালকগণ' সম্বোধন করে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কোনভাবে সেটি কলকাতায় কাগজওয়ালাদের হাতে পড়ে এবং ফ্যাকসিমিলি সমেত ছাপা হয়। কেমন করে ওই টেলিগ্রাম কাগজওয়ালার হাতে পড়ে? এজন্য ফজলুল হক বোধহয় শাসককেই দায়ী করেছিলেন। অন্নদাশঙ্করকে জেলা শাসকের পদ

থেকে অতিরিক্ত জেলা জজের পদে বদলি করা হল চট্টগ্রামে। পরের বারে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা জজের পদে। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁকে প্রশাসন থেকে সরানো হল বিচার বিভাগে।

চট্টগ্রামে থাকাকালেই অন্নদাশঙ্কর জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর পরবর্তী নিযুক্তি হবে বিচার বিভাগে। গত দু বছর ধরে তিনি যে সাহিত্য ভুলে গিয়ে সরকারি কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন তার জন্য কি এই পুরস্কার? প্রচণ্ড অভিমান হল। ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেলেন কলম্বো বম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে। তার আগে ছড়া লেখার একটা নতুন ধরনের পরীক্ষা করেন, 'আমার যদি এপিটাফ লিখতে হয় / তবে লিখো—' ইত্যাদি। কিন্তু এই ছড়া তাকে আরও নতুন নতুন ছড়া লেখায় অনুপ্রাণিত করল না। অথচ অন্নদাশঙ্কর পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন. কথ্য ভাষায় কাব্যচর্চার জন্য চাই ছড়ার পুনরুদ্ধার এবং কাব্য বা ছড়াকে সহজে স্মরণযোগ্য করতে হলে পদ্য ছন্দকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ তো ছিলই। আর সেই সঙ্গে ছিল শিল্প সম্বন্ধে টলস্টয় রম্যাঁ রলাঁ প্রমুখের বক্তব্য। শিল্প হবে সরল এবং তাতে ঘটবে জনগণের জীবনের প্রতিফলন এবং এভাবেই সমাজের ঋণ শিল্পী পরিশোধ করবেন। কিন্তু শিল্পের জন্য প্রত্যয় পর্যাপ্ত নয়, তার জন্য চাই উপযুক্ত প্রেরণা। ফলে ছড়া লেখার প্রেরণার জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া কিছু করণীয় ছিল না অন্নদাশঙ্করের।

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রেরণা এল ১৯৪২ সালে। বুদ্ধদেব বসু তখন 'এক পয়সার একটি' নামে ষোলটি কবিতার পুস্তিকা সিরিজ প্রকাশ করছিলেন। ওই সিরিজের জন্য তিনি অন্নদাশঙ্করের কাছে ষোলটি কবিতা চেয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর প্রথমে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর হাতে কোনও কবিতা নেই। কিন্তু তার পরে পরেই ঝরঝর করে এসে গেল এক ঝাঁক ছড়া। সেই ছড়াগুলি যখন 'উড়কি ধানের মুড়কি' নামে প্রকাশিত হল তখন বাংলা সাহিত্যে একটা তাজা হাওয়া বয়ে গেল। ধীমান দাশগুপ্তের সঙ্গে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর বলেন, 'আমাদের সাবেক কালের ছড়া ছিল মৌখিক ঐতিহ্যের। মুখে মুখে কাটা হত. কানে শুনে মনে রাখা হত।.....আমি মৌখিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করি। ...কলেজে পড়াশুনো করে, বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, সরকারী চাকরি করতে করতে আমার মনে পাক ধরেছিল। ..... সেই আমি সব রকম কৃত্রিমতা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যখন ছড়া লিখতে বসি তখন আমি অন্য ধাতের মানুষ। আমার অন্য এক স্বরূপ।' তখন সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, লোকসমাজের আশা ও ব্যথা, লোক-জীবনের কল্পনা ও ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় তাঁর ছড়ায়। আকস্মিকভাবে ১৯৪২ সালে যা শুরু হয়েছিল আস্তে আস্তে তার একটা নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। তাতে যেমন বাংলা ছড়ার মৌখিক ঐতিহ্য বজায় থাকে তেমনই লোক-জীবনের সীমানাও হয়ে যায় বহু বিস্তৃত। তার সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষ সম্বন্ধে অনন্ত কৌতূহলে জীবন্ত এবং মানবিক বিকাশে বিশ্বাসী এক সৃষ্টিশীল চেতনা।

নয়

অন্নদাশঙ্কর 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের 'দুঃখমোচন' খণ্ড লেখার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সাহিত্যের চেয়ে চাকরিকে অগ্রাধিকার দিলেন। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তাঁর ভূমিকা প্রথম থেকেই বিতর্কিত। নওগাঁর মহকুমা শাসক থাকাকালে রাজশাহীর শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপার, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক থাকাকালে বাঁকুড়ার শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপার এবং কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক থাকাকালে শ্বেতাঙ্গ ডি. আই. জি. সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। তাছাড়া রাজশাহীর জেলাশাসক থাকাকালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের সন্দেহ হয় যে তিনিই প্রধানমন্ত্রীর গোপন টেলিগ্রাম পৌঁছে দিয়েছেন খবরের কাগজে। ফলে তাঁকে প্রশাসন বিভাগের পক্ষে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়। তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয় বিচার বিভাগে। তিনিও কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা জজের দায়িত্বভার নেওয়ার আগে লম্বা ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেলেন সিংহলে বা শ্রীলঙ্কায় এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে। ফেরার পথে গেলেন কটকে। সেখানে চিকিৎসা বিভ্রাটে শোচনীয় মৃত্যু হল তাঁর দ্বিতীয় সন্তান চিত্রকামেব। পুত্রেব মৃত্যুতে হঠাৎ যেন তাঁর চৈতন্যোদয় হল। নিজের জীবনকে খতিয়ে বিচার করলেন। উপলব্ধি করলেন যে ১৯৩৬ থেকে সাহিত্যের দায় নামিয়ে রেখে চাকরির দায় কাঁধে তুলে নিয়ে ভুল করেছেন। চাকরিটা তাঁর জীবিকা, সাহিত্যই তাঁর জীবন। কুমিল্লায় আবার 'সত্যাসত্যে'র পঞ্চম খণ্ড লেখা শুরু করলেন এবং সেইখানে ১৯৪০ সালে 'মর্তের স্বর্গ' নামক পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত করলেন।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল এক অর্থে ডেমক্রেসির সঙ্গে ডিকটেটরশিপের যুদ্ধ। 'সত্যাসত্যে'র ঘটনাকাল যদিও ১৯২৭-২৯ তবু এর প্রথম পাঁচ খণ্ডের রচনাকাল ১৯৩০ থেকে উৎসারিত হয়ে ১৯৪০ পর্যন্ত বিস্তারিত। এই পর্বে প্রমাণিত হয়ে গেছে ডিকটেটরশিপের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা। বর্তমান লেখকের সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার জন্য পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর বলেন, ডিকটেটরদের পৃথিবীতে বাদলরা বাঁচবে কী করে? ওদের মরতেই হবে। না মরলে মারা হবে। সত্যাসত্যের হতভাগ্য লেখককে শেষ কাজটি করতে হয়েছে।' উপন্যাসের নায়কের মৃত্যু পঞ্চম খণ্ডে হয়নি, হয়েছে 'অপসরণ' নামক ষষ্ঠ খণ্ডে, ১৯৪২ সালে যেটি অন্নদাশঙ্কর সম্পূর্ণ করেন বাঁকুড়ায় জেলাজজ থাকাকালে। তার শোচনীয় মৃত্যুর বীজ বপন করেছিলেন তার বাবা মহিমচন্দ্র সেন। তিনি একই সঙ্গে টুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স' থেকে নেমে আসা বাবা আবার দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইতিহাস থেকে নেমে আসা ডিকটেটর। কিন্তু 'সত্যাসত্য' শুধু ডেমক্রেসির সঙ্গে ডিকটেটরশিপের বোঝাপড়ার কাহিনী নয়, অনেকাংশ তাৎপর্যে 'সত্যাসত্য' সমৃদ্ধ। এ উপন্যাস ঘটনাপ্রধান নয়, ভাবনাপ্রধান। চরিত্রগুলির মৌল বিকাশের ধারা অনুসরণ এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য বিশ্ব ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মানব অস্তিত্বের স্বরূপ সন্ধান।

দশ

'সত্যাসত্যে' মানুষের অস্তিত্বের শর্তাবলি বহিরাশ্রিত, ভাবনাগুলিও সেখানে বহির্মুখী। চিত্রকামের মৃত্যুর পর থেকেই অন্নদাশঙ্কর ব্যক্তিত্বের গভীরে নিহিত সত্তার স্বরূপ সন্ধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু 'সত্যাসত্য' শেষ না করা পর্যন্ত সাহিত্যসাধনায় নতুন পথে অভিযান শুরু করতে পারছিলেন না। 'সত্যাসত্য' শেষ করে লিখে ফেললেন 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না' নামে একটি ছোটগল্প। মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব থাকে সেটাই এই গল্পে উপজীব্য। তার পরে লিখলেন 'দু কান কাটা'। এখানে গল্পের নায়ক সুকুমার যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে, কিন্তু মনের মানুষকে সে সমাজ-সম্মত পথে পায়নি, পেয়েছে হৃদয়ের পথে। অন্নদাশঙ্কর এই গল্পে চাওয়া পাওয়ার অর্থটাকেই একটা সংশোধিত নতুন রূপ দিয়েছেন। মননপ্রধান সাহিত্যিক এখানে মরমীসাধনার সাহিত্যিক। আপন ব্যক্তিত্বকে যাচাই করেছেন সমাজের দর্পণে। তাঁর এই ধারার অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'হাসান সখী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্পের শিল্পরূপের মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রক্ষেপ করতে গিয়ে বোঝা গেল যে ঐ রূপের এমন কতকগুলি শর্ত আছে যেগুলি মেনে চলতে গেলে নিজের সত্তা খানিকটা দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং বাদ পড়ে যায় অনেকখানি। ঐ সত্তাকে অবিকল রাখার জন্য অন্নদাশঙ্কর এক নতুন ঢঙে উপাখ্যান রচনা করলেন। এই উপাখ্যানের যে নায়ক তার নাম দিলেন বিনু। ওই নামের আড়ালে তিনি নিজের চেতনা উন্মেষের কাহিনী লিখলেন 'বিনুর বই'-এ। তার ভূমিকায় ১৯৪৪-এ তিনি নিজেই লেখেন, 'এটি কিন্তু কাহিনী হলো না। কাহিনী যদি হয়ে থাকে তবে জীবনের নয়, মনের। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।' কবিতার এক একটি স্তবকের মত এর এক একটি পরিচ্ছেদ। বাক্যের স্পষ্টতা হল চিন্তার স্বচ্ছতার দ্যোতক। গভীর কথাকে গম্ভীর না করে বলেছেন সরল করে পাণ্ডিত্যকে বর্জন করে গ্রহণ করেছেন বৈদগ্ধ্যকে। শিল্পচর্চার সঙ্গে সন্ধান করেছেন জীবনচর্যার সমন্বয়। একজন বিবেকবান শিল্পীর বহুতর প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাকে এই গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। 'আত্মানং বিদ্ধি'র তত্ত্বকে তিনি এখানে উলটে দিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে 'আমি কে'? এই জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ করেছেন।

লক্ষণীয় যে অন্নদাশঙ্কর যখন 'মন পবন' পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি লিখছেন তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটে যাচ্ছে বিস্ময়কর সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি অথচ সে সব কাণ্ডকারখানার কোনও ছায়া পড়েনি তাঁর ছোটগল্পে অথবা আত্মকথামূলক বিনুর উপাখ্যানে। অথচ এই সময়ই ঘটছে ঐতিহাসিক অগাস্ট বিপ্লব আবার এই সময়ই মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উপস্থাপিত হচ্ছে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'।

তবে ১৯৪২ সালে লেখা 'আদিম পাপ' ও 'জন্মস্বত্ব' প্রবন্ধ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অত্যল্পকাল পরেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্ব এশিয়া

থেকে শুরু করল স্বাধীনতা সংগ্রাম। আবার এই পর্বের মন্বন্তর জর্জরিত বাংলার বুক থেকে উঠল দারুণ হাহাকার। এই অস্থিরতার যুগকে বাংলার বহু সাহিত্যিক গল্পে উপন্যাসে কবিতার রূপ দিয়েছেন, কিন্তু অন্নদাশঙ্করের মত একান্তভাবে কালসচেতন ও দেশসচেতন সাহিত্যিককে 'রূপদর্শন', 'অজাতশত্রু' প্রভৃতি ছোটগল্প অথবা 'বিনুর বই'য়ের মতো আত্মকথা লিখতে ব্যাপৃত দেখে অবাক হতে হয়। আসলে এখানে তাঁর সাহিত্যিক সত্তা এবং সাংবাদিক সত্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অস্থির চঞ্চল সমকালীন ঘটনাবলী যতক্ষণ না একটা কোনও সুস্পষ্ট পরিণতি পাচ্ছে ততক্ষণ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর প্রতীক্ষা করেছেন।

আরও গূঢ় কথা আছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি গোপন সম্পর্ক রেখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে, ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে গোপন দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের কারও কারও সঙ্গে, ব্যক্তিগতভাবে আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়েছে গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিতে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হিসেবে নিজেকে শিল্পে সাহিত্যে কোনও পক্ষভুক্ত করেননি। 'লোকলক্ষ্মী গর্ভিনী'—রবীন্দ্রনাথের এই প্রজ্ঞা অনুসারে সমকালীন পরিস্থিতির প্রতিচিত্রণ বা বিশ্লেষণ থেকে তিনি সচেতনভাবে বিরত থেকেছেন, নির্বাচন করে নিয়েছেন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা।

এবং এই পর্যবেক্ষক নিরুৎসুক নন, সম্পূর্ণ উৎসুক। এই পর্বে সমকালীন ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষক রূপে অন্নদাশঙ্করের মানসিক প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে সার্থক রূপ পেয়েছে। যখন ১৯৪৫-এর জুন মাসে সিমলা বৈঠকে জিন্না দাবি করলেন যে ভাইসরয়ের কাউনসিলে মুসলিম লিগের সদস্য নন এমন কোনও মুসলিম সদস্য থাকতে পারবেন না তখন সমঝোতার সব সম্ভাবনা নষ্ট হল। এই উপলক্ষে অন্নদাশঙ্কর 'রামরাজ্যবাদীর বিলাপ' নামে একটি ছড়া লেখেন। তারপর দেশভাগের আলোচনার উপরে বড়োদের জন্য লেখেন 'দুই রাণী' আর একই সঙ্গে ছোটোদের জন্য 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদর' নামে দুটি ছড়া। চার বছর পরে 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদরে'র পরিপূরকরূপে যোগ করেন 'পিঠে ভাগের পরে' নামের ছড়াটি ইতিমধ্যে 'তেলের শিশি ভাঙল বলে / খুকুর পরে রাগ করো / তোমরা যে সব বুড়ো খোকা / ভারত ভেঙে ভাগ করো! /তার বেলা'? ছড়াটি সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে প্রবাদের পর্যায়ে উপনীত।

বিশেষত সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পরে অন্নদাশঙ্করের ছড়ার গোমুখী উন্মুক্ত হল, অচিরে তাঁর ছড়াগুলি পরিণত হল বাংলা সাহিত্যের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগে কিংবা একটি স্বতন্ত্র শিল্প-রূপে। একদা তিনি চেয়েছিলেন সাংবাদিক হতে। কিন্তু সাংবাদিকের গুটিপোকা কেটে বের হল সাহিত্যিক প্রজাপতি। অন্নদাশঙ্করের ছড়া সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের বা সুকুমার রায়ের পরিশীলিত সুসম সুসংস্কৃত ছড়া নয়, অন্নদাশঙ্করের ছড়া অসম স্বতঃস্ফূর্ত ছড়া, স্বদেশের ও স্বকালের লোক-মানসের শিল্পিত প্রকাশ। তাঁর ছড়া একাধারে সভাসাহিত্য ও লোকসাহিত্য।

এই ছড়া সাহিত্যের পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্য। অর্থাৎ তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস। অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অন্নদাশঙ্করের কথাসাহিত্যের পরিমাণে কম হলেও সেগুলির তাৎপর্য আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। প্রথম পাঠেই স্পষ্ট যে বাংলা ছোটগল্পের অভ্যস্ত রূপ থেকে তাঁর ছোটগল্পগুলির রূপ ভিন্ন, সংজ্ঞার্থ স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে চল্লিশোর্ধ্বে পৌঁছে তিনি যে সব ছোটগল্প লিখলেন সেগুলির কোনও কেন্দ্রীয় ঘটনা বা নাটকীয় মুহূর্ত নেই, আছে একটি আশুচেতন মানুষের জীবন, আছে সেই বিশেষ জীবনের কতকগুলি অর্থবহ অভিজ্ঞতার সংযোগে এক-একটি পরম অনুভূতির আস্বাদন। 'পরীর গল্প' (১৯৫৬), 'মীন পিয়াসী' (১৯৫৯), 'ও' (১৯৬০) প্রভৃতি গল্পগুলিতে তিনি শুধু ছোটগল্পের রূপ-রীতিকেই ভাঙেননি, বাস্তবতা সম্বন্ধে পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে ভেঙেছেন। এক মুহূর্তের জন্য সৌন্দর্য দেবীর দর্শন পাওয়ার জন্য 'ও' একটি জীবনভোর প্রতীক্ষার কাহিনী। গল্পের শেষে না আছে কোনও আকস্মিকতা, না কোনও পরিণতি। কোথাও প্রচলিত রীতির অনুবর্তন নেই, প্রত্যেক গল্পেই করেছেন নতুন রীতির প্রবর্তন। এই অবিরাম সৃষ্টিশীল পরিবর্তনশীলতাই তাঁর গল্পগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থকে তাঁর ছোটগল্প বহুদূর সম্প্রসারিত করেছে।

উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কন্যা' (১৯৫৩) ও 'সুখ (১৯৬১)-এ অন্নদাশঙ্কর ইচ্ছাকৃত ও সচেতনভাবে রূপকথার রূপ ও কথাকে উপস্থাপন করেছেন বিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে। কৈশোরে প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা' পড়ে চিরন্তন নারীর যে-কল্পনা জেগেছিল, যা সমৃদ্ধ হয়েছে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্য আর পাশ্চাত্য সাহিত্য-শিল্পের অভিজ্ঞতা থেকে, তার অন্বেষণের নতুন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসে। এর প্রথম ভাগ ১৯৫৭ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কিন্তু তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় এক যুগে পরে। তার মধ্যে চিরন্তন নারীর অন্বেষণ নিয়ে লেখা হয়ে গেছে আরও দুখানি উপন্যাস—'বিশল্যকরণী' (১৯৬৭) ও 'তৃষ্ণার জল' (১৯৬৮)—আসলে একই কাহিনীর পরম্পরা। আবার দশ বছর পরে 'রাজঅতিথি' (১৯৭৮) উপন্যাসটির প্রকাশ। তারপরে শুরু করলেন 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাসমালা লেখা। অগাস্ট বিপ্লবে গান্ধীজির উদাত্ত আহ্বান, 'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে' এবং ১৯৪৮ সালে গান্ধীহত্যা—এই সময়-সীমার মধ্যে ক্রান্তদর্শীর' কাহিনীর বিন্যাস। এই বছরগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছে স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং একই সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততায়; আর চারদিকে বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়। এই ঐতিহাসিক ঘূর্ণাবর্তে 'ক্রান্তদর্শী'র পাত্রপাত্রীর অসহায় অস্তিত্ব। 'ক্রান্তদর্শী' শুধুমাত্র উপন্যাস নয়, এক দারুণ দুর্দিনের মর্মান্তিক ইতিহাস। অন্নদাশঙ্কর ছিয়াত্তর বছর বয়সে ১৯৮০ সালে এই উপন্যাস শুরু করেন এবং সমাপ্ত করেন একাশি বছর বয়সে ১৯৮৫ সালে। কোন্ বনিয়াদের উপর আধুনিক ভারতকে নির্মাণ করা হয়েছে তা অনুধাবনের জন্যেও 'ক্রান্তদর্শী' একটা অমূল্য সূত্র।

এগার

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে অন্নদাশঙ্কর ছিলেন ময়মনসিংহের জেলা জজ। বাংলোর পরেই কিছুটা ফাঁকা জমি, তার পরেই ব্রহ্মপুত্র নদ। ছুটির দিনে সেখানে তিনি সাঁতার কাটতে যেতেন। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের এক সপ্তাহ আগে তিনি বদলি হন হাওড়ায়। বাংলো পাননি, থাকেন সারকিট হাউসে। পনেরো অগাস্টের সকালে হাওড়ার নেতারা তাঁকে পতাকা উত্তোলনের জন্য নিয়ে যান প্রথমে হাওড়া ময়দানে, তার পরে আদালতে। আর সন্ধ্যাবেলা অতুল্য ঘোষ নিয়ে যান হরিতকি বাগানের গৃহসভায়। যিনি সভাপতি তিনিই বক্তা। সভাশেষে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় সেদিনই শপথ নিয়েছেন এরকম পাঁচজন মন্ত্রীর। অন্নদাশঙ্কর তো শুধু একজন আই. সি. এস. আধিকারিক নন, একজন আদর্শবাদী সাহিত্যিকও। ব্রিটিশ আমলেও আদর্শের প্রশ্নেই বারবার তাঁর বিরোধ বেঁধেছে আরক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে। অগাস্ট বিপ্লবের সময়ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ থেকেছে। জজের বাংলোতে চরকা কেটেছেন। আবার কখনও বাংলো ছেড়ে, বিনা অনুমতিতে স্টেশন ছেড়ে, ব্রিটিশ প্রশাসনের পরম শত্রু গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। গান্ধীবাদী বলে সুপরিচিত ছিলেন ব্রিটিশ সরকারি মহলে।

এখন ভারত স্বাধীন। স্বাধীন ভারতে এরকম মানুষের জন্য চাই উপযুক্ত পদ। ওই অগাস্ট মাসেই অন্নদাশঙ্করকে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার ও কৃষি আয়কর ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেন্ট করা হল। কর্মোপলক্ষে প্রতিদিনই কারখানায় কাজ করতে গিয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের দশা দেখতে হত। আর তাদের থেকে চোখ সরালে দেখতেন দেওয়ালে টাঙানো বিকলাঙ্গ ভারতবর্ষের মানচিত্র। দুটি দৃশ্যই মর্মান্তিক, বিকলাঙ্গ মানুষ বিকলাঙ্গ স্বদেশ। সেই ১৯২৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত আঠারো বছরের কর্মজীবনে এই প্রথম কলকাতায় নিযুক্তি।

কলকাতায় মাত্র চার মাস থাকার পরে আবার বদলি হলেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক পদে। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন গান্ধীবাদী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ঘোষ-মন্ত্রীসভার বিশেষ ইচ্ছাক্রমে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিরাকরণের জন্য অন্নদাশঙ্করকেই জেলা শাসকের পদে নির্বাচন করা হল। কিন্তু তিনি জেলা শাসকের দায়িত্বভার নেওয়ার অব্যবহিত পরেই ঘটল গান্ধীহত্যা। মুর্শিদাবাদের কোনো কোনো মহলে গান্ধীহত্যার আনন্দে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হল। এটা জেলার সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার পরিচায়ক। ইতিমধ্যে ঘোষ মন্ত্রীসভার স্থলাভিষিক্ত হন রায় মন্ত্রীসভা।

একদিন রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে ডেকে পাঠানো হল দুজন জেলা শাসককে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের তাড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর লিখিত আদেশ চাইলে স্বরাষ্ট্র সচিব বললেন, লিখিত আদেশ মিলবে না। মৌখিক আদেশই যথেষ্ট। কিছুদিন পরে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় আসেন মুর্শিদাবাদে। হাসিমুখে এলেন,

ভারি মুখে গেলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় আর কিরণশঙ্কর রায়ের মধ্যে মতান্তর ঊর্ধ্বতন সরকারি মহলের আলোচ্য বিষয় হল। স্বাধীন মতাবলম্বী জেলা শাসককে মুর্শিদাবাদের মত গুরুত্বপূর্ণ জেলার শাসক পদে রাখা বিপজ্জনক মনে করে তাঁকে পত্রপাঠ বদলি করা হল কলকাতায়। কিন্তু তখনই তাঁকে কোনও পদে নিয়োগ করা হল না।

চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন কেন্দ্রে উচ্চতর পদের জন্য অন্নদাশঙ্করের নাম সুপারিশ করেন। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়ের আসল পরিচয় এই যে তিনি বাঙালি সাহিত্যিক। সেজন্যই আই. সি. এস.-এ যোগ দেওয়ার সময় কর্মস্থল রূপে বাংলা বেছে নিয়েছিলেন। সুকুমার সেন স্বয়ং জওহরলাল নেহরুকেও জানান যে অন্নদাশঙ্করের উপর অবিচার হয়েছে। কিন্তু ততদিনে অন্নদাশঙ্কর পদত্যাগের বিষয়ে মনঃস্থির করে ফেলেছেন। আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন যে বেশিদিন সরকারি চাকরি করবেন না। এমনকি বিয়ের আগে ভাবীপত্নী অ্যালিসকে বলেছিলেন সেকথা, প্রথম সুযোগই ত্যাগ করবেন অসাহিত্যিক পদ। নানা কারণে সে পরিকল্পনার রূপায়ণে দেরি হয়ে গেল। ততদিনে সুকুমার সেনের স্থলে চিফ সেক্রেটারি হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর অনুরোধে অন্নদাশঙ্কর এক মাসের জন্য জুডিসিয়াল সেক্রেটারির কাজ চালিয়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু সেই এক মাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে ছয় মাসে পরিণত হল। ফলে তাঁর কার্যকাল দাঁড়াল একুশ বছর কয়েক মাস। এর ফলে ঘটনাক্রমে তাঁর পুরো পেনসন পাওনা হয়ে গেল।

একে বলে শাপে বর। প্রথম থেকেই তাঁর পদত্যাগপত্র দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এতদিনে দিলেন সে পত্র। তখন তাঁর পুরো পেনসন পাওনা হয়নি। কুড়ি বছরের অতিরিক্ত কার্যকাল সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে পুরো পেনসন পাওনা হল। বড়ো ছেলে বড়ো মেয়ে আগেই চলে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে। দ্বিখণ্ডিত পরিবার আবার পেল অখণ্ড রূপ। অবশেষে ১৯৫১ সালে শুরু হল তাঁদের বহু বাঞ্ছিত শান্তিনিকেতনে বাস।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আমলে ছিল আশ্রম আর রথীন্দ্রনাথের আমলে হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়। অন্নদাশঙ্করকে এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি এক চাকরি ছেড়ে আর একটা চাকরি করতে চাননি। কথা দেন যে বিশ্বভারতীর প্রথম রেজিস্ট্রারকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন।

অন্নদাশঙ্করের যৌবনের প্রধান অংশই কেটেছে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ সেই ভূখণ্ডে যা ১৯৪৭-এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান রূপে নামাঙ্কিত। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কর্মের সূত্রে, কিন্তু বন্ধনটা আত্মার। রাজনৈতিক ব্যবধানের চেয়ে সত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলন। তবে সম্মেলনের মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে। তাই অন্নদাশঙ্কর প্রস্তাব দিলেন সাহিত্য মেলার। উপলক্ষ ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি। তার স্মরণে পাকিস্তান ও ভারতের বাঙালি সাহিত্যিকরা দু তিন দিনের জন্যে একত্র হয়ে দেশভাগের পর থেকে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন, ভাব বিনিময় করবেন। এটা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শেরই অঙ্গীভূত। যখন ১৯৫৩ সালের

সেই বিখ্যাত সাহিত্যমেলা বসল তখন শান্তিনিকেতনে চলছিল বাৎসরিক বসন্ত উৎসব। 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বারা খোল, লাগল যে দোল। স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল'। বর্তমান লেখক অবিস্মরণীয় আলোড়ন। তার পরোক্ষ প্রেরণা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু উপস্থিত পুরোহিত অন্নদাশঙ্কর।

অন্যদিকে ভারতের রাজধানীতে সংগঠিত হয় সাহিত্য আকাদেমি। জওহরলাল নেহরু তার সভাপতি আর সহসভাপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। শুরু থেকেই অন্নদাশঙ্কর হন সাহিত্য আকাদেমির কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য। অন্যান্য কর্তাদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কে. এম. পানিককর, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। যখন সাধারণ সংসদের সভা হত তখন আকাদেমির খরচে অন্নদাশঙ্করকে যেতে হয় দিল্লীতে। অন্য কার্যকর্তারা থাকেন দিল্লীতে। অন্নদাশঙ্করকে শান্তিনিকেতন থেকে যেতে হয় দিল্লীতে, আবার ফিরতে হয় শান্তিনিকেতনে। এক এক বারে পথে চার দিন সময় নষ্ট। ফলে ১৯৫৬ সালে অকাদেমির কার্যকর্তা পরিষদে পদত্যাগ।

চাকরির সুবাদে অন্নদাশঙ্কর জেনেছেন বাংলা ও বাঙালিকে। আর সাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয় ভারতের সর্বোচ্চ স্তরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির, তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার সস্ত্রীক এক পংক্তিতে ভোজনের সুযোগও হয়। খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও হয় তাঁদের কারও কারও সঙ্গে। কিন্তু বারবার সাহিত্য আকাদেমির কাজে আসা যাওয়া করতে করতে অনেকখানি সময় নষ্ট হচ্ছিল তাঁর, তাতে ক্ষতি হচ্ছিল সাহিত্যের সাধনায়। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের জন্যই ছাড়লেন সাহিত্য আকাদেমির সংসর্গ।

সাহিত্য আকাদেমি ছাড়লেও অন্নদাশঙ্কর পোয়েট্স এসেয়েস্টিস নভেলিস্টস সংক্ষেপে পি.ই.এন. বা পেন ক্লাবের সদস্যপদ ছাড়েননি। এটি এক আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থার সূত্রেও জওহরলাল, রাধাকৃষ্ণন প্রমুখের সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর পরিচিত হন। পি. ই. এন ক্লাবে: দস্য রূপেই অন্নদাশঙ্কর ১৯৬৭ সালে যান জাপান ভ্রমণে। জাপান প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের প্রতিস্পর্ধী এক প্রাচ্য সভ্যতা। প্রাত্যহিক সংগ্রামে পাশ্চাত্য কিন্তু অন্তর্গূঢ় সাধনায় প্রাচ্য কিংবা আরও নির্দিষ্টরূপে বললে জাপানী। তাঁর জাপান দর্শনের কাহিনী নিছক ভ্রমণের কাহিনী নয়, জাপানের সাধনার স্বরূপ সন্ধানের কাহিনীও বটে। 'জাপানে' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। আবার ১৯৬৩ সালে সাহিত্যিক রূপেই জার্মান রেপাবলিকের আমন্ত্রণে যান জার্মানি এবং পি.ই. এন.-এর ব্যবস্থাপনায় ফ্রান্স ও ইংলন্ড। যখন যে দেশে গেছেন তখনই সে দেশের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক অধ্যয়ন ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে গেছেন সে দেশের বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের সমকক্ষতা অর্জন করে। দ্বিতীয় বার ইয়োরোপ ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ফেরা' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।

পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিন চার দিনের জন্য কলকাতায় বেড়াতে আসেন অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়। কয়েকদিন পরেই একুশে ফেব্রুয়ারি। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হবেন অন্নদাশঙ্কর রায়। যদিও একুশে ফেব্রুয়ারি অমর হয়েছে পাকিস্তানের সরকারি ভাষানীতির প্রতিবাদে শহীদ দিবস রূপে, তবু ১৯৬৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির স্মরণসভায় পূর্ব বাংলায় প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তানের ডেপুটি হাই

কমিশনার জনাব সৈয়দ হাসান ইমাম যোগ দিতে রাজি হন। সেই উপলক্ষে অন্নদাশঙ্কর আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে। এক অর্থে ১৯৬৭ সালের শহীদ দিবস হবে ১৯৫৩ সালের সাহিত্য মেলার জের। ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছ থেকে ফিরে এসে দেখেন ইতিমধ্যে লীলা রায় পড়ে গিয়ে উরুদেশের হাড় ভেঙেছেন। অবিলম্বে অপারেশন চাই। যেদিন অমর একুশের অনুষ্ঠান সেদিনই অপারেশন। সভাপতি হিসেবে অন্নদাশঙ্কর নির্দেশ দেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাইবার জন্য। সভাস্থ অনেকেই উদ্দীপ্ত হয়ে গলা মেলালেন গায়কদের সঙ্গে। চার বছর পরে এই গানই হয় স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। আর যে সার্জন অপারেশন করলেন তিনি বললেন পেসেন্টকে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ভাঙা হাড় ঠিকভাবে জোড়া লাগছে কিনা। আর নিয়মিত পরীক্ষার জন্য দু বছর লীলা রায়কে কলকাতাতেই থাকতে হবে কোনো একতলা বাড়িতে। তখন থেকে শুরু হল অন্নদাশঙ্করের কলকাতা বাস।

অন্নদাশঙ্করের আই. সি. এস. চাকরিতে ঢোকার অন্যতম কারণ ছিল বাংলা ও বাঙালিকে জানার ঐকান্তিকতা, চাকরি ছাড়ার তাৎক্ষণিক কারণ ছিল বাঙালি ঐক্য ভাঙার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সাহিত্যমেলায় তাঁর উৎসাহের কারণ ছিল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বাঙালি সংহতি রক্ষার জন্য আহ্বান জানানো এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের উপলক্ষ ছিল সোনার বাংলার স্বপ্ন। অবশেষে সেই স্বপ্ন আংশিকভাবে সত্য হল ১৯৭১ সালে। অন্নদাশঙ্কর লিখলেন, 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা। / গৌরী মেঘনা বহমান / ততকাল রবে কীর্তি তোমার / শেখ মুজিবুর রহমান'। কিন্তু এই স্বপ্নের মূল স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট আততায়ীদের হাতে নিহত হন। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অন্নদাশঙ্কর লিখলেন, 'কাঁদো, প্রিয় দেশ' নামে একটি প্রবন্ধ। সমগ্র উপমহাদেশে তখন দারুণ উত্তেজনা। পাছে আন্তর্জাতিক বিতর্কে ভারত জড়িয়ে পড়ে তাই সে প্রবন্ধ প্রকাশে কেউ রাজি হয় না। পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। ততদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের মূল স্থপতির সহকারীরাও নিহত। অপূর্ণ থেকে যায় অন্নদাশঙ্করের স্বপ্ন। এক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের জীবন দল-ধর্ম-রাজনীতি-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে চিরন্তন বাঙালির অন্বেষণ।

বারো

অন্নদাশঙ্করকে শুধু চিরন্তন বাঙালির অন্বেষক বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুমুখী। সেই ব্যক্তিত্বের একটা তাৎপর্যপূর্ণ মুখ হল তাঁর সৃষ্টিশীলতা। সৃষ্টির দার্শনিক তাৎপর্যের দুঃসাহসিক অন্বেষণে ব্যাপৃত না হয়েও বলা যায় যে অন্নদাশঙ্করের কাছে সৃষ্টির প্রাথমিক তাৎপর্য হল সাহিত্য সৃষ্টি। কিন্তু এই সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে আছে অন্নদাশঙ্করের শিল্পজগৎ। কাকে বলে শিল্প? এই প্রশ্নের উত্তর অন্নদাশঙ্কর বিশদভাবে দিয়েছেন 'আর্ট' নামক গ্রন্থে। শুরু করেন ১৯৪৪ সালে, পর্বে পর্বে শিল্প রহস্যের

উন্মোচন সম্পূর্ণ করেন ১৯৬৮ সালে। বাংলায় শিল্পতত্ত্বের সুগভীর, সুবিন্যস্ত ও মৌলিক বিশ্লেষণে 'আর্ট' আজও অদ্বিতীয়। 'আর্ট'-এ তিনি বলেছেন সবকালীন সাহিত্যের কথা আর 'সাহিত্যে সঙ্কট' শীর্ষক ভাষণমালায় বলেছেন সমকালীন সাহিত্যের কথা। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাসের সংকট 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে পেয়েছে এক রকম রূপ আর দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ের পাশ্চাত্য সাহিত্যে উল্লিখিত সংকট পেয়েছে অনেকান্ত রূপ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সীমানাকে সম্প্রসারিত করলে পাওয়া যাবে সাম্প্রতিক বিশ্ব সাহিত্য। এখানে সাম্প্রতিকতার অর্থ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ যেহেতু এই বক্তৃতামালা প্রদত্ত হয় ১৯৫৫ সালে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গান্ধীর আবির্ভাবের সময় থেকেই অন্নদাশঙ্কর গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনায় ভেবেছিলেন ব্রিটিশদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ না করে যোগ দেবেন আন্দোলনে। ঘটনাক্রমে তাঁকেই যৌবন অতিবাহিত করতে হলে ব্রিটিশ সরকারের পরিষেবায়। কিন্তু শিক্ষানবিশির কালে ইংলন্ডে এবং চাকুরিকালে এদেশে তাঁর বেসরকারি পরিধান ছিল খদ্দর। পরিস্থিতি অনুসারে সরকারি স্থানেও পরতেন খদ্দরের স্যুট। গান্ধীহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন 'প্রত্যয়' নামক প্রবন্ধমালা। সে একটা যুগ এসেছিল যখন গান্ধী বিরোধিতা ছিল জাতীয়তাবাদের অপর নাম, আর জাতীয়তাবাদের উৎপীড়নই ছিল অন্নদাশঙ্করের পদত্যাগের উপলক্ষ। পরে ১৯৬৯ সালে প্রকাশ করেন 'গান্ধী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ। যা পরে ১৯৭৬ সালে 'Yes, I Saw Gandhi' নামে প্রকাশিত হয়। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে গান্ধীর মতবাদ ও ব্যক্তিত্বকে অন্নদাশঙ্কর অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'গান্ধী' জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির ভক্তিপূর্ণ জীবনী নয়, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে তাঁর 'গান্ধী' হলেন আন্তর্জাতিক ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক।

অন্নদাশঙ্করের কাছে রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য স্বভাবতই অনেকান্ত। রবীন্দ্রনাথের অর্থ আনন্দ তারুণ্য সৌন্দর্য। কল্যাণবৃত্তি ও বিকাশশীলতা, মানবিকতা ও সহযোগিতা। সেই প্রথম যৌবনে 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 'রক্তকরবীর তিনজন' শীর্ষক রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধটি লিখে। সম্পাদক আরও লেখা চাইলে অন্নদাশঙ্কর 'পথে প্রবাসে' লেখা শুরু করলেন। 'পথে প্রবাসে'র লেখকের কাছে 'কল্লোল'-এর পক্ষ থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লেখা চেয়ে পাঠালে অন্নদাশঙ্কর লন্ডন থেকে 'রবীন্দ্রাদিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন। ইয়োরোপ থেকে ফিরে অচিন্ত্যকুমারকে সঙ্গে নিয়েই অন্নদাশঙ্কর শান্তিনিকতনে গেলেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখী' দেওয়ার জন্য। যখন ১৯৪০ সালে অন্নদাশঙ্কর সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে যান তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লীলা রায়কে, 'শুনেছি তুমি কর্মিষ্ঠা মেয়ে। এখানে এত রকম বিভাগ। একটা কোনও বিভাগে যোগ দাও।' পরের বছর—তখন অন্নদাশঙ্কর বাঁকুড়ার জেলা জজ—পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে রচিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন অন্নদাশঙ্করকে : 'শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ;/ দিয়েছি উজাড় করি / যাহা কিছু আছিল দিবার, / প্রতিদানে যদি কিছু

পাই / কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা / তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই। পারের খেয়ায় যাব যবে / ভাষাহীন শেষের উৎসবে।' রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ সালে অন্নদাশঙ্কর প্রকাশ করলেন 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একখানি গ্রন্থ। মৌলিক মননে ও স্বকীয় সংজ্ঞায় সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন থেকে যায় রবীন্দ্রনাথের আলোকসামান্য আবির্ভাবের অনেকান্ত পটভূমি সম্বন্ধে। অন্নদাশঙ্কর ১৯৭৯ সালে উক্ত পটভূমির উজ্জ্বল ও বিশদ মানচিত্র এঁকেছেন 'বাংলার রেনেসাঁস' নামক গ্রন্থে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা যে সাংস্কৃতিক জাগরণ হয় তার প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে বহু রচনা ও বহু বিতর্কের মধ্যে 'বাংলার রেনেসাঁস' লেখকের নিজস্ব বৈদগ্ধ্যে স্বতন্ত্র। এই রেনেসাঁস তাঁর দৃষ্টিতে প্রথাসিদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ। একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি যখন পাণ্ডিত্যমূলক বিষয়ের মূল্য নির্ণয় করেন তখন স্বভাবতই তার তাৎপর্য উন্নীত হয় উচ্চতর স্তরে, তার উপরে যদি সেই ব্যক্তির অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা হয় গভীর ও ব্যাপক তাহলে তার প্রতিফলনে গবেষণামূলক রচনাও পায় সৃষ্টির দ্যোতনা।

একথাটা অন্নদাশঙ্করের প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণীয় যে তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার মানুষ তিনি নন। 'সত্যাসত্যে'র বাদল কর্তার কর্তৃত্বের কাছে একবার মাথা নোয়াবার খেসারত দিয়েছে তার সমস্ত জীবন দিয়ে। ইংরেজ আমলে শাসন বিভাগে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষ হয়েছে একথা আগে বলেছি। আর স্বাধীন ভারতে যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়েছে তখন সভ্যভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে সরে এসেছেন কর্তৃত্বের কবল থেকে। ব্যক্তিগত অসুবি[illegible] ভেবে তিনি নিজের কথা বলা থেকে কখনও নিরস্ত হননি। সুবিধাবাদী মৌন[illegible] আপোসহীন। [illegible] কণ্ঠস্বর চিরকালই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। তিনি সৃষ্টি[illegible] শুধু [illegible] পরিচয়ের সীমানাতে আবদ্ধ থেকে তাঁর সন্তুষ্টি নেই। পাকিস্তানে [illegible] সনে, গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হল তখন তিনি তীব্র মর্মদা[illegible]লেন 'চন্দ্রগ্রহণ' ও 'একেশ্বরবাদ' নামে দুটি প্রবন্ধ, 'অপ্রমাদ' নামক গ্রন্থে প্রবন্ধ দুটি ১৯৬০ সালে সংকলিত হয়। গণতন্ত্রের নির্বাসন ও একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন অন্নদাশঙ্করের অনুভবে তা জাগায় প্রবল প্রতিবাদ। আবার ভারতে যখন ১৯৫৯ সালে কেরলে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট গভর্নমেন্টকে সংবিধানের ৩৫৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুসারে উৎখাত করা হয় তখনও অন্নদাশঙ্কর প্রদিবাদ জানান 'সূর্যগ্রহণ' নামক প্রবন্ধে এবং অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের মতো বিশ্লেষণ করে দেখান যে কেন এক্ষেত্রে ওই বিশেষ অনুচ্ছেদটি প্রয়োগের অযোগ্য। এই প্রবন্ধটি ১৯৬১-তে প্রকাশিত 'দেখা' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং তার ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন, 'সূর্যগ্রহণ লেখার পর রাজনীতির উপর আমার ঘেন্না ধরে যায়।' ভেবেছিলেন সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে আর লিখবেন না। তাই ১৯৬০ সালে অসমে যেসব মমর্ন্তুদ কাণ্ড ঘটে সেসবেও প্রথমে নীরব ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখে ফেললেন 'ড্রাগনের দাঁত' নামে একটি প্রবন্ধ। ওই প্রবন্ধ আনন্দবাজার শারদীয় সংখ্যায়

প্রকাশিত হলে কোনো কোনো শহরে সংখ্যাটি কেড়ে নিয়ে পোড়ানো হয়। আবার যখন ১৯৬২ সালে চীন ও ভারত সীমান্ত নিয়ে বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে তখন অন্নদাশঙ্কর 'দেশ' পত্রিকায় লেখেন 'যোগভ্রষ্ট'। তখন 'দেশ' সম্পাদক দেশ বিপন্ন হলে শিল্পীর দায়িত্ব কী এ বিষয়ে বহু সাহিত্যিকের মতামত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রত্রিকায়। সবার বক্তব্য থেকে স্বতন্ত্র ছিল অন্নদাশঙ্করের বক্তব্য। এবং অবশ্যই সবচেয়ে তথ্যসমৃদ্ধ। আবার ১৯৬৪ সালে ভারত উপমহাদেশে হজরত-বাল নিয়ে বাধল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অন্নদাশঙ্কর লিখলেন 'নক্ষত্রের আলো'। কিন্তু দেশবাসীর কাছে সেই অন্ধকার দুর্দিনে 'নক্ষত্রের আলো' পৌঁছে দেবে কে? বিভিন্ন পত্রিকা থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হল 'পরিচয়' পত্রিকায়। এ-রকম অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যায় যেখানে অন্য অনেকে নিরুত্তর, প্রতিবাদী শুধু একা অন্নদাশঙ্কর। আবার ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবাংলা যখন মুক্তির দশকের উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত, বুদ্ধিজীবী সমাজ যখন মনীষীদের সম্ভ্রম পাতনে সন্ত্রস্ত, তখন অন্নদাশঙ্কর ঘোষণা করলেন 'প্রাণরক্ষায় ও বংশরক্ষার অধিকার'। আর বাংলাদেশে মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবর্গের হত্যাকাণ্ডে অন্নদাশঙ্করের প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি।

ঘরে বসে সাহিত্য তথা সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় একথায় প্রতিবাদ অন্নদাশঙ্কর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন। যখন প্রতিবেশী দেশের এক সাহিত্যিকের উপর কয়েকজন অখ্যাত ধর্মান্ধ মৃত্যুদণ্ড জারি করে তখন উননব্বই বছরের বৃদ্ধ অন্নদাশঙ্কর প্রতিবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। মানুষকে তিনি জাতপাত জেলা মহকুমার সীমানা দিয়ে আবদ্ধ করতে প্রস্তুত নন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে সব দেশের সব মানুষই এক সংহত মানব পরিবারের অন্তর্গত এবং এই মানব পরিবারের ধারণার উপরেই ১৯৪৮ সালে রচিত হয়েছে মানবাধিকারের সনদ। শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত মানুষের সামনে অন্নদাশঙ্করের জীবন বিবেক ও সাহসের উৎস।

অন্নদাশঙ্করের প্রতিবাদী জীবনের নেপথ্যকাহিনী তিনি নিজেই উন্মোচন করেছেন 'বিনুর বই : দ্বিতীয় পর্ব' নামক আত্মকথামূলক অসাধারণ সাহিত্যে। এই বই শুধু একজন সাহিত্যিকের জীবনের ঘটনাগুচ্ছের সংকলন নয়, কী ভাবে সেই সাহিত্যিক কায়েমী ব্যবস্থার থেকে ক্রমে ক্রমে সরে গিয়ে এক স্বকীয় ব্যক্তিত্বে বিকশিত হল, কোন্ কোন্ বিন্দু থেকে তাঁর অমোঘ অপসারণ ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর রূপান্তরিত আত্মবর্তন সেসব বৃত্তান্তে 'বিনুর বই : দ্বিতীয় পর্ব' সচেতন পাঠকের জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এই বইয়ের শেষ অনুচ্ছেদটি এই জীবনকাহিনীরও উপযুক্ত বলে উদ্ধৃত করছি—

> *'মানুষের স্বয়ংসংশোধিকা শক্তিতে বিনুর বিশ্বাস অটল। একটা প্রজন্মের ভুল আর একটা প্রজন্ম সংশোধন করবে। একটা শতকের ভুল আর একটা শতক। তবে কতক মানুষকে সদা সজাগ থাকতে হবে। তারা অতন্দ্র প্রহরী।'*

অন্নদাশঙ্কর আমাদের শতাব্দীর একজন অতন্দ্র প্রহরী। এজন্যেই নবতি অতিক্রান্ত বয়সেও অন্নদাশঙ্কর অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়েন মৌলবাদী ফতোয়ায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত

বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের প্রাণরক্ষার সংগ্রামে। গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ সমানধর্মাদের সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ডেপুটি হাইকমিশনারের দপ্তরের বাইরে প্রখর রৌদ্রে তিন ঘণ্টা ধর্না দিয়ে শেষ পর্যন্ত ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তসলিমার প্রাণরক্ষার আবেদন জানান। সেই সঙ্গে সাহিত্যিক সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা পি. ই. এন.-এর ভারতীয় শাখার সভাপতি রূপে বিশ্বজনমত সংগঠনে সচেষ্ট হন। অবশেষে ১৯৯৪-র ৯ আগষ্ট তসলিমা প্রাণ নিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগে সমর্থন হন।

তসলিমার সূত্রে শিল্পীর অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে আটটি নিবন্ধ সংকলন করে ১৯৯৬ সালে প্রকাশ করেন 'সেতুবন্ধন' গ্রন্থটি। সেতুবন্ধন শব্দটির মধ্যে রয়েছে অন্নদাশঙ্করের জীবনের একটি বীজমন্ত্র। দেশে দেশে ধর্মে ধর্মে মানুষে মানুষে মিলনের ও সম্প্রীতির কাজকে তিনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ অগ্রাধিকার দেন। সেই বছরেই প্রকাশিত হয় আরও একটি বই—'নব্বই পেরিয়ে'।

একই সঙ্গে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অহ্বানে অবিশ্রান্তভাবে লিখে যান প্রবন্ধ, ছড়া ও কবিতা। এগুলির মধ্যে দুটি রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—একটি হল শারদীয় আনন্দবাজার-এ 'জীবন যৌবন' নামে অসাধারণ জীবনস্মৃতি এবং অপরটি শারদীয় দেশ-এ 'নীলনয়নী উপাখ্যান' নামে একটি অসাধারণ বিস্ফোরক ছোটগল্প। গল্পটি লিখে প্রমাণ করলেন নব্বই বছরেও তিনি 'চিরযুবা, তুই যে চিরজীবী'। আর 'জীবনযৌবনে' বিধৃত হয়েছে তাঁর দেখা অখণ্ড বাংলার অন্তরঙ্গ পরিচয়, আর সেই সঙ্গে বাংলা দ্বিখণ্ডীকরণের একান্ত কাহিনী যা তিনি জেনেছেন আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে।

আপন উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ থেকে অন্নদাশঙ্কর বাংলাদেশ থেকে ভিসা ছাড়াই সীমা পেরিয়ে আসা মানুষদের সমস্যা নিয়ে ১৯৯৬-এর ১৮ জানুয়ারি আনন্দবাজার-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন 'অনুপ্রবেশ' নামে। এক মাস পরে কেউ তাঁকে ফোন করে জানান, তাঁকে অভিনন্দন জানাতে কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক তাঁর বাড়ি আসবেন। কিন্তু তাঁদের আগেই এলেন কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ, কারণ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে অন্নদাশঙ্করের উপর হামলার চক্রান্তের খবর রয়েছে। তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশে রাজ্য পুলিশ সাড়ে তিনমাস তাঁকে পাহারা দেয়।

তসলিমার প্রাণরক্ষার প্রশ্নে মুসলিম মৌলবাদীদের আর অনুপ্রবেশ প্রশ্নে হিন্দু মৌলবাদীদের দুই ধরর্মের মেলৌবাদীদেরই কাছে শত্রু রূপে গণ্য হলে অন্নদাশঙ্কর। অর্থাৎ নব্বই পেরিয়েও তিনি সর্বপ্রকারের জাতীয়তাবাদীদের ক্রোধের কারণ ঘটানোর মতো জীবন্ত, সতেজ ও স্বকীয়।

১৯৯৬-এর ডিসেম্বর মাসে অন্নদাশঙ্কর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ অতিথি রূপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে যান। ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন অনেকগুলি প্রবন্ধ। প্রধান রচনাটির সঙ্গে আরও কতকগুলি একই বিষয়ের প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয় 'মুক্তবঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থটি, আর বাকি প্রবন্ধগুলি যোগ করা হয় 'কাঁদো প্রিয় দেশ' গ্রন্থটির নতুন সংস্করণে। বাংলা

ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংস্কৃতির তথ্য বাঙালি জাতিসত্তার জীবন্ত বিগ্রহ রূপে তিনি বাংলাদেশের দুটি বিখ্যাত পুরস্কার পেয়েছেন—বেগম জেবুন্নেসা পুরস্কার আর কাজী মাহবুবল্লাই জনকল্যাণ ট্রাস্ট পুরস্কার। এছাড়া ২০০১ সালে ঢাকার সাহিত্য প্রকাশ নামক প্রকাশক সংস্থা পূর্ববঙ্গ সম্পর্কিত তাঁর নির্বাচিত রচনাবলির সংকলন 'আমার ভালোবাসার দেশ' নামে প্রকাশিত করেছে।

১৯৯৬-এ 'বঙ্গলোক' নামে একটি নতুন দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। 'বঙ্গলোক' অন্নদাশঙ্করকে আমন্ত্রণ জানায় প্রতি সপ্তাহে একটি কলম লেখার জন্যে সেই কবে থেকে তাঁর সাধ সাংবাদিক হবার। কিন্তু এ কলমের লেখাগুলি নিছক সাংবাদিক সুলভ সাময়িক মূল্যের রচনা নয়, এক 'বিদগ্ধ মানস'-এর প্রকাশ হয়েছে লেখাগুলিতে। ইতিমধ্যে স্বাধনীতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে তিনি কতকগুলি অসাধারণ প্রজ্ঞাগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন যেগুলি সংকলিত হয় 'নতুন করে ভাবা' নামক গ্রন্থে। তাঁর আদর্শের যে-ভারত তার আভাস রয়েছে এই গ্রন্থে।

১৯৯৯-এ 'বর্তমান' পত্রিকার আহ্বানে অন্নদাশঙ্কর শারদীয় সংখ্যা জন্য তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রসঙ্গে রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির সভাপতিরূপে তাঁর সমস্যা কথাও তিনি লিখেছেন। ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন বলে তাঁর নাম ওই পুরস্কারের জন্য কখনও উত্থাপিত হয়নি। বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ সম্মানজনক ওই পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয় ২০০০ সালে 'নব্বই পেরিয়ে' গ্রন্থটির জন্য।

বহুকাল থেকে অন্নদাশঙ্করের ইচ্ছে ছিল ভারতের পুনর্নবীকরণ নিয়ে একখানি গ্রন্থ রচনার। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের একবার পুনর্নবীকরণ হয়। বিংশ শতাব্দীতে তার দম ফুরিয়ে যায়। আবার পুনর্নবীকরণ চাই। কী হবে তার চিত্র, তার চরিত্র? লেখা শুরু করলেন, সূত্রগুলি উত্থাপন করলেন, কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার আগেই, ২০০২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁর শরীর বাদ সাধতে লাগল। প্রথমে নিশ্বাসের কষ্ট আর মাথা ঘোরার জন্য ড. স্বয়ম্ভু মুখোপাধ্যায়ের অধীনে রিপোজ নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল। কিন্তু তিনি বাড়ি আসার জন্য এতই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন যে ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে। ওঠা-হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল। বহুদিনের অভ্যেস সন্ধ্যার সংবাদ দূরদর্শনে দেখা ও শোনা আর রাতে খাবার পরে শুয়ে শুয়ে ধ্রুপদী সংগীত শোনা। দুটো বন্ধ হয়ে গেল। একে একে অচল হয়ে যেতে লাগল ইন্দ্রিয়গুলি। সারাক্ষণই শয্যাশায়ী, অনেকক্ষণই আচ্ছন্ন। তবু মানুষ, পৃথিবী ও সময় সম্বন্ধে আগ্রহ এখনও জীবন্ত, জিজ্ঞাসা এখনও বহুমুখী, এখনও তাঁর জানা চাই প্রতিদিন সকালের খবর ও প্রিয়জনদের কুশল। এখনও চেতনা সজাগ, সবার জন্য এখনও তাঁর অসীম শুভেচ্ছা। বিশদ জীবনকথার জন্য আমার লেখা 'ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর' বইটি দেখে নিতে পারেন (বইটি ডি. এম. লাইব্রেরি কলকাতা-৬ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)।

সৌজন্যে : 'সাংস্কৃতিক খবর'

রেনেসাঁস ও মানবতাবাদ

স্বরাজ সেনগুপ্ত

এক

আমাদের রবীন্দ্রচর্চায় সাধারণত যে দিকগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দিক এবং রবীন্দ্রনাথের কর্মের দিক, অন্নদাশঙ্করের রবীন্দ্রচর্চায় জোর পড়েছে সেই দিকেই বেশি। এর অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, অন্নদাশঙ্কর নিজে মননশীল সাহিত্যিক। এমন নয় যে অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিপুল ঐশ্বর্য সম্পর্কে অনবহিত বা নিরুৎসুক। তবে, সেই ক্ষেত্রের বহু কণ্ঠের কলরবে কণ্ঠ মেলাতে অন্নদাশঙ্কর যে বিশেষ আগ্রহী নন তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, সমাজচিন্তা, স্বদেশভাবনা, মানবসভ্যতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব, তাঁর জগৎবীক্ষা ও জীবনদর্শন—অন্নদাশঙ্করের বিশেষ আগ্রহ এই দিকটাতে। সেই সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের দিকে, তাঁর সংকল্প ও সাধনার দিকে, যেভাবে নিজের জীবনদর্শনের আলোকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছেন সেই দিকে।

এই গড়ে তোলা কাজটি সহজ নয়, এবং এ কাজ সকলের জন্য নয়। খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে, গঠিত সত্তা নিয়ে, নিজের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ লালন করে, নিজের জীবনকে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্রতায় গড়ে তোলা যায় না।

আধুনিক জীবনে, বিশেষ করে আমাদের মতো ঔপনিবেশিক পরিবেশে, চিন্তার আর ভাবের বিচ্ছেদ—এবং আরো বেশি, চিন্তা আর আচরণের বিচ্ছেদ, এ যেন একটা পরিব্যাপ্ত অভিশাপের মতো। আমাদের দেশে নানামুখী বিচ্ছেদের সেতুবন্ধন রচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রগণ্য। এর মধ্যে একটা আত্ম-উত্তরণের সাধনা আছে,—একটা সমগ্রতার সাধনা আছে। এই সমগ্রতার সাধনা অন্নদাশঙ্করকে বিশেষভাবে উদ্বেলিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সমগ্রতার সাধনাকে অন্নদাশঙ্কর পারম্পর্যহীন অনুষঙ্গহীন একটি বিচ্ছিন্ন একক-চেষ্টা হিসেবে দেখেন নি। অন্নদাশঙ্কর ব্যাপারটিকে বুঝেছেন এর ঐতিহাসিক পটভূমিতে একে স্থাপন করে। রবীন্দ্রনাথের উদার এবং সেকুলার মানবিকতাকে, রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ হাঁ-ধর্মী চিত্তবৃত্তিকে, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অফুরন্ত আগ্রহকে, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগকে, জীবনকে শতদলে বিকশিত করার আদর্শকে, রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ আলোকিত মুক্তবুদ্ধির জীবনদর্শনকে অন্নদাশঙ্কর

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভাবাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের "রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন (পৃঃ ১০৬-১০৭) তা এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

রেনেসাঁসকে যদি একটি অবিভাজ্য প্রোসেস বলে ধরে নিই, যদি একটা দেশের ধারা না বলে একটা যুগের ধারা বলে নিই, তা হলে বুঝতে পাবব রবীন্দ্রনাথ কোন্‌খান থেকে কেমন করে অবতীর্ণ হলেন। যে প্রাণপ্রবাহ ইউরোপকে প্লাবিত করে পরে ভারতকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারই একটি ঢেউয়ের নাম লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, আব একটির নাম শেক্সপীয়র, আর একটির নাম গ্যেটে, আর একটির নাম রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য আরো অনেকগুলি ঢেউয়ের নাম করতে পারা যায়।...পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুনকে গড়বার সুযোগ দিল সেই প্রোসেস। গড়ার ভার যাঁদেব উপর বর্তাল রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন কারিগর। তাঁর দেশ ভিন্ন, দেশের অবস্থা ভিন্ন, কিন্তু যুগ অবিভাজ্য।'

এই যুগটাকেই বিস্তৃত পরিধিতে আমরা বলি আধুনিক যুগ। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর স্বদেশের একজন, তেমনি তিনি তাঁর স্বকালের—অর্থাৎ আধুনিক যুগেরও একজন। স্বদেশের দাবী হল জাতীয় ঐতিহ্যের দাবি, স্বকালের দাবি হল আধুনিকতার দাবি। এই দুই দাবিকে মেলানো একটা মস্ত কাজ। সমন্বয়ের জাদুকর রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য আর আধুনিকতাকে সুন্দরভাবে সমন্বিত করে নিয়েছেন। কিন্তু যেখানে এ দুইয়ে বিরোধ চূড়ান্ত? বিরোধ চূড়ান্ত হলে সমন্বয় সম্ভব নয়। সেখানে বরীন্দ্রনাথ কী করেছেন?

এই একই প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর সেইরকম পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বলেছেন (পৃঃ ১০৯) ঃ

'রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমাদের নিজেদের মধ্যে এ জাতীয় বিভেদ বা বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয়নি। হলে তিনি কোন্ পক্ষে যেতেন বলা দুঃসাধ্য। তবে তাঁর শেষ জীবনের লেখা পড়লে ও কথাবার্তা শুনলে মনে হতো বিরোধের দিন তিনি রেনেসাঁসের পক্ষেই রায় দিতেন। সেকুলারের পক্ষে। প্রাকৃতি[illegible]র পক্ষে। মানবিকের পক্ষে। কিন্তু তার মানে এ নয় অপর পক্ষে তাঁব সায় নেই। তার মানে তিনি যুক্তিব দ্বারাই চালিত।'

অন্নদাশঙ্কর অবশ্য এখানে একটি বিশেষ বিরোধের কথাই বলেছেন ঃ সমাজের নীতি বুনিয়াদ মানবিক কি ঐশ্বরিক, এই নিয়ে বিরোধ। এ বিরোধ আসলে কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ হল দুই ধরনের জীবনদৃষ্টির মৌল বিরোধ। এই বিরোধ—এবং এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিরোধ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিরোধ, স্বদেশ ও স্বকালের বিরোধে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে পক্ষে যেতেন—যেতেন কেন, গিয়েছিলেন—তা অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' বইতে "মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ", "আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

এখানে আমরা একবার রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখেও এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যটি শুনে নিতে পারি। ১৯৩২ সালের ৫ই ডিসেম্বর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে (চিঠিপত্র-৯) কথাটি রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন।

আমাদের মন আমাদের স্বদেশের, কিন্তু আমাদের কাল স্বদেশের নয়। দুইয়ের মিল করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হবে। কালকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা কালোহি বলবত্তরঃ—তোমার চেয়ে তার জোর বেশি—তার সঙ্গে রফা করতেই হবে।

যেখানে স্বদেশে আর স্বকালের মিল সম্ভব সেখানে নিঃসন্দেহে মিলই বাঞ্ছনীয়। শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অবশ্য করণীয়। কিন্তু সব সময় মিল সম্ভব নয়। আগের দিনে এক এক দেশের এক এক কাল হওয়া সম্ভব ছিল। আজ আর কোথাও এমন পাঁচিল ঘেরা কাল নেই যা কেবল সেই দেশেরই কাল। আজকের দিনে যুগ অবিভাজ্য, তা কোনো দেশবিশেষের নয়। সেই কারণেই প্রশ্ন—যেখানে কালের সঙ্গে দেশের মিল হবে না? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলছেন, কালোহি বলবত্তরঃ। রফা করতে হবে কালের সঙ্গেই। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, সত্যের জোর নিয়েই কাল সমাগত হয়েছে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

শুধু চিন্তায় নয়, রবীন্দ্রনাথের আচরণে ও জীবনচর্চাতেও আমরা একটি রেনেসাঁসী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখতে পাব। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী আগ্রহ, বহুস্তরান্বিত বিকাশ, বিচিত্র কর্মকাণ্ড, এ সমস্তকে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সুষম সমগ্রতায় ধারণ করেছেন, যার সামান্যই আপনা থেকে হয়ে থাকা, সামান্যই স্বয়ংসিদ্ধ, যার বেশিটাই রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জিত, রবীন্দ্রনাথের স্বনির্মিত। অন্নদাশঙ্কর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সচেতন আত্মজীবন নির্মাণের উপর। বর্তমান প্রবন্ধে আমারও অতঃপর এই দিকটির উপরেই জোর দেব।

দুই

> 'প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিস্মৃত হয়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে জিজ্ঞাসা—"কেমন ভাবে বাঁচব?"—সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে' চিরস্মরণীয় হবে।'[১]

একথা বলেছেন অন্নদাশঙ্কর তাঁর "জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের একেবারে গোড়াতে। কথাটি অন্নদাশঙ্করের রবীন্দ্র-ভাবনার একটি চাবির মতো।

রবীন্দ্রনাথ যে নিজের জীবনকে একটি নিটোল সৌষম্যে বেঁধে নিতে পেরেছিলেন, 'যে সৌষম্য আমরা দেখতে পাই শিল্পে, এইটে অন্নদাশঙ্করের কাছে খুব বড়ো একটা কথা। রবীন্দ্রনাথের ছবি নয়, কবিতা নয়, গান নয়, কথা-সাহিত্য নয়, কোনোটাই এর থেকে বড়ো কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে নিজের জীবনকে সুবিহিত মাত্রায় সুন্দর করে,' 'উজ্জ্বল করে' গড়ে তুলতে পেরেছিলেন 'শিল্পীর মতো করে', এইটেই অন্নদাশঙ্করের মতে রবীন্দ্রনাথের মহত্তম কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান অথবা কথাসাহিত্যকে অন্নদাশঙ্কর ছোট করছেন না। এর প্রত্যেকটিই স্মরণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সার্থক

আত্মজীবন রচনা অন্নদাশঙ্করের কাছে আরো বড়ো ঘটনা। নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথ মহৎ শিল্পকীর্তির চিরকালীন উজ্জ্বলতাকে ধারণ করেছিলেন, এবং তারই মধ্যে কেমন করে বাঁচতে হয় তাঁরও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

অন্নদাশঙ্করের এই বক্তব্য যে সকলেরই বক্তব্য হবে এমন না-ও হতে পারে। এ কথাগুলি আসলে অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ। সব মানুষের সব রকম জিজ্ঞাসা সমান প্রখর নয়। অন্নদাশঙ্করের নিজেরই একটি আন্তরিকতম জিজ্ঞাসা। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পিত, সুডৌল, মহার্ঘ জীবনে, সুন্দর কিন্তু সুকঠিন জীবনে নিজের এই আন্তরিক জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে গিয়েছেন। এটা তাঁর কাছে খুব বড়ো প্রাপ্তি।

অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন জীবনশিল্পী। এই 'জীবন-শিল্পী' কথাটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। জীবনকে আর শিল্পকে তো আমরা আলাদা বলেই জানি। সাধারণত জীবনকে আমরা শিল্প বলি না, শিল্পকেও আমরা জীবন বলি না। সাধারণত বলি না বটে, কিন্তু কখনো কখনো বিশেষ ক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে বলতেও পারি। কোনো একটি শিল্পবস্তু যখন সার্থক এবং প্রাণস্পন্দিত, তখন তাকে আমরা বলি জীবন্ত। বলতে চাই যে যান্ত্রিক নির্মাণ নয়, জীবনধর্মী সৃজন। উল্টো দিকে ঠিক তেমনিভাবে, জীবন যখন সার্থক হয়ে ওঠে, জীবন যখন পূর্ণাঙ্গ, সুগঠিত এবং উজ্জ্বল, তখন তাকে আমরা শিল্প বলতে পারি। শিল্প যেমন প্রকৃতিকৃত নয়, মানবকৃত—মানুষের স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ, তেমনি কেউ যদি নিজের জীবনকে স্বাধীন ও সৃজনশীলভাবে নিজে রচনা করতে পারেন তাহলে বলতে পারি যে তাঁর জীবন খানিকটা শিল্পত্ব অর্জন করেছে, তিনি জীবনশিল্পী।

নিজের জীবনকে নিজে রচনা করা—এই কথাটাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। পশুর জীবন হয়তো সবটাই প্রকৃতির হাতে গড়া, কিন্তু কোনো মানুষের জীবনই কি পুরোপুরি প্রকৃতিকৃত? মানুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে এক হয়ে থাকা প্রাণী নয়, মানুষ যখন ষোল আনা প্রাকৃতিক জীবন নয়, তখন সব মানুষকেই ভালো মন্দ যেমন করেই হোক নিজের জীবনকে অল্পবিস্তর নিজেরই তৈরি করে নিতে হয়। সুতরাং সব মানুষই অল্পবিস্তর আত্মজীবননির্মাতা এবং সেই অর্থে অল্পবিস্তর জীবনশিল্পী। তাহলে জীবন-শিল্পী কথাটার মূল্য রইল কোথায়? মূল্য এইখানে যে সব নির্মাণ শিল্প নয়। যান্ত্রিক গতানুগতিক পরবশ জীবন শিল্প নয়। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, তাৎপর্যহারা জীবন শিল্প নয়। জীবনশিল্পী বলি যে সব ব্যতিক্রমী মানুষকে যাঁরা নিজেদের জীবনকে রূপ দেন, তাৎপর্য দেন, দীপ্তি দেন, যাঁরা দুঃসাধ্য সাধনায় নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ে তোলেন আঘাতে আঘাতে, বেদনায় বেদনায়। গড়ে তোলেন নানা বিচিত্র সুরের বিপুল ঐকতানে, বহুতলসমন্বিত কিন্তু ঘন-সন্নিবদ্ধ সৌষম্যে।

রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যতিক্রম স্থানীয়দের একজন।

সব শিল্পীই জীবনশিল্পী নন। জীবনকে সার্থকভাবে গড়ে তোলার ক্ষমতা ভিন্ন জাতের ক্ষমতা। শিল্পী না হয়েও—অর্থাৎ কবি চিত্রকর ভাস্কর নাট্যকার এসব কিছু না হয়েও

কেউ বেশ সার্থকভাবে আত্মজীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছেন, নিজের মতো করে' রূপ দিতে পেরেছেন আবার শিল্পী হয়েও অনেকেই জীবনে অকৃতী, সার্থক সুষম উজ্জ্বল জীবন-সংরচনে ব্যর্থ হয়েছেন।

শিল্প ইতিহাসের দিকে তাকালে এ ব্যাপারে শিল্পীদের ব্যর্থতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর মধ্যে বড়ো শিল্পী ছোটশিল্পীর ভেদ নেই। গ্যেটেকে জীবনশিল্পী বলতে পারি, হয়ত টলস্টয়কেও বলতে পারি, কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কি-কে তা বলা যাবে না, কাফ্কা-কেও নয়। ভ্যানগগের পক্ষে কোনোক্রমেই জীবনশিল্পী হওয়া সম্ভব ছিল কি? জীবনশিল্পী বললে যে প্রশান্ত সৌম্য সুন্দর জীবনযাপনের, পরিপূর্ণ সার্থকতার ছবি মনে জাগে, সেই ছবির সঙ্গে মধুসূদন, নজরুল, মানিক, এঁদের কার জীবনকে মিলিয়ে নেওয়া যাবে? অনেক সময় বরং মনে হয়, কোনো কোনো শিল্পী যেন ইচ্ছে করেই, নিজের জীবনকে দুমড়ে মুচড়ে দেন, সুমিত সুজীবনের মুখে তুড়ি মেরেই যেন দুর্জীবন বেছে নেন। ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁ কিংবা জাঁ জেনে কে কী বলব? দুর্জীবনশিল্পী বললেও বলতে পারি। কারো কারো ক্ষেত্রে মনে হয় যেন সুমিত স্বাভাবিকতায় স্থিত থাকলে, ব্যাধিগ্রস্ত অথবা বিকৃত না হলে তাঁরা হয়তো শিল্পীই হতেন না। কারো কারো ক্ষেত্রে মনে হয় ভিতরের যন্ত্রণাই তাঁদের শিল্পী করে তুলেছে। এমনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হয়, যেন শিল্পই তাঁদের যন্ত্রণা।

প্রাচীনকালে এদেশে মহৎ শিল্পীকে বলা হত কবিমনীষী, বলা হত ঋষি। যেন ঋষিত্বে অধিষ্ঠিত থাকা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, তাঁর শিল্পীধর্মেরই অঙ্গ। শুধু এদেশে নয়, খানিকটা সব দেশেই। সে বোধকরি অনেকখানি এই কারণে যে শিল্পীরা তথাকথিত দৈবী-প্রতিভার— দিব্য জাদুশক্তির অধিকারী। কালক্রমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, রচনার ক্ষেত্রের সেই জাদুশক্তি শিল্পীদের জীবনের কাজে লাগে না।

অনেক দিন থেকেই পশ্চিমে বলা শুরু হয়েছে যে শিল্পীরা অভিশপ্ত। অভিশপ্ত শুধু যে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর বলেই, অথবা একলা-পথের পথিক বলেই তা নয়। অভিশপ্ত এই কারণে যে শিল্প নিজেই একটা ব্যাধির মতো শিল্পকে কুরে কুরে খায়, একটা ক্রুদ্ধ দানোর মতো শিল্পীর উপরে ভব করে, আগুনের মতো শিল্পীর জীবনকে ইন্ধন করে' জ্বলে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা জানতেন। "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় একটু ঝাঁজ কমিয়ে প্রায় এই কথাই তিনি বলেছেন ঃ 'অগ্নিসম দেবতার দান ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।'

মনে হয়, জীবনশিল্পী হওয়া বিশেষ করে শিল্পীদের পক্ষেই কঠিনতর। তবু কোনো কোনো শিল্পী নিঃসংশয়ে জীবনশিল্পী। তাঁদের কৃতিত্বের সীমা নেই। কেননা সমস্ত দহনজ্বালাকে তাঁরা পরিপাক করে নেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন।

তিন

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শকে বুঝে দেখতে হলে একদিকে যেমন আমাদের তাকাতে হবে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাপনের দিকে— জীবনরচনার দিকে, অন্যদিকে তেমনি

তাকাতে হবে রবীন্দ্রনাথের মত ও বিশ্বাসের জগতের দিকে, তাঁর জীবন-ভাবনার দিকে, তাঁর জীবনবোধ সঞ্জাত দর্শনের দিকে। তক্‌মা আঁটা কেতাবী দর্শনের কথা বলছি না, এ হল জীবনবোধেরই সজীব এবং সক্রিয় সারাৎসার। রবীন্দ্রনাথের গভীর বিশ্বাসগুলি নানান ভাঙা-গড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একে অপরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যে একটি জীবন্ত সংসার গড়ে নিয়েছে, এ হল তারই ঘনীভূত রূপ, অথবা বলতে পারি তারই ভাব-শক্তি।

মানুষের এই শক্তিই—যদি পূর্ণ বিকশিত হয়, তাহলে তা মানুষের জীবনে হালের কাজ করে, পথের আলোর কাজ করে। সচেতন মানুষের এই শক্তিই তার সমস্ত সজ্ঞান মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, সংকল্প ও কর্মকে পরিচালিত করে। রবীন্দ্রনাথ কোন্ কবিতায় কী অনুভবকে, কী বেদনাকে রূপ দেবেন, কোন্ গানের পর কোন্ গান গাইবেন, কোন্ স্বপ্নের পর কোন্ স্বপ্ন দেখবেন, তাকে হয়তো এই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না। কিংবা তলিয়ে দেখলে, পরোক্ষভাবে তা-ও হয়তো খানিকটা করে। সে যা-ই হোক এর প্রত্যক্ষ প্রভাবের এলাকাও সুবিস্তৃত। কীভাবে তিনি নিজের জীবন গড়ে তুলবেন, কেন তিনি তাঁর পূর্ববঙ্গবাসকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, কেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে অমন সংযোগ এবং অমন বিচ্ছেদ ঘটেছিল, অথবা কেন তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলেন, শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞে নামলেন, এর প্রত্যেকটির উপরেই তাঁর জীবনদর্শনের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রত্যক্ষ।

সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের মত ও বিশ্বাস একদিনে দানা বেঁধে ওঠে নি। ভিতরের এবং বাইরের অনেক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াব মধ্যে দিয়ে, অনেক গ্রহণ বর্জনের পালা অতিক্রম করে, ডাইনে বাঁয়ে অনেক বাঁক নিয়ে পথে পথে পূর্ণতা পেতে পেতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন তৈরি হয়ে উঠেছে। এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমাগত জীর্ণ পুরাতনকে ভাসিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনরচনার কাজও এগিয়ে চলেছে।

একদিনের পুরনো কলকাতার গৃহবন্দী বালক কেমন করে বিশ্বপথিক ও বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠল সে ইতিহাসের সবটাই আপতিক নয়, এ পথ রবীন্দ্রনাথের নিজের বেছে নেওয়াই শুধু নয়, নিজের তৈরি করা। একদিনের অসংশোধনীয় রকমের স্কুল-পলাতক যে কালক্রমে অক্লান্ত এবং অদম্য শিক্ষাব্রতী হয়ে উঠল, এমনই যে উত্তরকালে বলতে পারল ঃ "আমার জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য হল—শিক্ষার আলোক বিস্তার"' এ কি হঠাৎ হল? ঠিক তেমনি, একদিনের আকণ্ঠ রোমান্টিক এবং স্বপ্নাতুর কবিকিশোর বৈষয়িক কাজের সূত্রে পল্লীবাংলার সান্নিধ্যে এসে একই সঙ্গে মানুষের পরিচয় এবং স্বদেশের পরিচয় লাভ করল, আবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর আত্মপরিচয়ের ভূমিকাও রচনা করে ফেলল, এমন যে পরিণত বয়সে তার মুখে সুস্পষ্ট উচ্চারণ শুনতে পেলাম ঃ "শিক্ষাসংস্কার আর পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ"' এ-ও কোনো হঠাৎ ঘটে-যাওয়া ব্যাপার নয়, এ-ও রবীন্দ্রনাথের আত্মসৃজনের ইতিহাসের একটি কেন্দ্রীয় পর্যায়। মধ্যজীবন অবধারিত দ্বৈততায় অপরিহার্য্য আত্মাভিমানে কেমন ক'রে যে অতীত

ভারতের কল্পমূর্তির কুহকের ঘোরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি সুকঠিন দক্ষিণাবর্তের টান এসেছিল এবং কেমন ক'রে যে এই টানকে তিনি পার হ'য়েও গিয়েছিলেন, সেই অডেসি-র কাহিনী 'গোরা'র পাঠকদের কারোর অজানা নেই। এর পরেও যে পথ সরল নয়, এর পরেও যে 'গীতাঞ্জলি'র মতো একটি ভক্তিসজল আত্মনিবেদনের পালাকে পার হয়ে আসতে হয়, নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়তে হয়, তা-ও আমরা জানি। আমরা বুঝতে পারি যে, এইভাবে বারবার তীরের সঞ্চয়কে তীরে ফেলে রেখেই একদিন রবীন্দ্রনাথ বলাকার নবযৌবনের পৌরোহিত্যে নিজেকে ব্রতী করতে পেরেছিলেন, বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকায় মানব সভ্যতার অগ্রগামী পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজেকে এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন। বুঝতে পারি, এইভাবেই, তাঁর দুরূহ আত্মসৃজনের পথেই এসেছে বিশ্বভারতী, এসেছে ন্যাশনালিজ্‌ম্-বিরোধী অভিযান, এসেছে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতান্তর, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীনিকেতন, শুরু হয়েছে আবার পল্লীসঞ্জীবনের কর্মযজ্ঞ। এই আত্মসৃজনের পালা হিসেবেই এসেছে বারবার বিশ্ব-পরিক্রমা, এসেছে ছবি আঁকার জোয়ার, এসেছে যৌবনে এবং মধ্যবয়সে ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং পরিণত বয়সে আধুনিকতার সঙ্গে কঠিন বোঝাপড়ার পালা।

চার

রবীন্দ্রচর্চার প্রথম দিকটাতে এসেছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে এবং সেইসব কবিতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিয়ে—যেমন সীমা অসীমের তত্ত্ব, জীবনদেবতা, প্যান্‌সাইকিজ্‌ম গতি-স্থিতির তত্ত্ব—এই সব নিয়ে আলোচনা। পরে গান নাটক কথাসাহিত্য ইত্যাদি, অনেক পরে ছবি—আলোচনা এই রকম পথেই এগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মননের দিক, রবীন্দ্রনাথের কর্মসাধনার দিক, অনেক দিনই উপেক্ষিত ছিল। আগেই বলেছি, অন্নদাশঙ্করের প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের মনন, রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা—এবং সমগ্র রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর আলোচনায় সব থেকে বেশি জোর পড়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের উপর।

জীবনদর্শন কেতাবী ব্যাপার নয় বলেই তাকে সু-উচ্চরিত সীমারেখা দিয়ে দেগে দেওয়া মুশকিল, তার গায়ে চলতি নামের লেবেল আটকে দেওয়া কঠিন। তা বলে তার কোনো রকম পরিচয়ই যে সম্ভব নয়, এমনও নয়। একটু সরলীকৃত হতে পারে, কিন্তু কিছু পরিচয় তাকে অবশ্যই দেওয়া যায়, বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তার কাজচলা গোছের নামকরণও সম্ভব। কেবল এইটেই মনে রাখতে হবে যে, নামকরণের কঠিন কাঠামোর মধ্যে তার সবটা ধরে না, কার্যক্ষেত্রে কিছুটা যোগ-বিয়োগ থাকবেই।

সেই শক্তিশালী প্রত্যয়গুলি কী, অথবা কী কী? কোন্ কোন্ মতাদর্শ রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে, তাঁর জীবন-ইতিহাসকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে? তারা কোন্ অথবা কোন্ কোন্ উৎস থেকে এসেছে? সে কি বৈদিক মন্ত্র থেকে, বৈদিক ধ্যান-ধারণা থেকে এসেছে? অথবা সে কি উপনিষদের বাণী থেকে

এসেছে? অথবা বুদ্ধদেবের জীবনভাবনা থেকে? অথবা কি বৈষ্ণবতা থেকে, কালিদাসীয় শিবভাবনা বা শৈব আদর্শ থেকে? অথবা কি মধ্যযুগের সন্তানের কাছ থেকে? কিংবা আরো পথের আউল বাউল প্রমুখ ক্ষ্যাপা সাধকদের কাছ থেকে?

এর কোনোটিকেই বাতিল করা যাবে না। এর প্রত্যেকটির থেকে রবীন্দ্রনাথ যা নেবার নিয়েছেন, যা না নেবার নিঃশব্দে বাদ দিয়েছেন। সংগ্রহ যেখানে থেকেই হোক, যে উপাদান আসুক তা যখন রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে স্থান পেয়েছে ততক্ষণে রবীন্দ্রনাথের প্রবল স্বকীয়তা কেমিষ্ট্রিতে তার এমন গুণগত বদল ঘটে গিয়েছে যে মূল উৎসের সঙ্গে তার সংযোগ প্রায় ফিকে হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সব প্রাচীন উপাদানের নবীনায়ন এবং রবীন্দ্রায়ন ঘটে গিয়েছে।

রবীন্দ্রমানসের শক্তিশালী সক্রিয় ভাবনাগুলির দিকে তাকিয়ে, রবীন্দ্রমানসের ঘনিষ্ঠভাবে, সংবদ্ধ, কেন্দ্রীয় প্রত্যয়গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে অন্নদাশঙ্কর যে চেহারা দেখেছেন, ইংরেজি ভাষায় তার সরল পরিচয় হল হিউম্যানিজম্। বাংলা করে অন্নদাশঙ্কর তাকে বলেছেন মানবিকবাদ। সচরাচর বলা হয়ে থাকে মানবতাবাদ বা মানবতন্ত্র। হিউম্যানিজম্ বললে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের পূর্ণাঙ্গ বা সমগ্র পরিচয় হয় না, আংশিক পরিচয় হয়। কিন্তু সেই অংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় সত্য অনেকখানি প্রতিফলিত।

আমাদের ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ইহজগৎমুখিতা এবং একটা ঘোষিত মানবিকতা দেখতে পাওয়া যাবে। তা-ও আমাদের পুরনো ঐতিহ্য থেকে পাওয়া নয়। তার কিছুটা এসেছে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আদর্শ থেকে, আর কিছুটা এসেছে তৎকালীন জীবনের নিজস্ব উৎকণ্ঠা থেকে, সেদিনের বিশেষ আধুনিকতার হাত ধরে।

রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী ভাবনার উৎস ঠিক কোথায়, তার কোন্ উপাদান কোন্ ভাণ্ডার থেকে আহরিত হয়েছে, সে অনুসন্ধানে এখানে আমাদের বেশি প্রয়োজন নেই। এইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথের বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের পরিবার-পরিবেশ এই ভাবনার অনুকূল এবং আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ভাবপরিমণ্ডলও তখন এই ভাবনায় অল্পবিস্তর উদ্দীপিত।

রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ গ্রহিষ্ণুতা, দৃঢ়, সদর্থক, মনোভাব, জীবনের প্রতি ভালোবাসা, রবীন্দ্রনাথের গভীর মর্ত্যপ্রীতি, এর সবেরই উৎস হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে, কিন্তু এর প্রত্যেকটির সঙ্গেই পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী মনোভাবের সুগভীর আত্মীয়তা আছে। আমাদের ঊনবিংশ শতকের জাগরণে যে দ্বৈততার টান আছে—প্রাচ্যতাভিমানী টান আর আধুনিকতা-অভিমুখী টান—এই দ্বৈততার টান পাশ্চাত্য রেনেসাঁসে নেই ; কিন্তু এই যে আধুনিকতা অভিমুখী ধ্যান-ধারণা, তার অনেকটাই এসেছে সরাসরি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সংস্কৃতি থেকে।

মানবজীবন মূল্যবান, মানুষ বলেই মূল্যবান—এই প্রত্যয় এবং মানুষের মধ্যে যে

জাতিধর্মবর্ণের ভেদ, দেশের বা সংস্কৃতির ভেদ নিত্য নয়, মানুষমাত্রেই যে মানুষের আত্মীয়, মানবসভ্যতা যে আসলে এক এবং অভিন্ন—এই প্রত্যয়, এর সত্যতা রবীন্দ্রনাথের কাছে তর্কাতীত। শুধু তর্কাতীত নয়, এই বিশ্বাস বা বোধের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উদ্দীপিত, তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ড অনেকখানি পরিমাণে সঞ্চালিত হয়েছে এরই প্রেরণায়। এই উদ্দীপনা ও সক্রিয়তার কারণেই আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের একজন অগ্রণী মানবতন্ত্রী বলে গণ্য করি। এর মধ্যে কোনো প্রাচ্যতার উপাদান আছে বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কাছে অগ্রাধিকার শিক্ষারই। আমাদের গোড়াঘেঁষা সব সমস্যার চাবি আছে শিক্ষাতে। শিক্ষায় উচ্চ-নিচ কোনো ভেদ নেই, শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার। শিক্ষার উপর নির্ভর করে মানুষের মনের মুক্তি, অনেকখানি পরিমাণে বস্তুগত বা ব্যবহারিক মুক্তিও। শিক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত মানুষের বুদ্ধির উপর আস্থা, যুক্তি উপর আস্থা, মানুষের মস্তিষ্কশক্তির উপর আস্থা—এবং সেই সূত্রেই আসে অলৌকিক ব্যাখ্যায় অনাস্থা, আসে জিজ্ঞাসার উপর আস্থা, অনুসন্ধানের উপর আস্থা—বিজ্ঞানে বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্বীকার না করেও অনমনীয়ভাবে ব্যক্তিবাদী। সবই ব্যক্তির জন্য, ব্যক্তি অপর কোনো কিছুর জন্যই নয়, কোনো অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব বা এ্যাবস্ট্রাক্‌শনের দ্বারাই ব্যক্তিকে আবৃত করা চলবে না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতায় সকলের সমান অধিকার, সেখানে দেশভেদ নেই, জাতিবর্ণলিঙ্গভেদ নেই। সৃজনশীলতার আনন্দ রবীন্দ্রনাথের কাছে মহত্তম মূল্য। স্বাধীনতা সৃজনশীলতার অপরিহার্য শর্ত।

রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমুখী মনের কথা আমরা সকলেই জানি। শুধু ব্যক্তিগত প্রবণতায় নয়, তত্ত্বগতভাবেও তিনি যুক্তিবাদী। এমন ক্ষেত্র মানুষের জীবনে থাকতে পারে—যেমন অনুভবের এলাকা—যেখানে যুক্তির অধিকার সীমিত, কিন্তু জ্ঞানের বিশাল ভূমিতে, জীবন-পরিচালনার বিরাট এলাকায়, সমস্ত ব্যবহারিক প্রদেশে—সর্বত্রই যুক্তির অবাধ কর্তৃত্ব। সেখানে অযুক্তি অর্থই অবুদ্ধি এবং রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, ... আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে।[৪]

কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণাকে প্রাচীন ভারতের তত্ত্ববিশেষের সঙ্গে বা মধ্যযুগীয় মানবতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনায় একটা মৌল ভারতীয়ত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা মোটেই আমাদের প্রচলিত এবং সুলভ ভারতীয়ত্ব নয়। এই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠি (১৩৪০, ১২ আশ্বিন, ১৯৩৩) থেকে একটু উদ্ধৃত করছি। 'গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড়-বের করা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ—আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ—সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্য দ্বারাই চিরশুচি.—সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।'[৫]

এমন হতেই পারে যে, রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী চিন্তাভাবনার মধ্যে আমাদের অবধারিত দোটানার কিছু ছাপ পড়েছে, তার মধ্যে কিছু প্রাচ্যতার ঝোঁক স্থান করে নিয়েছে। যদি হয়ে থাকে, তা বহিরঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী ভাবনার যে তিনটি মুখ্য প্রত্যয়—ব্যক্তি, মুক্তি ও যুক্তি। মানবেন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী দর্শনেও এই তিনটিই মুখ্য প্রত্যয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার এবং যুক্তিবাদ—এর কোনোটির এক কণাও ঔপনিষদিক চিন্তায় বা সন্তদের অনুভবে বা বাউলিয়াদের সাধনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ কথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ প্রথম দিকে উপনিষদের শ্লোকে বেশ খানিকটা মুখর এবং ঔপনিষদিক চিত্রকল্পে অনেকটাই বর্ণাঢ্য ছিল, এবং শেষের দিকে তারই সঙ্গে সে জগৎ বাউল সাধকদের ভাবের সৌরভে অনেকটা সুরভিত হয়ে উঠেছিল। তাহলেও মনে রাখতে হবে যে সেই উপনিষদ আপাদামস্তক রবীন্দ্রভাবে-ভাবিত উপনিষদ এবং শেষের দিকের সেই বাউল ভাবও রবীন্দ্রায়িত-উপনিষদের দ্বারা শোধিত পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক বাউল ভাব।

ছয়

মানবমূল্য, মানুষে মানুষে সাম্য, মৈত্রী, মানবসভ্যতার মূলগত ঐক্য, এই রকম কয়েকটি বহুজনস্বীকৃত প্রত্যয়কে ঘিরে, নানান পার্থক্যকে অবলম্বন করে নানান গোত্রের বা নানান ধারার মানবতাবাদ গড়ে উঠেছে। প্রথমেই দুটি ধারার কথা বলতে পারি : এক হল ঈশ্বরবিশ্বাসী ভাববাদী ধারা—আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যালঘু ধারা। আর দুই হল নিরীশ্বরবাদী বস্তুতান্ত্রিক অর্থাৎ প্রাকৃতকার্য কারণে আস্থাশীল ধারা—আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাগুরু ধারা। ঈশ্বরবিশ্বাসী হিউম্যানিস্ট বলেন, ঈশ্বরহীন বিশ্বে মূল্য অর্থহীন, মনুষ্যত্বও অর্থহীন, অতএব মানবতাবাদ অর্থহীন। নিরীশ্বরবাদী হিউম্যানিস্ট মনে করেন, ঈশ্বরচালিত বিশ্বে মানুষও ঈশ্বরচালিত, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা অর্থহীন, অতএব মানবতাবাদও অর্থহীন।

ঈশ্বর প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে, ছোটবড়ো আরো অনেক গোত্রের মানবতন্ত্রের কথা বলা যেতে পারে। যেমন মার্কসবাদী মানবতন্ত্র। মার্কসবাদী মনে করেন, মার্কসবাদই যথার্থ মানবতন্ত্র। শোষণ-ভিত্তিক সমাজে মানুষে মানুষে সাম্য অথবা সর্বমানবের স্বাধীনতা অবাস্তব কল্পনা। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই মানবতার জন্য সংগ্রাম, মানবতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। যিনি এই সংগ্রামের শরিক, তিনিই যথার্থ মানবতাবাদী। তা যিনি নন তিনি মুখে যা-ই বলুন, প্রকৃতপক্ষে তিনি মানবতন্ত্রী নন।

বিরুদ্ধবাদী বলবেন একেবারে বিপরীত কথা, "মানুষকে যিনি উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করেন, তিনি আদৌ মানবতন্ত্রী নন, কেননা মানবতন্ত্রী হতে হলে মানুষের স্বাধীনতাকে মানতে হবে। মানুষের স্বভাবকে যদি তার বিশেষ কালে বিশেষ সমাজের অর্থনৈতিক বলক্রিয়ার সৃষ্টি বলে মনে করি, ব্যক্তিকে যদি তার শ্রেণী স্বভাবের

অবধারিত প্রকাশ বলে মনে করি, একান্তভাবে ইতিহাসের অধীন বলে মনে করি, যেমন মার্কসবাদীরা মনে করে থাকেন, তাহলে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা থাকে না। মানুষকে যদি অর্থনীতির পুতুল বা ইতিহাসের পুতুল বলে জানি, তাহলে কার জন্য কী নিয়ে মানবতন্ত্র? মার্কস তাঁর মানবতন্ত্র ব্যাখ্যায় যাই বলে থাকুক না কেন, মার্কসবাদ কার্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। সুতরাং কার্যত মার্কসবাদ মানবতন্ত্রের বিরোধী।"[৯]

আলোচনার সূত্রে অস্তিত্ববাদী হিউম্যানিস্টদের কথাও এসে পড়তে পারে। সব অস্তিত্ববাদী অবশ্য নন, অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে যাঁরা স্পষ্টতই নিরীশ্বরবাদী, তাঁদের কেউ কেউ, যেমন সার্ত্র। এঁরা নিজেদের গোত্রের অস্তিত্ববাদকে যথার্থ মানবতন্ত্র বলে মনে করেন। এঁরা মনে করেন, মানুষের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত স্ব-ধর্ম নেই। নেই বলেই মানুষ তার সত্তার সূত্রে অনিবার্যভাবে স্বাধীন, যেন স্বাধীনতার তার অপ্রতিরোধ্য নিয়তি। তার মানবত্ব তার নিজেরই নির্মাণ। এই নির্মাণেই তার সার্থকতা, তার বাঁচার অর্থ। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত অনির্ধারিত সত্তাই—মানুষের অমোঘ স্বাধীনতাই তাকে এই কঠিন আত্মনির্মাণের পথে টেনে নেয়। এই দায় বহনই মানুষের মহত্ত্ব। মানুষের যদি কোনো পূর্বনির্দিষ্ট স্থির স্ব-ধর্ম থাকত, তাহলে মানুষ তার সেই পূর্বনির্ধারিত পথেই চালিত হত, নিজের স্ব-ধর্মের বাঁধা প্যাটার্নেরই অধীন হত, যেমন মৌমাছি তার ইনস্টিংক্টের বাঁধা প্যাটার্নের অধীন। তিনিই যথার্থ মানবতন্ত্রী, যিনি মানুষের দুর্বহ স্বাধীনতাকে মূল্য দিতে পারেন।

বিভিন্ন গোত্রের হিউম্যানিস্টদের এই অবৈধ রকমের অতি-সরলীকৃত পরিচয়ে অবশ্যই আপত্তি করার অনেক অবকাশ আছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোত্রের বিস্তৃত পরিচয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই, তাতে প্রসঙ্গচ্যুতিরও সম্ভাবনা আছে। কেননা আপাতত আমাদের লক্ষ্য সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং বিশেষভাবে অন্নদাশঙ্করের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে যে গোত্রের মানবতাবাদের কথা সহজেই আসতে পারে সে হল উনিশ শতকের উদারনৈতিক মানবতাবাদ—লিবারাল হিউম্যানিজম্। জিনিসটি আমাদের সুপরিচিত যদিও এর সীমারেখা মোটেই সু-উচ্চারিত নয়। এর মুখ্য প্রেরণা বোধ করি নৈতিক সুবিচারের বা সামাজিক সুবিচারের প্রেরণা। মতবাদ হিসেবে এর গাঁথুনিটা একটু আলগা, তার কারণ এর পায়ের নিচের মানবতত্ত্বের ভিত্তিভূমিটা দৃঢ় নয়। এর যে পরিমাণে সদিচ্ছা আছে, সেই পরিমাণে সঙ্গতিও নেই, সংহতিও নেই। ফলে শক্তিও নেই। কার্যক্ষেত্রে, বাস্তব বাধার মুখোমুখি হয়ে এই উদারনৈতিকতা শেষ পর্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। সেই কারণে কেউ কেউ ঠাট্টা করে একে বলেছেন নিরামিষ মানবতাবাদ, নিষ্ফলা মানবতাবাদ।

অনেক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে এই উনিশ শতকীয় লিবারাল হিউম্যানিজমের সগোত্র বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের আগের দিকের

মতবাদে স্নিগ্ধতা ও সদিচ্ছা যেরকম প্রবল, মানবতত্ত্ব সে রকম দৃঢ় ছিল না, সুতরাং সেই শালীন সুন্দর মতবাদকে অনায়াসে নিরামিষ গোত্রের বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কবির স্বপ্ন বলেও ধরে নেওয়া যায়।

শেষের দিকে একই সঙ্গে দুটো বড়ো বদল ঘটেছে। এক রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব আগের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন এবং দৃঢ় রূপ পেয়েছে। দুই, বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনাবর্তের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নেমে অনেক দিকে তাঁর মোহভঙ্গও অনেকখানি ঘটেছে। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে আর খুব কোমল অথবা মিহি ব্যাপার বলা চলবে না। কেননা স্পষ্টই দেখতে পাই, দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে তাদের তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। এ মনোভাবটা তাঁর খুব পেলবও নয়, নিরামিষও নয়।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। 'জীবনশিল্পী', পৃঃ ১।
২। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৮।
৩। অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি, ১৫ নভেম্বর ১৯৩৪, 'চিঠিপত্র' ১১, পৃঃ ১২২।
৪। 'সমস্যা' 'কালান্তর', ১৩।৩১৯।
৫। 'চিঠিপত্র' ৯, পৃঃ ২০৫।
৬। মানবেন্দ্রনাথ রায় ঃ Reason, Romanticism and Revolution (Vol-II) পৃঃ ৮৭।

সৌজন্যে : 'মান্দাস'

শান্তিনিকেতন ও সবরমতীর মর্মার্থ গ্রহণ করেছিলেন তিনি

হোসেনুর রহমান

কোনও কোনও মানুষ এমন মহাজীবনে পরিণত হন, এমন কাব্য কাহিনীতে পরিণত হন, নিজের জীবনেই এমন এক প্রতীকে পরিণত হন যে তাঁকে কাছেই পেতে ইচ্ছে করে। আপনার জন বলে নিজেকে ধনী মনে হয়। তিনি কোনও এক দিন হঠাৎই অন্তর্হিত হবেন, মঞ্চশূন্য হয়ে যাবেন, কল্পনা করাই যায় না। তবু তা তো সত্য হবেই একদিন। অননদাশঙ্কর আমাদের বিদায় বেলায় এই কথাটি বলে গেলেন। তবু বলব, তিনি আজীবন আমাদের সংস্কৃতি বোধের, শিক্ষার দেশ চেতনার, মানবতার ঐতিহ্য হয়ে থেকে গেলেন। তিনি যে আমাদের অভ্যেসের অন্তর্গত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ তিনি চলে গেলেন, তবু আমাদের মধ্যে এই বিশাল ভারতবর্ষের জনচিত্তে, তিনি থেকেই গেলেন, থেকেই যাবেন।

তাঁকে কত ভূমিকায় দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় অন্নদাশঙ্করের এই যে, তিনি বাণীর বরপুত্র। সাহিত্যগত প্রাণ তাঁর। এবং সার্থক, আধুনিক ভারতীয়। কবিতায়, উপন্যাসে, ছড়ায়, প্রবন্ধে প্রায় এক শতাব্দী অন্নদাশঙ্কর বাঙালিকে উচ্ছ্বসিত করে গেলেন। আই সি এস, ইংরেজি ভাষা, বিদেশ, এসব তাঁকে আদৌ আকর্ষণ করেনি, যত আকর্ষণ করেছে বাংলা ভাষা। বাঙালি জাতি, ভারতীয় সভ্যতা ও পূর্ব ও পশ্চিমের মহা সম্মেলন। এখানেই তিনি শান্তিনিকেতন ও সবরমতীর মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন মনে প্রাণে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী তাঁর জীবন দর্শনকে প্রভাবিত করেছেন যথাযথ। অন্নদাশঙ্কর বিচার বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে শান্তিনিকেতন ও সবরমতীকে জীবনে সাহিত্যে দর্শনে গ্রহণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর নিজের মধ্যে নিজে আত্মস্থ হয়েছে। আবার ভাবত সংস্কৃতির সন্তান অন্নদাশঙ্কর বিশ্ব সংস্কৃতির সার কথাটি বারবার আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। কোথাও কোনও সময় মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত তো দূরের কথা ; সামান্যতম বিরোধও ভয়ানক আপত্তিকর মনে করেছেন। দেশ ভাগ তাঁকে স্বভাবতই যন্ত্রণা দিয়েছে। যা ঘটে গিয়েছে তা তো ঘটেই গিয়েছে। তার পর মানুষে মানুষে সংস্কৃতিতে বিরোধ কেন? এখানেই অন্নদাশঙ্করের দান অপরিসীম। তাই তো তাঁর মহাপ্রয়াণ ভারত ও বাংলাদেশকে আঘাত করেছে সকল সীমা পেরিয়ে। ভাষা, সংস্কৃতি, সমদর্শিতা মানুষকে যত মেলায় ; তত ধর্ম, রাষ্ট্র, রাজনীতি মেলায় না। আজীবন এসব আপ্তবাক্য অন্নদাশঙ্কর উচ্চারণ করে গিয়েছেন। আমাদের বুঝিয়েছেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ, সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ হচ্ছে না আদৌ। বিরোধ প্রতিনিয়ত চলেছে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের, পলিসির সঙ্গে পলিসির। অন্নদাশঙ্করের ভাষায়, 'রেনেসাঁস' শুধু এই কথাই বলার অধিকার দাবি করেছে যে মানুষের জীবনধারা বহু বিচিত্র ও বড়

জটিল। বাবাজিরা তাকে যেমন দোরঙা ও সরল ঠাওরান তেমন সে নয়। রেনেসাঁস সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায়কে মধ্যযুগীয় বলে খারিজ করেন নি।

আধুনিক সভ্যতা যদি নীতির ও ধর্মের শাঁসকেও খোসার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয়, তা হলে তারও শাঁস বলতে বিশেষ কিছু থাকবে না। গণতন্ত্র বা শ্রেণী সাম্য অতি মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু এহো বাহ্য। আগে কহো আর। বিশ্বজনীন চিরন্তন স্থিতিকেন্দ্র আছে। গতিই সব নয়।" এই হলেন অন্নদাশঙ্কর।

রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রাণের মানুষ। এঁদের চর্চা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি অন্নদাশঙ্করেই এসে স্থিতিলাভ করেছেন। এই হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বলাই বাহুল্য, অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রোও যুগের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। আরও স্পষ্ট করে বলা সম্ভব, তিনি সমসাময়িক ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদদের অন্যতম, তিনি আন্তর্জাতিক ভাষ্যকার। ভারত-বাংলাদেশের অঘোষিত সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত। তাঁর একটি বাণী প্রায় প্রবাদে পরিণতি লাভ করেছে, বাংলাদেশকে আমি ভালোবাসি। তার ভালোমন্দ দুই-ই আমি ভালোবাসি। দুই বাংলার নদ নদী নর নারী সাহিত্য সঙ্গীত ইতিহাস ঐতিহ্য ধারাবাহিকতা কোনও কিছুকেই তিনি ভাগ করতে পারেন নি, চানও নি। বাংলাদেশের ভেদবুদ্ধি মুক্ত মানুষ অন্নদাশঙ্করকে তাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ও সাহিত্য সংস্কৃতির জাগ্রত বিগ্রহ বলে জ্ঞান করেছেন। হ্যাঁ, অন্নদাশঙ্কর আমাদের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিবেক বলেই আমরা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছি।

আজ পৃথিবীতে সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার যে সংঘর্ষ চলেছে, সে সমস্যা সম্পর্কেও অন্নদাশঙ্করের মতো আমরা সুনিশ্চিত করে বলতে পারি। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার সংঘর্ষ হচ্ছে না। কারণ, কোনও সভ্যতা একক সভ্যতা হিসেবে বেঁচে থাকতে পাবে না। একটি সভ্যতা আর একটি সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য। সংঘাত জীবনের ধর্ম হতে পারে না। সম্প্রসারণ মানুষের স্বভাব, সংকোচন নয়। তাঁর বিশ্বাস, সংঘাত হয় নেশনের সঙ্গে নেশনের। একটি রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে আর একটি রাষ্ট্রীয় নীতির। এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সার্থক উত্তরসুরি অন্নদাশঙ্কর যা বিশ্বাস করেন তা হল, ভবিষ্যতে 'উচ্চতর সভ্যতা' ভারতীয় হবে না, ইউরোপীয় হবে না, হবে মানবিক। অর্থাৎ বিশ্বজনীন সভ্যতা, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব চাই আমাদের। আর সংঘাত বর্জন করাই তো মানবিক, বিবেক সম্মত কাজ। যা কিছু মূলনীতি বিরুদ্ধ, যা অমানবিক, যা হৃদয়হীন ও অসার তাই অন্নদাশঙ্কর আজীবন পরিহার করেছেন। গ্রহণযোগ্যতাকেই মানুষের বিশেষ ক্ষমতা বলে বার বার স্বীকার করেছেন। প্রাচীনত্ব কিংবা পূত পবিত্র ধর্মশাস্ত্র তাঁর কাছে বড় হয়নি, বড় হয়েছে মানুষ। এই মানুষের জয়গান করে গেলেন অন্নদাশঙ্কর। তাঁর এই 'অভেদবুদ্ধি' প্রতিদিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষ বলতে রবীন্দ্রনাথের গোরার কথাই বলেছেন......"এর সূচনা খোঁজ করলে পাওয়া যাবে 'গোরা'তেই। তাতে যে ভারতবর্ষের

সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার জাত নেই, 'বিচার' নেই, ঘৃণা নেই। সে শুধু কল্যাণের প্রতিমা। সে ভেদবুদ্ধিকে প্রেম দিয়ে অতিক্রম করেছে। যেমন আনন্দময়ী রূপে তেমনি সুচরিতা রূপে।"

এই ভারতবর্ষ অন্নদাশঙ্করের ভারতবর্ষ। তিনি গভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করেছেন দীর্ঘজীবন ধরে, কিন্তু মানব সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ ও লালন ফকিরের পথ অনুসরণ করে। আশ্চর্য, আই সি এস, প্রখর ইংরেজি ভাষাজ্ঞান যাঁর, ইউরোপ যাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্গত তাঁকে পরিপূর্ণ সুটে-টাইয়ে সমৃদ্ধ দেখেছি, সম্পূর্ণ বাঙালি পোষাকে সমুজ্জ্বল দেখেছি কিন্তু সব সময়ই একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেছে, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় নিখুঁত, নিরুপম, অদ্বিতীয় বাঙালি। এবং আন্তর্জাতিক।

আমাদের বাঙালিয়ানায় যখন ভাটা পড়েছে, অকস্মাৎ আমাদের সম্প্রদায় চেতনায় যখন ভেদবুদ্ধি আবার বড় হয়ে উঠতে দেখা গেছে এখানে সেখানে, তখনই জরা, ব্যাধি, শারীরিক দুর্বলতাকে তুচ্ছ করে বাঙালি ভারতীয় কবি, কথাশিল্পী, আধুনিকতম প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর ভারতীয় সেকুলার গণতন্ত্রের বিবেক হয়ে উঠেছেন। একেবারে শেষের দিকে দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন প্রিয়তম সুরজিৎ দাশগুপ্তের সঙ্গে ঃ "Democracy এবং Individual Justice চাই, তার সঙ্গে social Justice ও চাই। Non-violent revolution নিয়ে ভাবতে ও কাজ করতে হবে। পুনর্ভাবনা থেকেই আসবে পুনর্নবীকরণ।

ধর্মের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে বিবাদ বন্ধ করতে হবে। যার যার ধর্ম তার তার ধর্ম। রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম থাকবে না। রাষ্ট্র হবে secular, কিন্তু secularism যথেষ্ট নয়। হিটলারের জার্মানিও secular ছিল, সে সঙ্গে ইহুদি বিদ্বেষী। একটা সম্প্রদায়কে ঘৃণা করলে, তাকে নিশ্চিহ্ন করার কি মুছে ফেলার কথা ভাবলে সে Secularism-এর কোনও মানে হয় না।

জার্মানিতে সেই আমলে ন্যায়ের জোর ছিল না, ছিল শুধু গায়ের জোর। গায়ের জোর সম্বন্ধে তাদের এত বিশ্বাস এসেছিল যে, পৃথিবী জয় করার জন্য তারা একটা মহাযুদ্ধ শুরু করেছিল। Violent Secularism কখনও আদর্শ হতে পারে না। ভালবাসা, অহিংসা, ন্যায় দিয়ে revolution ঘটাতে হবে। এটা এখন নেহাতই একটা experiment-এর পর্যায়ে রয়েছে। শেষ কথা বলার সময় আসে নি। তবে ভালবাসার জন্য মানুষ সব করতে পারে, সব করে। শেষ পর্যন্ত ভালবাসারই জয় হবে" (নবীনপত্র, মে-জুলাই ২০০২, পৃঃ ৩৫)।

অন্নদাশঙ্করের যুক্তি ও ভালোবাসা অনুসরণ করে বলতে পারি তিনি মানুষকে ভালবেসেই এমন মহৎ, মহাজীবন দীর্ঘজীবন প্রতিমুহূর্ত মানবতার জন্যে ব্যয় করে গেলেন। এবং কিছুতেই চলে যেতে পারছিলেন না যেন। কেন এই দ্বিধা? কারণ আমরা।

কারণ আমাদের সার্বিক অক্ষমতা, ব্যর্থতা, হানাহানি। ভারতবর্ষ নিয়ে জীবনের সূচনায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের গোটা বাস্তব সুন্দর রূপ দেখে যাবেন এই ছিল মানবতাবাদী অন্নদাশঙ্করের জীবনের অভিলাষ। ওই সঙ্গে 'মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে' তো বটেই।

শিল্পী অন্নদাশঙ্কর এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ সব কিছুই প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করেছেন এবং সব সময়ই একটি 'Cause'-এর জন্যে জীবন সাধনাকে প্রতিনিয়ত প্রখর করে তুলেছেন। মৃত্যু বারবার এসে এসে ফিরে গিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় অন্নদাশঙ্কর কী করে বাঁচতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের।

আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বেশি করে আমাদের সমগ্র জীবন জুড়ে আছেন। এবার আমরা অন্নদাশঙ্করের গোটা জীবনের সাধনাকে আমাদের সামাজিক-বৌদ্ধিক-আধ্যাত্মিক মূলধনে পরিণত করব। তাই হবে আমাদের নৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে আমরা সবাই তৎপর হব, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হব। তাহলেই তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

তাহলেই আমরা বলতে পারব মনীষী, মানবতাবাদী অন্নদাশঙ্কর রায়, আপনার পথ অনুসরণ করে আমরা বয়োপ্রাপ্ত হচ্ছি, আমরা দেশ-কাল সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন অনুশীলন করে আপনার স্বপ্নের ভারতবর্ষকে মহাভারতে পরিণত করব এই আমাদের 'আজকের প্রথম ও প্রধান প্রতিজ্ঞা।

সৌজন্যে ঃ 'সংবাদ প্রতিদিন'।

অন্নদাশঙ্কর ঃ ব্যক্তি ও ভাবনা

পবিত্র সরকার

অন্নদাশঙ্কর আর বেশিদিন আমাদের মধ্যে নেই—এমন আশঙ্কা হয়েছিল কিছুদিন আগেই—যখন শুনেছিলাম তিনি আর খেতে চাইছেন না, তাঁকে অন্যভাবে খাওয়ানো হচ্ছে। তারও আগে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, একটু জোরে বলতে হয়েছে আমি কে। কিন্তু শোনামাত্র হাত এগিয়ে এনে শক্ত করে আমার হাত ধরেছেন, প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে জিজ্ঞেস করেছেন আমি কেমন আছি, আমার স্ত্রী ও মেয়েরা কেমন আছে। এই নিরানব্বই বছর বয়সেও তাঁর স্মৃতি ছিল অসম্ভব প্রখর, পরিচিত মানুষদের সমস্ত খবর রাখতেন, খবর জানতে চাইতেন। লেখক হিসেবে তো অন্য ধরনের ছিলেনই, কিন্তু মানুষ হিসেবেও তাঁর ছাঁচ ছিল একেবারে অন্যরকম।

সেটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি তাঁর অসংখ্য ছোট ছোট প্রবন্ধের বই পড়ে, যার মধ্যে 'জীবন-শিল্পী', 'প্রত্যয়' আর 'বিনুর বই'-এর কথা এই দূরে বসে বিশেষভাবে মনে পড়ছে। 'জীবনশিল্পী'-তেই লক্ষ্য করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কীভাবে তিনি এই কথাটা বারবার করে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, জীবনকেও একটা শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা যায়। রবীন্দ্রনাথ তা পেরেছিলেন। মনে পড়ছে, নীহাররঞ্জন রায়ও পরে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে ভেবেছিলেন। তখনই মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এটা ঠিক যে, নিজের জীবনকে একটা ছবি বা ভাস্কর্য বা একটা কাব্য বা উপন্যাসের মতো গড়ে তুলবো—এই চেতনা আমাদের সকলের নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব'-এ এক গুরু যেমন আমাদের জানান, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগত—'এ জীবন লইয়া কী করিব?' রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তাঁর জীবনকে একটা স্থাপত্য-কর্মের মতো আস্তে আস্তে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, সকলের পক্ষে কি তা সম্ভব? সকলে কি তার নিজের জীবনকে তিল তিল করে শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার সকল মাল-মশলা নিজের হাতের কাছে পায়, তার সব রসদ কি প্রত্যেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? অন্নদাশঙ্করকে একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলাম সে কথা যে, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর জীবন-রচনাকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, শুধু আমরা কেন, ভারতের অগণিত 'সাধারণ' মানুষ কি তা পারে—যাদের ভাত-কাপড় থেকে আরম্ভ করে রোজকার জ্বালানি কী করে যোগাড় হবে—সকাল থেকে সেই চিন্তা করতে হয়? অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন প্রশ্নটা অসঙ্গত নয়, কিন্তু যাঁরা খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করেন নিজের জীবন, ধরা যাক সচেতন মধ্যবিত্ত বা তারও উপরের লোকজন—তাদের মধ্যে তো এই চেতনাই নেই যে, জীবনটাও একটা পরিকল্পিত নির্মাণের ব্যাপার, এলোমেলো হাওয়ায় উড়ে-চলার জিনিস নয়।

অন্নদাশঙ্করের সমস্ত গল্প-উপন্যাসে, বিশেষত তাঁর বড় উপন্যাস-পর্যায়গুলিতে

জীবন সম্বন্ধে নানা দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান চলেছে। একটি সহজ ও প্রবল নাস্তিকতাকে স্বাভাবিক প্রত্যয় হিসেবে গ্রহণ করে, জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত একটিমাত্র জীবনকে পুরোমাত্রায় স্বীকার করে, জন্মান্তর, ঈশ্বর ইত্যাদিকে বিবেচনার যোগ্য মনে না করে, তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথের দীক্ষায় এই একমাত্র জীবনের পরম মূল্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে এই জীবনখণ্ড সম্বন্ধেই তাঁর ছিল নানা উত্তরের সন্ধান। বিশেষত, শরীর ও মন—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক, যা নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে এক বিশেষ বিস্তার পায়—তা তাঁর গল্প-উপন্যাসের এক মূল বিষয় হয়ে উঠেছিল, তা 'রত্ন ও শ্রীমতী' হোক, 'সত্যাসত্য সিরিজ হোক—সমস্ত আখ্যান পড়লেই আমরা বুঝতে পারি। সেই একই সঙ্গে আমাদের নেহাৎ জৈবিক ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বাইরে গিয়ে, মানুষের সঙ্গে সমাজ ও দেশের কী সম্পর্ক হবে, তাও ছিল তাঁর আর এক ব্যাকুল অনুসন্ধানের বিষয়। তাঁর সারাজীবনই প্রশ্ন তুলেছে, উত্তর খুঁজেছে।

ফলে অন্নদাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস আর তাঁর প্রবন্ধাবলী পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নানামুখী রচনা নয়—সবই তাঁর একটি অখণ্ড প্রশ্নময় জীবনদর্শনের সূত্রে বাঁধা। বহুদিন আগে একটি শারদসংখ্যায় তাঁর 'মীন পিয়াসী' বলে একটি গল্প পড়েছিলাম। সেখানে একটি প্রবীণ চরিত্র ব্যাকুলভাবে নিজেকে আর অন্যদের এই প্রশ্ন করছে—এই যে জীবনে সকলের কাছে আমার এত ঋণ জমে উঠলো, আমি তা শোধ করবো কেমন করে? এই ঋণই অন্নদাশঙ্করকেও ঠেলে দিয়েছে তাঁর সমাজ ও দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা প্রশ্ন তুলতে—হিন্দু ও মুসলমানের স্থায়ী সম্পর্ক কী হবে—দেশ-ভাগের ঐতিহাসিক বিপন্নতা অতিক্রম করে তা কোথায় গিয়ে থিতু হবে ; কিছুটা আড়ালে থাকা জনগোষ্ঠীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব জাতির বড় অস্তিত্বের সঙ্গে কীভাবে সমন্বিত হবে, কিংবা আরও ব্যাপকভাবে—মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ আর উন্নতিচিন্তার সঙ্গে সর্বজনহিতের কোন্ সম্পর্ক কীভাবে তৈরি করবে? পদ্ধতির দিক থেকে গান্ধীবাদ তাঁর প্রিয় ছিল, হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নে অহিংসাই ছিল তাঁর অবলম্বন, কিন্তু গান্ধীজী সম্বন্ধেও তাঁর নানা প্রশ্ন উদ্যত ছিল। এইসব প্রশ্নাবলী নিয়েই যেন তিনি আমাদের উচ্চারিত বিবেক হয়ে উঠেছিলেন। খুব কম লেখকই আমাদের সময়ে এই ভূমিকা নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন, ফলে লেখক হিসেবে তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর এই 'গুরু'-র সম্মান। এই সম্মান কিন্তু তিনি জোর করে আমাদের উপর চাপাতে চাননি, সযত্নে অর্জন করবার চেষ্টাও করেননি। তাঁর সারাজীবনের জিজ্ঞাসাপূর্ণ বিস্তারেই তা সহজাতভাবে তাঁর আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। এই স্থানের দাবিদার আর কেউ রইলো না।

আশ্চর্য তাঁর গদ্যভাষা। এত সহজে এত গভীর কথা বাংলাভাষায় খুব কম লেখক বলেছেন। 'বিনুর বই'-এ তিনি বোধহয় একবার বিনুকে (অর্থাৎ নিজেকে) বলেছিলেন অনেকটা এইরকম একটা কথা—'বিনু, তুমি অনেক লিখেছ। এইবার না লিখতে

শেখো।' তাঁর এই না-লিখতে লিখতে লেখা, সহজের মধ্যে অনেক ইশারা-ইঙ্গিত ভরে দেওয়া গদ্য নিছক অনুশীলন করে অর্জিত হয় না। তা জীবনের একটা স্বচ্ছ ও সহজ প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে।

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্যশ্লোক রায়ের মৃত্যুর পর কেউ একজন তাঁর বাসস্থানে এসে তাঁকে প্রচুর সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করেন। অন্নদাশঙ্কর চুপ করে অনেকক্ষণ তাঁর মামুলি স্তোকবাক্য শোনেন, তারপর হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে বলেন, 'শুনুন, মানুষ একটাই জীবন নিয়ে পৃথিবীতে আসে, তা বাঁচা শেষ হলে সে চলে যায়। কাজেই এই নিয়ে আর কিছু বলা বাহুল্যমাত্র।' বলে তিনি উঠে চলে যান।

অন্নদাশঙ্করও একটা জীবন নিয়েই এসেছিলেন। তা পূর্ণভাবে যাপন করে চলে গেলেন। কিন্তু এই জীবন আমাদের সকলের জীবনকে কত কী দিয়ে গেল, সেটাই আমরা বসে বসে বোঝবার চেষ্টা করবো।

সৌজন্যে ঃ 'গণশক্তি'

অন্নদাশঙ্করের টান

দেবেশ রায়

অন্নদাশঙ্করকে লেখক হিসাবে পেয়েছিলাম—বাড়িতেই। সন্ধে-রাত্রির দিকে বাবাকে বড়দি কিংবা মিনুমাসি উপন্যাস পড়ে শোনাতেন। বাবার বয়স তখন বড়োজোর ৪৫ বা তারও কম। দেখতে জোয়ান, হাঁটাচলা করতেন জোরে, খেলাধুলো করতেন, বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করতেন। তবু যে কেন তাঁকে সন্ধেবেলা নভেল পড়িয়ে শোনাতে হত—জানি না। আমি সেই পড়া থেকেই তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ এঁদের পেয়ে গিয়েছিলাম। অন্নদাশঙ্করকে পেয়েছিলাম বাড়িরই অন্য জায়গা থেকে,. আরও দু-এক বছর পর। দাদার টেবিলে 'যার যেথা দেশ', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'অপসরণ', 'বিনুর বই'। সুরজিৎ দাশগুপ্ত তখন থেকে এখনও অন্নদাশঙ্করময়। সুরজিৎদা, আর আমার দাদা দীনেশচন্দ্র তখন হরিহরাত্মা। এর মধ্যে অন্নদাশঙ্কর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে, দাদাদের 'হিরো'। সে রকম সময়ই অন্নদাশঙ্কর সপরিবার দার্জিলিং থেকে নামছিলেন। দাদা-সুরজিৎদা এঁরা দল বেঁধে শিলিগুড়ি জংশনে গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে এসে গল্প বললেন—অন্নদাশঙ্কর তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন আর তাঁর মেমসায়েব স্ত্রী দাপটের সঙ্গে কুলি-কামরা-ট্রেন সামলাচ্ছিলেন। সেই গল্প শুনে খুব গোপনে সন্দেহ হয়েছিল—অন্নদাশঙ্করের সায়েবিয়ানাতেই কি দাদার মুগ্ধতা ছিল। তখন?

তাতে তো তাঁকে লেখক বলে পাওয়া হয় না।

দাদাদের হাসি-তামাশাতেও তখন অন্নদাশঙ্কর। তাঁরা কেউ বাদলের নকল করেন, কেউ সুধী-র। এসব উপন্যাস পড়ার আগেই চরিত্র হিসাবে তাঁরা চেনাশোনা হয়ে গিয়েছিলেন। কখনও এঁদের কোনো সংলাপ। দাদাদের কলেজপাঠিনী বা জলপাইগুড়িবাসিনী কাউকে কাউকে ওঁরা উজ্জয়িনী, হাসন সখী এইসব সঙ্কেতে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। সব যে বুঝতে পারতাম তা নয়। হাসন সখী যাঁকে বলা হত তাঁর সামান্য সহাস্য চাপা ঠোঁট ও একটু মাথানিচু চলন—এখনও দেখতে পাচ্ছি।

নিষিদ্ধ কিছু পড়ার কৌতূহলে যে অন্নদাশঙ্করকে পেয়েছিলাম, একেবারেই তা নয়। বাড়িতে তেমন কোনো নিষেধই ছিল না। দাদারা যে লেখককে এতটা জড়িয়ে আছেন, তাঁকে তো পেতেই হবে। দাদাদের নকল করা চরিত্র দেখে আর ইশারা দেওয়া মেয়েদের আন্দাজ করে তো আমার দিন চলবে না। আমারও তো নকল করার জন্যে চরিত্র চাই। ও ইশারা দেওয়ার জন্যে মেয়ে।

বলতে মজা লাগল বলে এ কথাটা বলা। সত্যি কথা নয়। আমি কোনোদিন কোনো বইয়ের মানুষে বা নারীতে প্রভাবিত বা আকৃষ্ট হয়েছি বলে মনে পড়ে না। জ্বলজ্যান্ত সব মানুষজনের ভিড়ের ভিতর থেকে ঘাড় ভেঙে বোকার মতো দেখেছি। মেয়েরা সেই বেঁচে-থাকা ভিড়ের ভিতর ছিল না। তাদের আলাদা ভিড়, আলাদা বেঁচে থাকা ও তাদের

দিকে আমার আলাদা বোকার মতো তাকানো। আমার সে মুগ্ধতায় বয়সের কোনো বাছবিচার ছিল না। যখন এইসব জ্যান্ত ভিড় দেখতাম না, তখন তো শুধুই বই পড়তাম। এমন কোনো কিছু মনে পড়ে না যে পড়া-বইয়ের কোনো পুরুষ বা মেয়েকে জ্যান্ত ভিড়ে খুঁজতাম বা জ্যান্ত কোনো পুরুষ বা মেয়েকে একটু অচেতনা করে নিতে তাকে বইয়ে ঢুকিয়ে নিতাম।

দাদাদের আবার তাছাড়া চলতই না। যে মেয়েটিকে দূর থেকে দেখতে ভালো লাগে, তাকেও ভালো লাগে না যদি সে পড়া-বইয়ের কোনো মেয়ের মতো না হয়। সুরজিৎদার হাসি বিখ্যাতও বটে, ভয়েরও বটে। ওই ভয়ের কথা লিখেছেন বিমল কর। বিমলদা যখন সুরজিৎদার হাসি দেখেছেন তখন তো প্র্যাকটিস করে করে সুরজিৎদা হাসিটাকে নিজের করে নিয়েছেন। হাতের মিষ্টিটা খেয়ে, জল নিঃশেষে পান করে, ঠোঁট মুছে, সুরজিৎদা হাসতে শুরু করতেন—হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা, (শ্বাস) হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা। এইভাবে তারা উদারায় উঠতে থাকবে, প্রতিটি শ্বাস গ্রহণের পর উচ্চতর হবে। তার চারপাশের যাঁরা ওই হাসি দেখছেন, ভয়ে তাঁদের বুকের শব্দও থেমে যাচ্ছে। আমি এখন বলছি, সেই সময়ের কথা যখন বছর সতের-আঠারো বয়সে সুরজিৎদা প্রথম এই হাসিটা ধরেছেন—অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'—এপিকের নায়ক বাদলের হাসির নকলে। উৎস নির্ধারণে আমার একটু-আধটু ভুল হতেও পারে, কিন্তু অন্নদাশঙ্কর-সত্যাসত্যে কোনো ভুল নেই। দাদা আর সুরজিৎদা এক সঙ্গেই ওই হাসি ধরেছিলেন। দাদা স্বভাবদোষে রক্ষা করতে পারেননি—আরও অনেক বইয়ের আরও অনেক চরিত্র দাদাকে টানত। সকালে 'সত্যাসত্য'র বাদল, তো বিকেলে ডোরিয়ান গ্রে, প্রথম রাতে জর্জ বার্নার্ড শ তো রাত গভীর হতেই সৈয়দ মুজতবা আলি-র চাচা, শেষ সকালে বুদ্ধদেব বসু-র লেখা উপন্যাসের নায়কের যেমন হওয়া স্বাভাবিক বলে তাঁর মনে হত—দাদা তেমনি ম্রিয়মাণও শূন্যদৃষ্টি হয়ে যেতেন। লজ্জার কথা কী আর বলব—দাদারা অচিন্ত্যকুমারের পরমপুরুষে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু নকল করার পক্ষে রামকৃষ্ণে রিস্ক ছিল কিছু বেশি। চিত্তচাঞ্চল্যে দাদা বাদলের হাসি ভুলেছিলেন। একলব্যের নিষ্ঠায় সুরজিৎদা সে হাসি রক্ষা করেছেন।

কোন টানে টেনেছিলেন অন্নদাশঙ্কর তখন, দাদাদের?

এর অনেক রকম সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তৈরি করা যায়। সেসব ব্যাখ্যার কোনোটিই ভুল হবে না। সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ভুল ও নির্ভুলের ভাগটা আলাদা। সাহিত্যরুচি ও নভেলের প্রকৃতি বদলের পারস্পরিকতা নিয়ে ভাবনাচিন্তা বাংলা ভাষায় শুরু হয়নি। যেটুকু কথা কখনও কখনও কেউ কেউ তুলেছেন. তাতেও এই নিয়ে ইংরেজি ভাষার গুটি কয়েক বইয়ের নির্ভরতা প্রকট। ইংরেজদের জনরুচি ও নভেল আর আমাদের জনরুচি ও নভেল একই কার্যকারণের ফল নয়। নভেল আর সিনেমা আমাদের পাঠক দর্শকদের কোন কোন টুকরোকে কখন কেমন টেনেছে, বা নিজেদের জন্যে নতুন টুকরো আলাদা করে নিয়েছেন লেখক-পরিচালক-অভিনেতারা কখন কেমন—এইসব প্রশ্ন

তৈরি করে তোলার মতো তথ্য মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রশ্নগুলিকে আকার দেওয়া এখন খুব দরকার। নইলে বুঝেই ওঠা যায় না—কাদের পড়ার জন্যে বা দেখার জন্যে নভেল বা সিনেমা, কোন নভেল বা কোন সিনেমা। একেবারে গোলে-হরিবোল সিনেমা বা নভেল, পাঠকের কোন অংশ শাস্ত্রজ্ঞানে পড়ে। পাঠক নিজের একটা কাল্পনিক শৃঙ্খলাবোধে নভেল বা সিনেমাটিকে একটু-আধটু গুছিয়ে নেন। আবার নেনও না, হয় তো। বরং স্বচ্ছল বোধ করেন—ওই একটু অগোছালো গল্প-কাহিনী ও সম্পর্কের রহস্যে। পাঠকের কোনো গড় হয় না বোধ হয়। এক পাঠকেরই কোনো গড়-পছন্দও হয় না বোধহয়। শিল্পসাহিত্যে আমরা যদি বা যে অভাবপূরণের ফূর্তি পাই, সে অভাব কি আমাদের ভিতর লুকিয়ে থাকে না কী শিল্পসাহিত্য থেকে তেমন পূরণ পেলেই আমরা একমাত্র বুঝি অভাবটা ছিল।

এ সব কোনো সমাজতাত্ত্বিক বিষয় নয়, এগুলো লেখক আর পাঠকের ভিতরের সম্পর্ক নিয়ে কথা। এই কথাটি এখন খুব দরকারি হয়ে পড়েছে—লেখক না জেনে লিখে থাকেন কী করে। পাঠকই-বা না জেনে পড়ে যাবেন কী করে। এখন নভেল বা এক ধরনের ঘটনা পড়ার ও লেখার জায়গা অনেক বেড়ে গেছে। ৪০-এর দশকে সে জায়গা ছিল না। সেই দশকের শেষ দিকে বা পরের দশকের প্রথম দিকে অন্নদাশঙ্করে দাদা-রা কী পাচ্ছিলেন?

বাংলা গল্প-উপন্যাসে মেট্রোপলিটান অভিজ্ঞতা অন্নদাশঙ্করের আগে ছিল না, তাঁর সমকালেও আর কারও লেখায় ছিল না। বিলেত নিয়ে লেখা এর আগে হয়েছে, তাতে সম্পর্কের কিছু কিছু আধুনিকতার আভাসও ছিল, সাহেবমেমদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশাও ছিল—কিন্তু সেগুলো কোনো ভিন্ন সভ্যতার জীবনযাপনের অভ্যন্তর উন্মোচিত করেনি।

ঔপন্যাসিক হবেন—এমন কিছু অন্নদাশঙ্করের ঠিক ছিল না। বরং তাঁর জবান অনুযায়ী, তিনি কবি হতেই চেয়েছিলেন। সেই জবানবন্দীকে খুব একটা মূল্য দিচ্ছি না। কবি বা ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার—এগুলো হতে চাওয়ার ব্যাপার নয়। এই কাজগুলিকে অভিলাষ বা উচ্চাশার অন্তর্গত করে নেওয়া যায় না। অন্নদাশঙ্করও তেমন নেননি। তা বোঝা যায়, তিনি ঔপন্যাসিক হওয়ার আগেই কী উপন্যস্ত করবেন তা স্থির করেছিলেন—ইউরোপ ও ভারতজোড়া সভ্যতারও সম্পর্কের সমুদ্রমন্থন।

একজন ভারতীয় ঔপন্যাসিকের পক্ষে এর চাইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অনিবার্য কাহিনী আর কী হতে পারে। এই সম্পর্কের উপন্যাসন করতে রবীন্দ্রনাথকে গোরার মতো একজনকে ভাবতে হয়েছে। গোরাকে উপন্যাসন-ক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম বলে ভাবা—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক-কল্পনার একটি প্রমাণ। যেমন—পিয়ের, ওয়ার অ্যান্ড পিস-এর। পিয়ের যেমন ততটা রুশি নয়, যেন একটু বহিরাগত, যেন একটু সীমান্তবর্তী। গোরা পালিত-ভারতীয়, জন্মে ইউরোপীয়, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সন্তান, 'চিলড্রেন অব মিডলাইড'-এর নকল করে বলতে ইচ্ছে হয়, 'চিলড্রেন অব মিউটিনি', সে তার শরীরে ও মনে দুই সভ্যতার বিনিময় বহন করছে।

বিশেষ করে ভারতীয় ইংরেজি-ঔপন্যাসিকরা ভারত ও ইউরোপ নিয়ে নানা রকম গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এখনও লিখছেন—রুশদি, অমিতাভ, অরুন্ধতী। অন্ত দু-জন প্রধান ইংরেজ ঔপন্যাসিক এই সম্পর্কের জাল ধরতে চেয়েছিলেন—কিপলিং ও ফর্স্টার। এঁদের সকলেরই লেখা যে প্রধানত নিজেকে নিয়ে ও নিজের স্মৃতির বিভাজন নিয়ে তাতে মনে হয় এঁরা দুই সভ্যতার সংঘর্ষ-বিনিময় থেকে উত্থিত আত্মতা-র, সাবজেকটিভিটি-র উপন্যাসন করতে চাইছিলেন। উপন্যাসের তেমন প্রকল্পও মূল্যবান ও কঠিন।

অন্নদাশঙ্কর তার চাইতে অধিক ও পৃথক প্রকল্প নিয়েছিলেন—'সত্যাসত্য'-এ। তিনি বাংলা ভাষায় এই দুই সভ্যতার সম্পর্ক নিয়ে এপিক লিখতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'রচনাবলী'-তে ৮৪ সাল নাগাদ তিনি মন্তব্য করেছিলেন—এপিকের দাবি তিনি প্রত্যাহার করছেন। কোনো কারণ দেননি এই প্রত্যাহারের। আমরা বাংলায় 'এপিক' কথাটিকে প্রশস্তিজ্ঞাপক একটি অলঙ্কার বলেই ব্যবহার করি। ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বে 'এপিক' কোনো অলঙ্কার নয়, বিশেষ এক সাহিত্যরূপ। সেই এপিকে সামূহিক জীবনের বিচিত্রতা ও আবর্তন—এসে পড়ে। উপন্যাসনের লক্ষ সেটাই। আমার একেবারে ব্যক্তিগত একটি সন্দেহ আছে—উপন্যাসনের ক্রিয়ায় ওই ইউরোপীয় অর্থের নির্দিষ্ট এপিকে পৌঁছুনো যায় কী না। আবার যায়ও তো দেখি—ল্যাক্সনেস তাঁর 'দি ইনডিপেনডেন্ট পিপল'কে এপিক বলেন। হেরমান হেসও বলেন। আবার টমাস মান 'জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স'কেও বলেননি।

এপিক কী এপিক নয় এমন মাপজোক খুব দরকার নেই, এখন। তখন এই এপিক-মাপটিই হয় তো দরকারি সঙ্কেত ছিল, ১৯৪২-এ, 'সত্যাসত্য'-এর শেষ ও ষষ্ঠ খণ্ড 'অপসরণ' বেরিয়ে গেলে। বড়োজোর আর বছর আটেক পরেই তো দাদাদের, দাদা আর সুরজিৎদাকে, দেখব বাংলা উপন্যাসে ওই এপিকের বিস্তার সম্ভব—সেই গর্বে মাততে।

অন্নদাশঙ্করের কীর্তির এই মহত্ত্ব নির্মিত হতে না হতেই যে একটু কালজয়ী হয়ে গেল, তার প্রধান কারণ কি এই—স্বাধীনতার পর ইউরোপ-ভারত সম্পর্কের ভিত আর আদল দুটোই অনিবার্যত বদলে গেল, কলোনিগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত শক্তিতে সভ্যতার নতুন নিয়ামক হয়ে উঠল আর পৃথিবীর প্রায় বীভৎসতম ধর্মীয় গৃহযুদ্ধে নিজেরাই নিজেদের মারতে-মারতে, আমরা অপমান করতে-করতে, শত্রু হয়ে উঠতে-উঠতে আমরা বুঝতে পেরে যাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বলে যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল তা কতটাই ধর্মমোহ। 'সত্যাসত্য' ভিত পাবে কোথায়, তা হলে।

এ থেকে আমরা আর একটা প্রশ্নে পড়ে যেতে পারি—'সত্যাসত্য' কি এতটাই সমকালনির্ভর যে সমকালের চিহ্নকগুলি বদলে গেলেও, সাহিত্য তাকে কালের বেষ্টন থেকে উদ্ধার করতে পারে না?

এই প্রশ্নটি নিয়ে ভাবতে হবে, প্রশ্নটিকে একটা বদলে-বদলেও নিতে হবে। 'সত্যাসত্য' ঔপন্যাসিক কল্পনার এতই বিরল এক বিস্তার যে সময়ের সঙ্গে সে-

উপন্যাসটির সম্পর্ক নির্ধারণের নিরিখগুলি ঠিক না করে সেই ঔপন্যাসিক কল্পনাকে ধারণা করা যাবে না। তাছাড়া, 'সত্যাসত্য'-এর সমকাল বলতে অন্তত ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, গান্ধি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পর্বটিকেই ধরতে হবে—সেই পর্ব জুড়ে ইউরোপ ও ভারতের ভিতর সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় সমাজে মন্থন চলছে। সেই মন্থন থেকে যে কিছু কিছু সমাধান তৈরি হচ্ছিল, সেগুলি সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ধ্বংস হয়ে গেল। তাতে হয় তো এখন, ২০০২-এ, আমরা আন্দাজ করতে পারি যে ওই সমাধানগুলি তা হলে সমাধান ছিল না। এমন সন্দেহও করতে পারি যে ওই সমাধানগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল ও এখনও হচ্ছে। বাংলা ভাষায় উপন্যাসের এই মহৎ প্রকল্পের রচনা সম্পূর্ণ হতে না হতেই, 'সত্যাসত্য' সেই ধ্বংসের স্মারকচিহ্ন, রেলিক, হয়ে গেল।

একটা সময়পঞ্জি দেখলে বাংলা গল্প-উপন্যাসের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্বটির সম্মুখে অভিভূত দাঁড়াতে হয়। ১৯২৮-এ একই কাগজে 'পথের পাঁচালী' ও 'পথে-প্রবাসে' ধারাবাহিক শুরু হয়। ১৯৪২-এ 'সত্যাসত্য'-এর শেষ খণ্ড বেরোয়। এই ২৮ থেকে ৪২, চোদ্দটি বছরে বেরিয়েছে—যোগাযোগ, পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, আরণ্যক, কজ্জলী (১৯২৭), অসাধু সিদ্ধার্থ, লঘুগুরু, ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, একদা, অন্তঃশীলা-আবর্ত। বাংলা গল্প-উপন্যাসের এই অভিযান এতটা ব্যাপক, বিচিত্র ও উচ্চাশী হতে পারত না—'সত্যাসত্য' ছাড়া। আর গ্রামে-নদীতে-গঞ্জে-আধা শহরে কলকাতায়, আমাদের চাষবাস, ধর্মকর্ম, পুরুষানুক্রমিক ও সাম্প্রদায়িক নানা বৃত্তি, আধুনিক নানা নতুন পেশা, আমাদের নানারকমের বিশ্বাসের অস্থিরতা, আমাদের চিন্তার নানা বাঁক এই সব নিয়ে আমাদের দিনরাত্রি, মাস-বছর, দশক-শতক, এই গল্প-উপন্যাসগুলিতে যে শিল্প-প্রতিয়মান তৈরি করে তুলেছিল, 'সত্যাসত্য' ছাড়া তাতে আমাদের বাঁচার ইতিহাসের দিকগুলো এমন নির্দেশিত হতে পারত না।

বেঁচে-থাকার ইতিহাস তৈরিই থাকে—গল্পকার-ঔপন্যাসিক তার পাঠোদ্ধার করে দেন বা খনন করে সেই ইতিহাসকে বাইরে আনেন,—এমন কোনো স্তরান্তরে গল্প-উপন্যাসে বেঁচে-থাকার ইতিহাস লেখা হয় না। গল্প-উপন্যাসে যেমন লেখা হয়, আমাদের বেঁচে-থাকার ইতিহাস তেমন করে আমরা পড়ি ও জানি। সেই পড়া ও জানা সেই ইতিহাস যাপনের প্রক্রিয়া, যেমন সেই কল্পনা ও লেখাও সেই ইতিহাস যাপনেরই প্রক্রিয়া। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর নরনারীর সম্পর্কের তেমন একটা আয়তন খুঁজছিলেন যা সামাজিক-পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়, আবার, যে আয়তনে সামাজিক-পারিবারিক সম্বন্ধ আঁটে না। অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কের এমন একটা আয়তন ছকছিলেন তাঁর কিছু উপন্যাসে, কিছু ছোটোগল্পে। আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা—উপন্যাস দুটি আর হাসন সখী, যৌবনজ্বালা এমন কিছু গল্পের কথা মনে পড়ছে। তারাশঙ্কর ও সরোজকুমার রায়চৌধুরী বীরভূমের বোষ্টম-বোষ্টমী নিয়ে যে

গল্পগুলি লিখেছিলেন, তার কথা বলার ছাঁদে ও বৈষ্ণব পরিবেশে তখন একটা নতুত্বের অচেনা টান ছিল। জগদীশ গুপ্ত তাঁর এমন সব গল্পে সম্বন্ধের ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে পোড়াকাঠগুলি বের করছিলেন। দাদাদের কথাবার্তায় কান পেতে এইসব গল্প এমন কোনো আবিষ্কার থেকেও যে পড়া যায়—তখন তেমন শুনিনি। পরে, বেশ বড়ো মাপের, মার্ক্সবাদী মাপের, ঐতিহাসিক মাপের ও বিনির্মিত মাপের যে সব আলোচনা পড়েছি, তাতেও, এই গল্পগুলির ভিতরে নরনারী, বিয়ে, অ-বিয়ে, যৌনসঙ্গের যে গল্প বৈষ্ণব-আশ্রম বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিতরে লুকনো থাকত, তার কোনো ইশারা পাইনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তে বরং নরনারী বা সেক্স পড়া হয়েছে সেই সময়ে।

অন্নদাশঙ্কর যে দাদাদের, আমার বেলায় দাদাকে—সুরজিৎদাকে, এমন মাতিয়েছিলেন তার একটা কারণ, সেক্সকে তিনি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গল্প-উপন্যাস কল্পনা করতে পেরেছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের 'বিবাহের চেয়ে বড়' উপন্যাসটিতে মেয়ে-বিয়ে-সংসার এই ধারণার অতিরিক্ত একটা সংকেত ছিল। গল্প তৈরি করে তোলার বাইরের দামে ও অভ্যাসে এই উপন্যাসটিতেও বিয়ে-সংসারের অতিরিক্ত ধারণাটি তাঁর নিজেরই ধারণা হয়ে উঠতে পারেনি—থেকে গেছে ওই ছোট উপন্যাসটির ঘটনা ও লোকজনের মধ্যে। অন্নদাশঙ্কর সেখানে ঘটনা ও ঘটনার লোকজনকে তেমন একটা প্রাধান্যই দেননি যে তাঁর প্রতিপাদ্য তাঁরই থাকবে না। তাঁর এই গল্পগুলির পরোক্ষ ডিসকোর্সই এই লেখাগুলিকে তখন এমন প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল।

সেদিন সকালে অন্নদাশঙ্কর শায়িত ছিলেন প্রাণহীন বাংলা আকাদেমির প্রাঙ্গণে। সুরজিৎদা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এদিক-ওদিক। সুরজিৎদার ভিতরে সত্যাসত্যের সেই হাসি জমা হয়ে আছে, যে কোনো সময় ফেটে বেরবে। এমন অন্তত একজন পাঠকই কি যথেষ্ট নয়?

সৌজন্যে ঃ 'বাংলা বই', বাংলা আকাদেমি

বাংলা আকাদেমির অভিভাবক অন্নদাশঙ্কর

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

জীবৎকালেই তিনি ছিলেন কিংবদন্তী। প্রথম লেখার ধারাবাহিক প্রকাশকালেই বাঙালী পাঠক তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল। প্রখর মেধা আর প্রসারিত পাণ্ডিত্যের কথা এসে যেত তাঁর নাম উচ্চারিত হলে, দেশভাগ ও নজরুলকে নিয়ে প্রবাদপ্রতিম পংক্তিমালায় তিনি জনক, এমন পংক্তিগুচ্ছ যা আবহমানকাল ধরে উচ্চারিত হবে বাংলার ঘরে ঘরে, সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বে মাথা-না-নোয়ানো ঋজুতার সঙ্গে প্রসন্ন সৌরভের সম্মিলন—সব মিলিয়ে প্রবাদ বলয়েরই অবিস্মরণীয় মানুষ তিনি। আর আজ তিনি ইতিহাসের অধ্যায়, বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সুচেতনার ইতিহাসের অনন্য এক অধ্যায়।

তাঁকে নিয়ে লিখতে বসে স্মৃতির প্রবাহ তোলপাড় হচ্ছে। কোনও শৃঙ্খলা ও বিন্যাসই যেন মানতে চাইছে না তারা। স্মৃতি শব্দটার ব্যবহার কতদূর যথার্থ হলো, তা নিয়েই ঘোর সংশয় হচ্ছে। সময়ের মাপে এমন কাছের কথাকে স্মৃতি বলা যাবে! মাত্র কয়েকটা দিন আগেই তো চিঠি পাঠালেন তিনি। রোগশয্যা থেকে শারদোৎসব-অন্তের শুভেচ্ছাপত্র। তাঁর চিকিৎসা নিয়ে রাজ্য সরকার ও আকাদেমির প্রযত্নের কথা লিখেছেন। আরও কত বিষয়ে খোঁজ নিয়েছে তাঁর সদা-উৎসুক মন। সেখানেও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর তারুণ্যময় আশাবাদ। লিখেছেন, 'হাসপাতালের চিকিৎসায় ও সেবাযত্নে আমি ও আমার পরিবার খুব খুশি। এখানে আরও থাকলে আমি আরও শক্ত ও সুস্থ হয়ে উঠব।' গত সপ্তাহেই এস এস কে এম হাসপাতালে তাঁর পাশে যখন গিয়েছি, আকুল আগ্রহে কথা বলতে চেয়েছেন তিনি, আকাদেমির কাজকর্মের খবর নিতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন কেমন আছি। চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণের নিরন্তর কষ্টের মধ্যেও মুখমণ্ডলে সেই চিরাচরিত প্রশান্তি প্রাণপণে ফিরিয়ে এনে শুভকামনা জানিয়েছেন, শুভেচ্ছাবাণী-আশীর্বাদ উচ্চারণ করেছেন মর্মরিত শব্দে।

সত্তরের দশকের আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস ও বন্দীমুক্তির আন্দোলনের দিনকালেই তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছবার সুযোগ করে নিয়েছিলাম আমরা। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বা বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সপক্ষে যখনই তাঁর সম্মতি ও সমর্থন চাইতে গিয়েছি, কোনওদিন নিরাশ হতে হয়নি। বরং সকল শুভ ও মানবিক প্রচেষ্টায় তাঁর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আমাদের উজ্জীবিত করেছে। নিজেদের লক্ষ্যে প্রেরণা উদ্দীপনার অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে। মনে আছে, বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সময় রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দেবার কালে, তিনি একটি স্বতন্ত্র চিঠি পাঠিয়ে আমাদের দাবিকে প্রবল সমর্থন জানিয়েছেন।

তাঁর ব্যক্তিত্বের আরও নিকটতর এলাকায় পৌঁছবার সুযোগ ঘটে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্বে। আকাদেমি স্থাপনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সমীপে। আকাদেমির

বর্তমান যে ভবন, তার জমি পাওয়ার জন্যেও তাঁর আগ্রহ মনে থাকবে চিরকাল। ফরাসী আকাদেমিকে তিনি দেখেছিলেন সে দেশে গিয়ে, খুব কাছ থেকে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকদিন পর্যন্ত সেই স্বপ্ন তাঁর স্বপ্নে ও চিন্তনে জড়িয়েছিল। সেই স্বপ্ন সঞ্চারিত করে দিতে চাইতেন আকাদেমির সঙ্গে সংযুক্ত সকলের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বহুমুখী ও নিবিড় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৬ সালের ২০মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। প্রথমে ছিল উপদেষ্টা পর্ষদ, পরে রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে স্বশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়। প্রথম থেকেই তিনি আকাদেমির সভাপতি পদে। আকাদেমির কর্মধারার প্রতি পদক্ষেপে তাঁর অভিভাবকত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান বিকাশের পথে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বানান সংস্কার বিষয়ে আকাদেমির পদক্ষেপ, বানান অভিধান প্রস্তুতি, ব্যুৎপত্তি অভিধান প্রণয়নের প্রকল্প গ্রহণ, নানাবিধ গবেষণাপ্রকল্প ও অভিধান প্রণয়ন—সকল বিষয়েই সপ্রাণ ঔৎসুক্য ছিল, ছিল সুচিন্তিত পরামর্শ, সহায়তা। বানান সংস্কারের বিষয়ে খুবই আগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁরই পরামর্শক্রমে প্রস্তুত হয়েছে আকাদেমি বানান অভিধান। সব সময় বলতেন, বাংলা ভাষায় অভিধান চর্চা বিষয়ে খুবই মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের উপযোগী আকাদেমির যে অভিধানটি রয়েছে, তার নামকরণও তিনি করেছিলেন, বিদ্যার্থী অভিধান।

দু-পার বাংলাতেই সমান জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। আকাদেমির প্রতি নির্দেশ ছিল, আমরা যেন ওপার বাংলার একাডেমি ও সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলি। দু-পার বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয়ের কথা বলতেন বারংবার। এপার বাংলার সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার জন্যে নির্দেশ ছিল তাঁর।

শেষ দিকে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে সবকটি সভার বা উৎসবে-অনুষ্ঠানে আসতে পারতেন না। কিন্তু হৃদয় ও মনন পড়ে থাকত এখানে। সব উৎসবের প্রারম্ভে খোঁজ নিতেন, উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে পৌঁছে যেত তাঁর শুভেচ্ছাবাণী। এই সেদিন আকাদেমির কর্মপরিষদ ও সাধারণ পরিষদের শেষ সভায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একগুচ্ছ প্রস্তাব। প্রেরিত প্রস্তাবগুলি থেকে বোঝা যেত আমাদের বাংলাভূমির প্রত্যেক প্রান্তের ভাষা ও সংস্কৃতির কর্মকাণ্ড নিয়ে কত সজাগ তিনি, জনগণের প্রতি অংশের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কত গভীরভাবে ভাবছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-টলস্টয়-রোমাঁ রোলাঁ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষার, মানবব্রতের পরম অনুসারী ছিলেন তিনি। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও (১৯৬২, ১৯৬৯, ১৯৮০) রচনা করেছিলেন তিনি। গান্ধীজী প্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। কিন্তু এই শ্রদ্ধাবোধ অন্ধ নয়, গুরুবাদী নয়। তিনি নিজে লিখেছেন—"আমি গান্ধীবাদী নই। কিন্তু আমার বিশ্বাস গান্ধীজীই এ দেশের ও এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর

A[illegible]NADA SANKAR RAY, [illegible]

P-17A Ashutosh Chowdhury Avenue
Flat No 1 C
Calcutta-700 019
Phone : 43-5473

১৭ মে ১৯৮৬

শ্রী প্রভাস ফদিকার,

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী,

তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয়েষু,

আপনার পত্রের জন্যে ধন্যবাদ।

বাংলা আকাদেমির বিশিষ্ট সদস্য হতে আমি সম্মত আছি।

নমস্কারান্তে। ইতি।

ভবদীয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই আমার গভীর সম্পর্ক। কিন্তু সে সম্পর্ক একই রকমের নয়। প্রথমে uncritically গ্রহণ করেছি। তারপর critically বর্জন করেছি। তারপরে critically গ্রহণ করেছি, তারপর uncritically গ্রহণ করেছি। তারপর গ্রহণ করেছি। critically কিন্তু সব সময়েই ভালোবেসেছি, ভক্তি করেছি।.....কিন্তু আমি আমিই। কারো কাছে বুদ্ধি বিবেক স্বাধীনতা বাঁধা দিই নি, দেব না।" এই হলেন অন্নদাশঙ্কর। মুক্তচিন্তার চিরপথিক তিনি। বিশ শতকের বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মূর্ত বিবেক তিনি।

সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের প্রশ্নে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদর্শবাদকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রশ্নে কোনো আপসে এতটুকু বিশ্বাস ছিল না তাঁর। প্রশাসনিক পদও ছেড়েছিলেন সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের ব্রত থেকে সরে আসবেন না বলেই। ভারতবর্ষে যে-কোনো প্রান্তে, যে-কোনো মুহূর্তে সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি ও যড়যন্ত্র মাথা তুললেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে, নিন্দায়, ব্যঙ্গে গর্জে উঠেছে তাঁর কলম, তাঁর কণ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের নিকটতর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তবুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকেই ধ্রুবপদ মেনেছিলেন অন্নদাশঙ্কর। মানবের উপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের আশ্চর্য সপ্রাণ ও উদ্দীপক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। তিনি লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের ছিল মানুষের উপর অসীম, অনন্ত বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসই মানুষকে বাঁচাবে।...মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো মানে আপনার উপর বিশ্বাস হারানো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নিজে ছেড়ে না দিলে এ বিশ্বাস আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তলিয়ে দেখলে এই বিশ্বাসই মানবিকতাবাদের অন্তঃসার।" সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। সৃষ্টিকেই তিনি নিজের প্রধান কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। আমাদেরও বারংবার তিনি বলতেন, কখনো লেখা ছাড়বেন না। অন্তত অল্প করেও লিখবেন। তথাপি কাজের ডাক, দেশের ডাক তাঁকে বারংবার আলোড়িত করেছে, অস্থির করেছে। তিনি লিখেছেন, "যদিও আমার প্রধান কাজ সৃষ্টি, সৃষ্টি করি আর একটুর পর একটু মুক্ত হই, তবু আমাকে কখনও কখনও সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে দেশের ও কালের ভাবনায় ভাগ নিতে ও দিতে হয়। নইলে আমি হব পলায়নবাদী।"

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের ভাবনা ছেড়ে এক লহমায় পালাতে নারাজ ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। বিশ শতকের বিস্তৃত সময়কাল বেঁচে থাকবে তাঁর মহাকাব্যপ্রতিম উপন্যাস সত্যাসত্য, ক্রান্তদর্শী কিংবা রত্ন ও শ্রীমতী। দুর্যোগ ও উদ্দীপনার মুহূর্তগুলি তাঁর অম্লান ছড়ার পংক্তিমালায় বেঁচে থাকবে যতদিন পদ্মা-গঙ্গা বহমান থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্মে ও সৃজনে। কর্ম ও সৃজনের এমন সেতুবন্ধন ঘটাতে পারে যে জীবন, সেই জীবন সারা দেশের, সর্বকালের সম্পদ।

সৌজন্যে : 'গণশক্তি'

ধ্রুপদী শুদ্ধতা ও জনগণের সহযাত্রী

জ্যোতির্ময় ঘোষ

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ এক ও অভিন্ন। সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ অহিংস।

মনে করিয়ে না-দিলে অতি বড়ো পড়ুয়ারও মনেই পড়বে না যে, উদ্ধৃত বাক্যদুটি মনস্বী ভাবুক ও সাহিত্যস্রষ্টা অন্নদাশঙ্করের বিস্মৃতপ্রায় একটি বইয়ের সম্পূর্ণ উৎসর্গপত্র। এখন থেকে একান্ন বছর আগে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বইটির নাম 'প্রত্যয়'। উৎসর্গপত্রের তারিখ ৩০শে বৈশাখ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। অন্নদাশঙ্কর বইটি উৎসর্গ করেছিলেন 'কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব শ্রদ্ধাস্পদেষু'।

'জনগণ এক ও অভিন্ন' আর 'জনগণ অহিংস'—এই দু'টি বক্তব্যই অন্নদাশঙ্করের শুধু ধারণা ও তাৎক্ষণিক অভিমত মাত্র নয়, বইটির নাম মনে রেখে বলা যায়, এ তাঁর প্রত্যয়'। এই প্রত্যয় তাঁর সারা জীবনের উচ্চারণ, সোচ্চার ঘোষণা। তবু, ওদুদ সাহেবকে উৎসর্গীকৃত 'প্রত্যয়' বইটির প্রকাশের বছর ১৯৫১ থেকেই অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে আমার বিগত একান্ন বছরের অনুভব ও অভিজ্ঞতার সূত্রপাত।

ঃ অন্নদাশঙ্করকে দেখতে যাবি?

ঃ কেন?

ঃ দেখব। কথা বলবো।

ঃ তো, আগে একটা চিঠি লেখা যাক।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ ঠিকানা?

ঃ এই তো, শান্তিনিকেতন।

ধান খেতের মধ্যে স্কুল হলেও বাজারের মধ্যে একই চত্বরে হিন্দু আর মুসলিম ছাত্রদের দুটো হস্টেল। মুসলিম হস্টেলে একটা চৌকিতে শুয়ে-শুয়ে দুই সাহিত্যযশোপ্রার্থী বারো আর চৌদ্দ বছরের বালক কোনো রবিবার দুপুরে এইরকম কথোপকথনে উত্তেজনার আগুন পোয়াচ্ছিল। বয়সে মাত্র বছর দুই-তিন বড়ো হলেও কাজী মুহম্মদ আরেফ ছিল ঐ কৈশোরেই গানে-জীবনবোধে-সাহিত্যভাবনায় অনেক প্রবীণের চেয়েও বেশি সংবেদনশীল। মা-বাবার পরেই আরেফ ছিল আমার ঐ বয়সের আরও-একজন সাহিত্যবন্ধু। ওর সঙ্গেই তখন সবুজপত্র, কল্লোল আর পরিচয় গোষ্ঠীর লেখকদের কবিতা-কথাসাহিত্য-প্রবন্ধপাঠ চলতো। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আর যাঁদের লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, তাঁদের মধ্যে ওদুদ সাহেব আর অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের ভক্ত ছিল আরেফ। তার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল আরও একজন কিশোর পাঠকের মধ্যেও। বুঝি আর না-বুঝি, একটা ধারণা তো তৈরি হচ্ছিল। আদৌ বুঝতে না পারলে ইংরেজির আর বাংলার দুই মাস্টারমশাই, তাসেল মিঞা আর রাধাগোবিন্দ

সিংহ তো ছিলেনই। অন্নদাশঙ্করকে প্রথমে চিঠি লেখা হলো। লিখল আরেফ। নিচে ওর নিজের নাম সই করে বললো, সই করে দে? দিলাম। তার পরে পড়ে দেখলাম, যে-সব কথা আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি, তাই লিখে দিয়েছে আরেফ। এই চিঠির জবাব দেবেন অন্নদাশঙ্কর? অসম্ভব। চিঠিতে যা লেখা হয়েছিল, তার মর্মার্থ ছিল এইরকম—নজরুল-মানিক-সুকান্ত হলেন জনগণের কবি ও কথাশিল্পী। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা বুর্জোয়া মনে করি। আপনাকেও। এ নিয়ে আপনার বক্তব্য জানতে চাই। বিশেষ করে, 'প্রত্যয়' বইটির উৎসর্গপত্রে জনগণ-এর উল্লেখ করেছেন।...ইত্যাদি। 'দেখা করতে যেতে চাই'—এমন আবদারও ছিল।

দিন পনেরো পরে আরেফ বললো—চল্, শান্তিনিকেতনে যাব। উনি দেখা করতে বলেছেন। রামপুরহাট থেকে বোলপুরে নেমে শান্তিনিকেতন। সকালে গিয়ে সন্ধ্যের দিকেই ফিরে আসা সম্ভব ছিল তখনও। বাড়িতে ক্রিকেট ম্যাচ বা ঐ ধরনের কিছু একটা বানিয়ে বলে বোলপুর যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ওখান থেকে হেঁটেই শান্তিনিকেতন। মিনিট কয়েকের কথায় একটি মোক্ষম উপদেশ নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। বাইরের বইপত্র পড়া খুবই ভালো। তবু, ক্লাস আর পরীক্ষার পড়াশোনায় আরও মন দাও। পরীক্ষা তো সামনে?

বুর্জোয়া শব্দের মানেটাও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বুর্জোয়া বলতেই আদ্যন্ত খারাপ কিছু বোঝায় না, তা-ও বলেছিলেন। পরীক্ষার পর এসো এবং মাঝে-মাঝে এসো গোছের কথাও বলেছিলেন। আরেফ আর আমার একসঙ্গে সাহিত্যপাঠ ও বন্ধুত্ব তাঁকে যেন খুশি করেছিল। আরেফের সঙ্গেই বেশি কথা বলেছিলেন। ওর পড়াশোনা তো সত্যিই ভালো ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে গিয়ে অন্নদাশঙ্করের পুত্র আনন্দরূপকে পেয়ে যাই সাত-আট বছর পরেই। ক'বছর আগে ওঁর জন্মদিনে গিয়ে দেখি, বিদেশ থেকে আনন্দরূপও এসেছে। একটু আড্ডাও হলো। 'গোর্খাল্যান্ড' নিয়ে উত্তেজনা বাড়তেই 'গণশক্তি'র তখনকার সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের কথায় অন্নদাশঙ্করের কাছে যাই। তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলেন। গণশক্তিতে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে সেই লেখাটি ছিল উত্তম পথনির্দেশিকা। শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও গণশক্তি-র যেকোনো প্রয়োজনে তিনি সাড়া দিয়েছেন। ওঁর মনস্বিনী স্ত্রী যতদিন বেঁচেছিলেন, তাঁরও স্নেহের প্রকাশ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ওঁদের সঙ্গে আমাদের ছবিও ছিল অনেকগুলি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে'র অর্থানুকূল্যে আয়োজিত উজ্জীবনী পাঠমালা ও বিশেষত সংশ্লিষ্ট একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি অথচ আসেন নি, এমন কখনও হয়নি। এসব উপলক্ষে বলেছেন। লিখেছেনও আমাদের সঙ্কলনে। বেশ কয়েকবারের এক স্মৃতি যে অনুপুঙ্খ লিখতে পারলে বেশ স্বাস্থ্যবান পুঁথিই হয়ে যাবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের

আরও একটি যোগসূত্রের খবর এখনকার অনেকেরই সেভাবে জানা নেই। অন্নদাশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিয়োগের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সমিতিগুলিতে একসময়ে ছিলেন অন্যতম অপরিহার্য বিশেষজ্ঞ-সদস্য। আমাদের শিক্ষকগণেরও এবং তাঁদের শিক্ষকগণের অনেকেরই নিয়োগ হয়েছে বা হয়নি তাঁরই প্রত্যক্ষ ভূমিকায়। বাংলা বিভাগের পি-এইচ ডি আর ডি লিট. থিসিসসমূহেরও পরীক্ষকরূপে একসময়ে অন্নদাশঙ্কর ছিলেন অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। বাংলাভাষা-সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণা কাজের যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত কখনও যদি কেউ প্রস্তুত করেন, সেখানে অন্নদাশঙ্কর একাই একটি অধ্যায়ের উপাদানরূপে গৃহীত ও আলোচিত হবেন, এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ মানুষজনেরা দ্বিধামাত্র বোধ করবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, প্রশ্নরচনা, পরীক্ষার কাজ, শিক্ষকনিয়োগ, গবেষণাপত্রের পরীক্ষকের কাজ প্রভৃতি দায়িত্ব পালনে অন্নদাশঙ্করের গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ভূমিকা কমবেশি সংস্পর্শের দিকটি স্মরণের তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য। গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের বিচারে শিক্ষা ও শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিরই অন্তর্গত। শ্রেণীবিভক্ত কোনো সমাজের সংস্কৃতি দূষণমুক্ত হতেই পারে না, মানবসভ্যতার আড়াই-তিন হাজার বছর থেকে টেনেটুনে হাজার পাঁচেক বছরের ইতিহাস ঘেঁটে এইরকম সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

অন্নদাশঙ্কর শুধু সাহিত্য স্রষ্টাই ছিলেন না। বিশেষভাবে শিক্ষা ও ব্যাপকভাবে সংস্কৃতির বিচিত্রমুখী অঞ্চলগুলিতেও তাঁর সাবলীল সঞ্চরণের কারণ তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতা-সচেতন মনস্বীপুরুষ। তিনি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আর টলস্টয়কে তাঁর উদার চেতনায় স্থান দিতে পারেন অক্লেশে। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার ভূমিকা তাঁকে এমত উচ্চারণে প্রবুদ্ধ করে যে, 'সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণ এক ও অভিন্ন'। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচিন্তার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী শুদ্ধতার প্রতি তাঁর সতর্ক-মনস্কতার পাশাপাশি জনগণকে সহযাত্রী-রূপে পেতে তাঁর অন্তর্গূঢ় আকাঙ্ক্ষা বিগত একান্ন বছর যাবৎ প্রায়শ আমাকে স্পন্দিত করেছে।

সৌজন্যে ঃ 'গণশক্তি'

নারী ভাবনা ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়

সুমিতা চক্রবর্তী

ষোল বছর বয়সে যে লেখকের প্রথম বাংলা রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়—তলস্তয়-এর একটি গল্পের অনুবাদ—তিনি লেখার জগতে সৃষ্টিশীল হয়ে আছেন পরবর্তী চুয়াত্তর বছর ধরে। এই সৌভাগ্যের সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে এই সত্য—চুয়াত্তর বছর ধরে কারো মনোভঙ্গি, অভিমত এবং দৃষ্টিকোণ অপরিবর্তিত থাকা প্রায় অসম্ভব। বিশেষত, অন্নদাশঙ্কর রায় এমন একজন স্রষ্টা যাঁর মানসক্ষেত্রটি সর্বদাই সমকালের সামাজিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার ফসল ফলাতে উন্মুখ। দেশ-কাল বদলে যায় প্রতিদিনই, জাগ্রত মননকে বদলাতে হয় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

এমন একটা যুগের চলার সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনের দক্ষেপ সমান্তরাল-লগ্ন—সেই যুগটি ভারতের মতো দেশগুলির সমাজে খুবই অস্থির। নারীর অবস্থান, নারী ও পুরুষের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কজনিত নীতিবোধসমূহ একটি সর্বজনগ্রাহ্য মানব একেবারেই অর্জন করেনি এদেশে। এখানে বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা আইনে নেই, আসলে আছে ; পুরুষের বহু বিবাহ আইনে নেই, তবুও ঘটে ; বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত শর্তাবলী নিম্নবর্গীয় সমাজের মেয়েরা কানেও শোনেন নি। এই একটা দেশ যেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য এই বৃহত্তম গণতন্ত্রের সংবিধান রাজনৈতিক স্বার্থে তার গণতান্ত্রিকতা বর্জন করেছে। এদেশের আইন মুসলমান মেয়েদের মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে গণ্য করে, অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের সমান অধিকার তাঁদের দেয় না। নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত অন্যান্য ভয়ঙ্কর অসমতার কথা আর উল্লেখ করছি না। অথচ এই দেশেরই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা প্রধানমন্ত্রীত্বসহ কী না করতে পারেন! কী না করেন?

অবস্থাটি এরকম হবার মূলে প্রধান কারণ হল নারী সম্পর্কে সমাজ ও প্রশাসনের মনোভাবে স্থিরতার অভাব—তথা স্ববিরোধ। নারী ভাবনার ক্ষেত্রে স্ববিরোধ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি মধ্যবিত্ত সমাজে। বাঙালি মধ্যবিত্ত একদিকে বিবাহ-বন্ধনে ও পারিবারিক শুচিতায় বিশ্বাসী ; নারীর গৃহিনী ও জননীর ভূমিকাকে কিছু মহিমান্বিত করে দেখবার পক্ষপাতী। এর মূলে আছে মধ্যযুগীয় শাস্ত্রীয় সংস্কারের প্রতি দীর্ঘকালীন বিশ্বাসের রেশ, এক মানসিক জড়তা যা সামাজিক প্রথাসম্মত চিরাচরিতকে বর্জন করতে অক্ষম। অন্যদিকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনার প্রভাবে এই মধ্যবিত্ত সমাজ

নীতিগতভাবে নারী-পুরুষের সমান অধিকারেও বিশ্বাসী। আবার নারী সম্পর্কে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ উপেক্ষা করতে পারে না। সেই কারণে এবং খানিকটা রবীন্দ্রনাথের ভাবনার উত্তরাধিকারবশত 'ইন্টারন্যাল ওম্যানহুড'-এর সৌন্দর্য-গৌরবী আভাও বাঙালি মানসে পরিব্যাপ্ত। এই সবের ফলে সমাজের সুশিক্ষিত ও মননশীল গোষ্ঠীটির মধ্যেও নারী সম্পর্কে ভাবনাগত অস্বচ্ছতা বর্তমান। এই গ্রন্থিলতার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় নারীর অধিকার সম্পর্কে আমাদের চিন্তা—আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা।

অন্নদাশঙ্করের লেখায় নারীভাবনার পরিসর স্বল্প তো নয়ই, যথেষ্টই বিস্তৃত। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্প এবং বেশ কিছু উপন্যাস নারী ভাবনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যখন বাংলা ছোটগল্পে জটিল মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-বাস্তবের বিবর্ণতা এবং সংকট ফুটিয়ে তোলবার কাল তখন অন্নদাশঙ্করের রচিত বেশ কিছু মধুর বিধুর প্রেমের গল্প আমাদের কিছুটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে---হয়তো অন্নদাশঙ্করকে চিরকাল কবি ও প্রাবন্ধিক ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত বলে।

শিল্পী অন্নদাশঙ্করের মনে নারীভাবনার প্রথম জাগরণের ছবি আঁকা হয়েছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'বিনুর বই'-এ (১৯৪৪)। স্মৃতি থেকে তিনি উদ্ধার করেছেন তাঁর বালককালের মনটিকে। ছয় সাত বছরের বালক বিনু মন্দিরে যেতে ভালবাসত ; কারণ—"মন্দিরে গেলে যাঁদের দেখা পায় তাঁরা দেবী নন, মানবী।... বেশী বয়সের মেয়েদের উপরেই তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশী। কারণ তাঁরা বালিকা নন, নারী! রহস্যরূপিনী।" (বিনুর বই, ডি. এম. লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃঃ ১১৪)। আরও এক জায়গায় অন্নদাশঙ্কর বিনু সম্পর্কে লিখেছেন—"তখনো সে দেহসচেতন হয়নি, কিন্তু রূপ-সচেতন হয়েছিল। সাজ-সচেতন, মাধুরী সচেতন। রহস্য সচেতন। (ঐ, পৃঃ ১৫)।

দুটি উদ্ধৃতিতেই 'রহস্য' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। নারীকে ঘিরে এই রূপমুগ্ধতা, মাধুরী-সচেতনতা তথা রহস্যবোধ—নিশ্চয়ই বালকের ততটা নয়, যতটা ছিল তরুণ অন্নদাশঙ্করের নিজের। এই রূপমাধুরী-মণ্ডিত রহস্যবোধের অনুভূতি থেকেই কিন্তু নারীকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এক অবাস্তব কল্পলোকে। রোমান্টিক কবিরা অনেকটা তাই করেছিলেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবির লেখাতেও আমরা পেয়েছি—"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী / পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি / আপনি অন্তর হতে —' , 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' ইত্যাদি পঙক্তি। এই মনোভঙ্গি নারীকে পুরুষের সমান অধিকারের জায়গা ছেড়ে দেয় না ; নারীকে পুরুষের ভালো লাগার ও ভালোবাসার সম্পদ বলেই ধরে নেয়, নারী হবে বিশেষ করে, আলাদা করে সুন্দর—মাধুর্যময়ী। পৃথিবীর সব ক্লান্ত-প্রাণ পুরুষের জন্য মেলে ধরবে পাখির নীড়ের মত চোখ। কিন্তু হাজার বছর কি নারীকেও অতিক্রান্ত হতে হয়নি। সেই ক্লান্ত নারীর জন্য দু'দণ্ড শান্তির ব্যবস্থা করবে কে—তার উত্তর জীবনানন্দ দেননি। বোধহয় ভাবেনওনি। যে-কোনো নারীর চরিত্রে, বিশৃঙ্খলা, অসজ্জিত, অসুন্দর, দুর্নীতি-আসক্ত জীবনযাপনের

প্রবণতা থাকতে পারে। বাস্তবে এমন নারী অনেকই দেখা যায়। তেমন হলে সমাজ-বিধি অনুসারে নারীকেও সেই ইচ্ছা ও অভ্যাসের দায় তথা শাস্তি ভোগ করতে হবে — এরকম ভাবনাই যথার্থ সম-অধিকার ভাবনা। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের লেখায় এই ভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করা হয়নি। খুব কম লেখকই বিষয়টিকে এভাবে দেখেছেন। সে লেখক পুরুষ বা নারী—তাতে বিশেষ পার্থক্য হয়নি।

পুরুষের চোখে নারীকে দেখার অভ্যাসের মধ্যে এই রূপবোধ ও রহস্যবোধ জড়িত থাকার কারণেই সমাজে-সংসারে পুরুষ ও নারীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানগত তল নির্দিষ্ট হয়ে আছে বহুকাল থেকে। সাহিত্যে দেখি তারই প্রতিফলন। অন্নদাশঙ্কর রায় তরুণ বয়সের লেখা একটি প্রবন্ধে বলেছেন—"পুরুষের চরিত্র তার ঐশ্বর্য্যে, নারীর চরিত্র তার মাধুর্য্যে।" ('সতী যতি', তারুণ্য, ডি. এম. লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৮, পৃঃ ৬০ : প্রথম সংস্করণ, প্রকাশ পায় ১৯৩০-এ)। প্রশ্ন তোলা যায়—কেন মাধুর্যেই কেবল নারীর চরিত্র লক্ষণ নির্দেশ করলেন তিনি? ঐশ্বর্যের প্রত্যাশা কেবল পুরুষের কাছেই কেন থাকবে? কিন্তু আসলে বোধহয় লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এটাই—'ঐশ্বর্য' ও 'মাধুর্য'—দুটি শব্দেরই ভাবগত ব্যঞ্জনা অত্যন্ত 'সাবজেক্টিভ্'—শব্দগুলি কোনো বস্তুগত সামান্য ধারণা জাগাতে অক্ষম।

এই প্রবন্ধে লেখার কালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের (জন্ম ১৯০৪) বয়স পঁচিশ মাত্র। এই প্রবন্ধ থেকে এমন সিদ্ধান্তও আমরা গ্রহণ করতে পারবো না যে নারীর ক্ষেত্রে যে স্বতন্ত্র অবস্থানে ধারণা তাঁর মনের মধ্যে ছিল তা কোনো অর্থেই হীনতা-ব্যঞ্জক। এই মাধুর্য-বলয়ের কেন্দ্রস্থিত নারীকে তিনি পরম সমাদরে সম্মানের আসনই দিয়েছিলেন। আমাদের বলবার কথাটি কেবল এই—সেই অবস্থান পুরুষের সম-তলবর্তী নয় এবং ঈষৎ রোমান্টিকও বটে—একটু বা—স্পষ্ট (vague)।

কিন্তু আমাদের যথেষ্ট আলোড়িত হতে হয় যখন দেখতে পাই এই রোমান্টিক মনোভঙ্গির পাশাপাশি আমাদের সমাজে এবং বিশ্বের অন্যত্র নারীর প্রকৃত অবস্থান কেমন সে বিষয়ে অত্যন্ত অল্প বয়সেই কি প্রখর বাস্তব দৃষ্টি তিনি অর্জন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনটি অতীব মূল্যবান প্রবন্ধের আলোচনা করা জরুরি। 'পারিবারিক নারীসমস্যা' এবং 'নানাকথা' প্রবন্ধ দুটি লিখিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে। তৃতীয় প্রবন্ধটি 'নারীর মূল্য' ১৯২৪ সালে। এই প্রবন্ধটি শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' গ্রন্থের ভিত্তিতে একটি আলোচনা। ঠিক মৌলিক প্রবন্ধ না হলেও নারী সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের অনেক নিজস্ব অভিমত এই লেখাটিতে পাওয়া যাবে। তিনটি প্রবন্ধেরই উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ সংকলন (ডি. এম. লাইব্রেরী) থেকে।

এই তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এক বিশ বৎসর অতিক্রান্ত তরুণ। এই প্রবন্ধগুলির—বিশেষত প্রথম দুটি প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে সঞ্চিত আছে আমাদের বিস্মিত করে দেবার উপাদান। আবার কোথাও কোথাও তাঁর যুক্তি-পদ্ধতির সঙ্গে ঈষৎ মতভেদও ঘটে। কিন্তু ১৯২৩-২৪ সালের পক্ষে কি অসম্ভব অগ্রসর চিন্তার অধিকারী

ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় তা অনুভব করবার জন্য প্রবন্ধগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধটিতে নারীর পারিবারিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা এবং সেই সূত্রে নারীর সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানের দিকগুলির চিন্তা করা হয়েছে। পরিবারকে এখানে তিনি সমাজতত্ত্ববিদদের মতোই সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন।

লেখকের প্রথম সিদ্ধান্ত ঃ "স্ত্রী-পুরুষই যখন পরিবার গঠন করে, তখন স্বামীর উপরে থাকে অর্থসংগ্রহের ভার, স্ত্রীর উপর থাকে অর্থ ব্যয়ের। তাই নারীকে কোনোকালে স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে হয় না, স্বামীর অভাবে পরিবার চালাবার সামর্থ্যও অর্জন করতে হয় না, এইটেই তার যত দুঃখের কারণ।" (পৃঃ ৬৬৩)।

লেখকের সিদ্ধান্তটির সীমাবদ্ধতাগুলি আগে আমরা দেখে নেবো। প্রথমত, সংসারে পুরুষ উপার্জন করে এবং নারী ব্যয় করে এই পরিস্থিতির ব্যতিক্রম আছে। বিশেষত অভাবী নিম্নবর্গীয় পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়েই উপার্জনকর্মে চিরকাল ব্যাপৃত থাকে, অনেক সময়ে নারীই উপার্জন করে, পুরুষ কর্মহীন জীবন যাপন করে। মধ্য ও উচ্চবর্গেও স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ উপার্জনে চালিত পরিবার এখন অনেক। তবে ১৯২৩-২৪-এ কমই ছিল। দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা এইসব পরিবারেই নারীর হাতে অর্থব্যয়ের ভার থাকে না। এযুগেও উপার্জনকারী পুরুষটিই পারিবারিক ব্যয়ের একটি নিয়ন্ত্রণ করে—এমন প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের বক্তব্যের মূল কথাটি—অর্থাৎ নারী উপার্জন করে না—আধুনিক সমাজের মধ্যবিত্ত বর্গের পরিবারগুলির ক্ষেত্রে আজও অনেকখানি সত্য। কাজেই নারীর দুঃখের প্রধান কারণ যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের সুযোগহীনতা—এই মোটা কথাটাকে প্রথমেই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি পরবর্তী কোনো কোনো সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করে নিয়েছেন। যেমন—"স্বামীর কাছে যে সে ভালোবাসা পায় সে তো কামুকের ভালোবাসা, বড় জোর ছেলের মা বলে কিংবা গৃহিণী বলে ভালোবাসা। এ ভালোবাসা না পেলেও তাকে স্বামীর মন জুগিয়ে চলতেই হবে, অন্য উপায় নেই, স্বামীর অভাবে সে যে নিরুপায়, তার সন্তানগুলি অনাথ"। (পৃঃ ৬৬৪) স্ত্রীর ভালোবাসা ও এই পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম হতে পারে না এই সত্যটুকু লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।—"সেও তার স্বামীকে যে ভালোবাসা দেয় তার কতখানি নিজের ও নিজের সন্তানদের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত, কতখানি লোকনিন্দার খাতিরে দেওয়া, আর কতখানিই বা খাঁটি, তা কে জানে?" (পৃঃ ৬৬৪)। এজাতীয় পরিস্থিতিতে খাঁটি ভালোবাসার কোনো ধারণাই গড়ে উঠতে পারে না এই সত্যটি একটু নরমভাবে হলেও স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন তরুণ লেখক।

আমাদের মনে পড়ে তাঁর সুপরিচিত একটি ছড়া। সপরিহাস শ্লেষে তিনি লিখেছেন—

করেছি পণ নেবো না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী,
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
মানতে হল দরকারটা
উভয়তেই আর্থিক—
স্বর্ণের নাম সুন্দরী আর
মাইনের নাম কার্তিক।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে তিনি যথার্থভাবেই নির্দেশ করেছেন যে, নারীর উপার্জনে অক্ষমতার কারণেই নারীসংক্রান্ত যাবতীয় সামাজিক কুপ্রথায় উদ্ভব।— "বাস্তবিক নারীর অক্ষমতার উপর নির্ভর করে কত কুপ্রথার যে সৃষ্টি হয়েছে, বলে শেষ করা যায় না। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহে বাধা, বরপণ, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, স্ত্রী বিনিময়, সহমরণ, অবরোধ, বিবাহ ভঙ্গে বাধা, স্বামী সৌভাগ্যের চিহ্ন ধারণ, 'কন্যাদান', 'স্বামীসেবা', 'বিবাহ', 'স্বামী' প্রভৃতি অপমানকর শব্দের উৎপত্তি,— আর কত বলব?" (পৃঃ ৬৬৭)।

লেখকের পরবর্তী সিদ্ধান্ত ১ "এক আর্থিক স্বাবলম্বন দিয়ে বিরাট নারীসমস্যার মীমাংসা হতে পারে।" এই সিদ্ধান্তটা অনেকদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য কিন্তু সবটা নয়। আজকের পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে যে আর্থিক স্বাবলম্বিতাও নারীকে সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেনি। তার কারণ সন্ধান করতে গেলে অত্যন্ত স্থূল ও জৈবিক একটি সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য থাকতে হয় আমাদের। তা হল এই—শারীরিক শক্তিতে নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল। উপার্জনকারিনী স্ত্রীকেও স্বামী শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। স্ত্রীর পক্ষে তা প্রতিরোধ করা কঠিন। নিম্নবর্গীয় সমাজে এ জিনিস খুব বেশিই দেখা যায়। নির্যাতন সহ্য করেও স্বাবলম্বী নারী স্বামীকে ছেড়ে যায় না কেন—এ প্রশ্নের উত্তর সরল। খানিকটা আবহমান সংস্কারবশে কিন্তু অনেকটাই বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে। স্বামীকে ছেড়ে যাওয়া নারীর দিকে এগিয়ে আসে বহু পুরুষের লোভের হাত। প্রাকৃতিক নিয়মে নারীর শরীর তার অনিচ্ছাতেও ভোগ করা পুরুষের পক্ষে সম্ভব—শারীরিক ক্ষমতার ন্যূনতার কারণে নারীর বাধাদান নিষ্ফল হয়। এছাড়াও আছে সন্তানকে গৃহবিচ্ছিন্ন কারবার ও পিতৃসান্নিধ্য থেকে দূরে নিয়ে যাবার সমস্যা ও দায়ভার। এত অসুবিধা সত্ত্বেও নারী অপমানের বিবাহ ভেঙে আজকাল বেরিয়েও তো যাচ্ছে। যাচ্ছে স্বাবলম্বনেরই ভরসায়, অথবা উপযুক্ত নিরাপদ কোনো আশ্রয় থাকলে তবেই। কাজেই আর্থিক স্বাবলম্বন নারীসমস্যার সব মীমাংসার পথ করে দিতে না পারলেও অনেকটা ফিরিয়ে দিতে পারে তার সম্মানের স্থান—লেখকের এ সিদ্ধান্তেও কোনো ভুল নেই।

তরুণ লেখক এই প্রবন্ধে বিবাহ তথা পরিবার গঠন সম্পর্কে একটি আধা-রোমান্টিক

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নরনারীর প্রণয় সম্পর্কে এক আবেগ-গাঢ়, আদর্শায়িত ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছে এই অভিমত। তিনি বলেছেন ঃ 'দুটি সর্বথা স্বাধীন যুবক-যুবতী যাদের মধ্যে একমাত্র বাঁধন প্রেমের একনিষ্ঠতা তারাই যেন পরিবার সৃষ্টি করে। ..... প্রণয়ভঙ্গ হলেই বিবাহচ্ছেদ করতে হবে, আর সেজন্যে প্রস্তুত থাকাও চাই।" (পৃঃ ৬৬৪, ৬৬৫)। লেখকের এই সিদ্ধান্তটি কিছু অবাস্তব। সর্বদা কাঙ্ক্ষিতও নয়। পারস্পরিক প্রয়োজনবোধ তথা কিছুটা স্বার্থসংযোগ থেকে একেবারে মুক্ত 'একনিষ্ঠ প্রেম' অসম্ভব না হলেও খুবই বিরল। বস্তুত পরিবার গড়ে ওঠার প্রথম মুহূর্তটি থেকেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বাধ্যবাধকতা খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। 'একনিষ্ঠ প্রেম' নর-নারীর মধ্যে এক সময়ে থাকলেও কিছুকাল পরে, অনেক সময়ে বিনা কারণেও 'একনিষ্ঠ প্রেম' স্তিমিত বা অবসিত হয়ে যেতে পারে। 'ফল ইন্ লাভ্'-এর মত 'ফল্ আউট্ অভ্ লাভ্' বাক্যবন্ধটি পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত আছে। একনিষ্ঠ প্রণয়ভাবে না থাকলে শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, মমতা, সখ্য, নিরাপত্তাবোধ, বিভিন্ন দায়িত্ব, এমনকি অভ্যাসবশতও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিতে থাকতে পারে। বাস্তবে অধিকাংশ দাম্পত্য সম্পর্ক এই সব কারণেই টিকে থাকে। এইভাবে পরিবার অবিচ্ছিন্ন রাখার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই, বরং সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পরিণত জীবনবোধেরই পরিচয় আছে। বহু নারী পুরুষের জীবনেই প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্ক ঘটে যায় ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গী বা সাঙ্গনীর সঙ্গে। স্ত্রী প্রণয়িনী থাকে না। স্বামী হয় না প্রণয়ী। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর ভিন্ন প্রেমিক বা প্রেমিকা থাকতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর জ্ঞাতসারেও সেসব ক্ষেত্রে অনেক সংসারই ভাঙে না। সর্বক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়া কাঙ্ক্ষিতও নয়।

প্রেমহীন পারিবারিক বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখবার সবচেয়ে বড় কারণ সন্তান। অন্নদাশঙ্কর রায় যেখানে 'প্রণয়ভঙ্গ হলেই বিবাহচ্ছেদ করতে হবে' বলেছেন সেখানে সন্তানের প্রসঙ্গটি অনালোচিত রাখেননি। এবং এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তটি কিছু একপেশে হয়ে পড়েছে--- 'সন্তানের জন্মদানে পিতামাতা উভয়েরই দায়িত্ব সমান হলেও মায়ের সঙ্গে সন্তানের নিকটতর সম্বন্ধ। মা-ই তাদের বেশি ভালবাসে। পশুপাখিদের মধ্যেও দেখি, মাতার উপরে শিশুর ভার। প্রকৃতির যেন উদ্দেশ্যই এই যে, জন্মদাত্রীই সন্তানের পালিকা হবে। তাই পুরুষের উপর নির্ভর না করে এবিষয়ে নিজেরই প্রস্তুত থাকা উচিত।" (পৃঃ ৬৬৫)

স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটি নারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভার হয়ে পড়ছে। লক্ষণীয় যে সন্তানের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনে বিবাহ-বিচ্ছেদে পরেও পুরুষ অন্ততঃ আংশিক ব্যয় নির্বাহ করবে---এমন প্রস্তাবও লেখকের নেই। সন্তান পালন সম্পূর্ণতই জননীর দায়—একথা বলেছেন তিনি। এখানে একটি পরিষ্কার স্ববিরোধের ছবি পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে তাঁর যুক্তি বা উদাহরণটিও অ-সিদ্ধ। মানুষের পৃথিবী নিসর্গ-জগতের নিয়মে চলে না। পশু-পাখির সন্তান পালনে টাকার খরচ নেই। কিন্তু মানুষী মা-কে সন্তানের জামা-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকৃতির জীবনে প্রাণধারণ ও বংশবিস্তার মাত্রই অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। মানব সভ্যতার মাপকাঠি আলাদা—তার বিবাহ আছে, পরিবার আছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংকট আছে। পশুপাখির যৌনাচার আর মানুষের 'প্রণয়' সর্বাংশে এক নয় বলেই এই পারিবারিক সমস্যার উৎপত্তি।

এই বিভ্রান্তি কেন লেখককে আচ্ছন্ন করল তা ভাবতে গিয়ে দেখি মানুষের শিক্ষাগত ও আবাসিক সংস্কার থেকেই এই স্ববিরোধের জন্ম। তিনি বলেছেন—'......মাতৃত্ব বহুমূল্য হলে তাতে নারীর গৌরবই প্রতিষ্ঠিত হবে, মাতৃত্বের যথার্থ মহিমাই ফুটে উঠবে। .... নিজের চেষ্টায় সন্তানকে মানুষ করার যে সুখ সেই তো মাতৃত্বের মহিমাময় গৌরব।'' (পৃঃ ৬৬৬)

এই ধারণাটি মানবিক সংস্কার মাত্র। নারীকে সন্তান ধারণে ও পালনে নিয়োজিত রাখার জন্যই পুরুষ এই 'মাতৃত্ব-মহিমা'-র ধারণাটিকে যতরকম ভাবে সম্ভব দৃঢ়মূল করার চেষ্টা করেছে। যে পশুপাখিদের দৃষ্টান্ত অন্নদাশঙ্কর আগে দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাতৃত্ব কোনো 'গৌরব' নয়, একটি জৈবঘটনা মাত্র। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিশুজন্ম একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। শিশুকে ঘিরে অন্যান্য সব আনন্দ (মেয়ে হলে কোথাও কোথাও দুঃখও), চিন্তা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি মানব মননে সৃষ্টি। সেই মানুষের জগতে নারী-পুরুষের কোনো ভেদ থাকার কথা নয়। 'লব-কুশে বনে ত্যাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা'—এই পঙক্তি নজরুল লিখলেও বাস্তবে ভিন্ন ছবিও দেখা যায়। সমাজের ভয়ে সদ্যপ্রসূত সন্তানকে রেখে মা চলে যায়, বিভিন্ন কারণে শিশু-সন্তানকে ফেলে রেখে গৃহত্যাগ করে নারী—সেই সন্তানকে পালন করে পিতা—এমন ঘটনা একালে অনেক ঘটছে।

তবু বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ১৯২৩ সালে এক উনিশ বছরের তরুণ 'পারিবারিক সমস্যা' প্রবন্ধে নারীভাবনা সম্পর্কে যে প্রগতিশীল ও মুক্তবুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণের স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিস্ময়কর। স্ববিরোধটুকুও নিতান্তই স্বাভাবিক।

এই সময়ে লেখক ভারতীয় সমাজে নারী পুরুষ সম্পর্কজনিত যে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তা অচিরেই দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধে প্রকাশ পেল। 'নানাকথা' (১৯২৩) প্রবন্ধটির প্রথমেই লেখক বললেন—''ভারতের যা কিছু আদর্শ তাতে অর্ধভারতের অংশ নেই, ভারতের নারীকে বাদ দিয়ে আমরা প্রাচীন ভারত গড়েছিলাম, আর সেই প্রাচীন ভারতের ভিত্তির উপরে নূতন ভারতের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি।'' (পৃঃ ৬৬৯)। এরপর তিনি মানব সভ্যতায় প্রেম, বিবাহ, সন্তানজন্ম, নবীন প্রজন্ম সৃষ্টির দায়িত্ব—ইত্যাদি প্রসঙ্গে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। বিশেষভাবে নারীর সমস্যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। সভ্য সমাজের সৃজনে নর ও নারীর সম-দায়িত্বের কথাই তিনি বলেছেন। বলেছেন, প্রেমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে তবেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত ; প্রণয় অন্তর্হিত হলে বিবাহ-বিচ্ছেদই কাম্য ; সন্তানকে গড়ে তোলবার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই যেন সন্তানকে পৃথিবীতে আনা হয়। পরিবার গড়ার তথা সমাজ গড়ার কাজে নর ও নারীকে সমান

জমিতেই অন্নদাশঙ্কর রায় দেখতে চেয়েছেন—এই দৃষ্টিভঙ্গিই এই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। পুরুষের তুলনায় নারীকে সামাজিক ভাবে অবনমিত থাকতে হয়—এ সত্য স্বীকার করে তিনি এ অবস্থার প্রতিকার প্রত্যাশা করেছেন।

'নানাকথা' প্রবন্ধটি অনেকটাই আদর্শায়িত প্রত্যাশার উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সামান্য পরে রচিত 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটিতে আবার ভারতীয় নারীদের প্রকৃত সামাজিক অবস্থার বিষয়টি ফিরে এসেছে। এই রচনাটি শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' গ্রন্থের আলোচনা। সুপ্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকের অসামান্য (সেকালের পক্ষে) এই গ্রন্থটি তরুণ অন্নদাশঙ্করকে স্বাভাবিকভাবেই আলোড়িত করেছিল। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন এবং সর্বতোভাবেই শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। প্রসঙ্গগুলি যেখানে সহমরণ-প্রথা, বিধবাদের সামাজিক অবস্থা, বহুবিবাহ, যুগে যুগে নারীর উপর পুরুষের অধিকার ও ভোগদখল বজায় রাখার চেষ্টা—সেসব জায়গায় কোনো মতভেদ বা বিতর্কের অবকাশ ওঠে না। কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন জেগে ওঠে যখন অন্নদাশঙ্কর পুরুষের ও নারীর ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যিক গুণ (essential quality) আছে বলে ধরে নেন। তাঁর ভাষায়—"যতগুলি quality (গুণ?) কেবল নারীতেই বিরাজিত এবং accidentally নয়, essentially বিরাজিত তাঁদের সমষ্টিকে নারীত্ব বলা চলে। এমনি একটি সমষ্টি পুরুষত্ব, আর একটি মনুষ্যত্ব, আর একটি পশুত্ব ; ...." (পৃঃ ৬৮২)। এরপর তিনি পুরুষের বিশেষ গুণ 'বল' বা দৈহিক শক্তি এবং নারীর বিশেষ গুণ 'রূপ' বা দৈহিক সৌন্দর্য বলে নির্দেশ করাতেই বিতর্কিত প্রশ্নগুলি উঠে আসে। শরৎচন্দ্র পুরুষের দৈহিক বল ও নারীর রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু এই দুটি বস্তুকে পুরুষ ও নারীর 'এসেনশিয়াল' লক্ষণ বলে উল্লেখ করেননি। আসলে 'পৌরুষ' ও 'নারীত্ব' কয়েকটি শারীরিক লক্ষণ মাত্র। মননের জগতে 'পৌরুষ' ও 'নারীত্ব' বলে কিছুই হয় না। 'বল' ও 'রূপ' ও যথার্থ লক্ষণ নয়—'এসেনশিয়াল' তো নয়ই। দৈহিক শক্তি না থাকলে পুরুষ কি পুরুষ হবে না। নাক চোখের সুগঠন না থাকলে নারীর নারীত্ব বর্ধিত হবে না? পশু-পাখির জগতে সাধারণতঃ 'রূপ' পুরুষ পশু ও পুরুষ পাখিদের থাকে। 'রূপ'-কে নারীত্বের 'আবশ্যিক গুণ' বলার মধ্যে চিন্তার আংশিকতা খানিকটা আছেই। এর একটি কারণ নিশ্চয়ই লেখকের অল্প বয়স। কিন্তু কারণটি সম্ভবত নারীকে রোমান্টিক ও আদর্শায়িত দৃষ্টিতে দেখবার প্রবণতা। যে-প্রবণতা অন্নদাশঙ্করের নারী-ভাবনাকে বহুদিন পর্যন্ত কিছু না কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

'নানাকথা' প্রবন্ধটির এক জায়গায় লেখক বলেছেন ঃ "রহস্যময়ী নারীকে জানবার জন্য পুরুষ-হৃদয়ের যে অদম্য আকুতি, নারীকে অর্ধেক মানবী ও অর্ধেক কল্পনা বলে sphinx রূপে প্রতীক গড়ে সে ব্যাকুলতার পরিচয় সে যুগ যুগ ধরে দিয়ে আসছে।" (পৃঃ ৬৬৯)। নারী সম্পর্কে কুড়ি বছর বয়সে অন্নদাশঙ্করের মনে এই ধারণাটি ছিল (হয়ত এখনও আছে)—যে পুরুষের চোখে নারী 'রহস্যময়ী' এই অভিমত তাঁর বহু লেখায় পাওয়া যাবে। আর কৌতূহলী হয়ে আমরা লক্ষ্য করি—নারীর বাস্তব

পরিস্থিতিজনিত নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা এবং এই কল্পনাময় নারীভাবনার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম টানা-পোড়েনের খেলাও যেন চলতে থাকে তাঁর চিন্তাপ্রবাহে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি বাংলার মানুষের যে শ্রদ্ধা তার মূলে আছে চিন্তাবিদরূপে তাঁর অসংশয় সততা। এই সততাই তাঁকে নিজের যুক্তি ও অভিমতগুলি সম্পর্কে বারবার ভাবিয়েছে। অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভাবনাকে মেলাতে গিয়ে যেখানেই তাঁর দ্বিধা জেগেছে সেখানেই তিনি আবার চিন্তা করেছেন, কখনো কখনো তাঁর ভাবনা পরিবর্তিতও হয়েছে কিছু কিছু। 'বিনুর বই'-এ তিনি বিনু তথা নিজের সম্পর্কে লিখেছেন—"তার নিজের সংস্কারগুলো একে একে কাটল। বিধবা-বিবাহকে সে ভয় করত। ভয় ভাঙল। বিবাহ-বিচ্ছেদকে সে ঘৃণা করত। ঘৃণা ঘুচল। বিবাহ প্রথাটাকে শাশ্বত ভাবত। কোনো প্রথাই শ্বাশত নয়। .... সতীত্বকে স্বর্গীয় মনে করত। দেখল ওর মধ্যে সাড়ে পনের আনা বাধ্যতা ও দাস্য। যেটুকু স্বেচ্ছা সেইটুকুই মূল্যবান। বিবাহ প্রথার বিলয় হলেও সেটুকু থাকবে।" (বিনুর বই, ডি. এম. লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৪, পৃঃ ৩১)।

'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধটিতেও বিবাহপ্রথা সম্পর্কে তাঁর এমত বাক্য আছে—"বিবাহ তো যৌন মিলনের নির্লজ্জতা ঢাকা দেবার একটা ভাবের আবরণ মাত্র।" (পৃঃ ৬৬৭)। কিন্তু বিবাহ কোনো ভাবের আবরণও নয়। সব বিবাহ একটি নারী ও পুরুষের একত্রবাস ও পরিবার-গঠন সম্পর্কিত সামাজিক চুক্তিরই কোনো-না-কোনো রূপ—এই সত্যটি অন্নদাশঙ্কর তেমন ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। এই প্রবন্ধটির শেষে লেখক বলেছেন—"তাই যেদিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীর সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষের স্বেচ্ছামিলন হবে, ... সেদিন হয়তো বিবাহবন্ধনে আবশ্যক হবে। সেদিন স্বাধীনতার চরম বিকাশের দিন। দায়িত্ববোধেরও পূর্ণ পরিণতির দিন" (পৃঃ ৬৬৮)।

প্রণয়ের ভিত্তিতে নর-নারীর স্বেচ্ছা-মিলন যে প্রথাসিদ্ধ বিবাহের বন্ধনের চেয়ে উন্নততর—এমন কথায় অন্নদাশঙ্কর এই অংশে বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে সামাজিক বিধি সম্পর্কিত মনোভাব সংস্কারে পরিণত হয় যে মনন-বিশ্লেষণের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও আমরা মনস্থির করতে পারি না সব সময়ে। তেমনই একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় অন্নদাশঙ্করের একটি উক্তিতে। ১৯৬০ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। রামানন্দ সম্পর্কে একাধিক স্মৃতির উল্লেখ করতে করতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—"মহাবিপদে ফেললেন তিনি আমাকে যখন বললেন যে মাইকেলের দ্বিতীয় পত্নী বিবাহিত ছিলেন না।" (দেখা শোনা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৫, পৃঃ ৪৪)। তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিটি আমাদের চকিত করে। মাইকেল ও হেনরিয়েটা প্রথাসিদ্ধভাবে পরিণীত হন নি—তাতে বিপদের কথা কোথা থেকে আসে। প্রথমা পত্নী রেবেকাকে ত্যাগ করেছিলেন মধুসূদন প্রণয়-সম্পর্কের অবসানে। সন্তানদের মানুষ করবার ভারও নেননি। তা সত্ত্বেও মধুসূদন আমাদের কাছে শ্রদ্ধাই পেয়ে এসেছেন

চিরকাল। বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীরা চরিত্রহীনতার অপবাদও তাঁকে দেননি। তাহলে বিপদ কোথায়?

আবার গ্যেটে সম্পর্কে রচিত অন্য একটি প্রবন্ধে বিবাহ-বন্ধন সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের ভিন্ন মনোভাবের আভাস পাই। সঙ্গিনী ক্রিস্টিয়ানাকে দীর্ঘকাল গ্যেটে পত্নীর মর্যাদা দেননি। অন্নদাশঙ্কর এই অ-বিবাহ সমর্থনই করেছেন। গ্যেটের পক্ষে তাঁর যুক্তি হল---খ্রিস্টীয় বিবাহে কঠোর প্রতিজ্ঞা-বাক্য সেজন্য উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। সত্য থেকে বিচ্যুতি হওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। খ্রিস্টীয় বিবাহের কঠোর প্রতিজ্ঞাবাক্য সেজন্য উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। অথচ পরবর্তীকালে গ্যেটে ভিন্ন আচরণ করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধেই পাই--"পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে গ্যেটে নিজের থেকেই তাঁদের সম্পর্ক বিধিবদ্ধ করে নেন।" ('গ্যেটে', আধুনিকতা, ডি. এম. লাইব্রেরি, চৈত্র, ১৩৯৫)। পুত্রের ভবিষ্যৎ-ভাবনার সময়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা আর সত্যবদ্ধ থাকবার সংকল্পের মধ্যে বিরোধটাকে তাহলে চাপা দিয়েছিলেন গ্যেটে যা খ্রিস্টীয়ানার সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি করেননি।

আসলে অন্নদাশঙ্কর গ্যেটের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে গ্যেটের প্রথমে বিবাহ না করবার কারণটি ঠিকমতো উপস্থাপিত করেননি। কিন্তু কারণটি বেরিয়ে এসেছে ঐ প্রবন্ধেরই একটি প্রাসঙ্গিক উক্তিতে। "খ্রিস্টিয়ানার দিক থেকে বিবাহের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি জানতেন যে অভিজাতের সঙ্গে শ্রমিকের বিবাহ সেকালের সমাজ সহ্য করত না।" কাজেই খ্রিস্টিয়ানাকে গ্যেটের বিবাহ না করা কোনো সত্যবদ্ধতার আদর্শের জন্য নয়; নিতান্তই সমাজের অননুমোদনে---এমনও হতে পারে।

গ্যেটের প্রতি অন্নদাশঙ্করের প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ প্রগাঢ়। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্-কালীন জার্মানিতে রোমান্টিকতার সংরক্ত বর্ণচ্ছটা যাঁর রচনার সমুজ্জ্বল হয়ে ইউরোপকে আলো দিয়েছিল তিনিই গ্যেটে। তাঁর নারী ভাবনার সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর নিজের ভাবনার সহযোগ খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্যেটের লেখায় অতীন্দ্রিয় প্রেমের অনুভব এবং নারীর মহিমান্বিত রূপ অনিঃশেষ প্রশস্তি পেয়েছে। অন্নদাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় ভাগের শেষ পঙ্‌ক্তি অর্থাৎ অন্তিম পঙ্‌ক্তির ভাব-গরিমা—

The eternal womanly
draws us above.

ব্যক্তিগত জীবনে খ্রিস্টিয়ানাকে যেভাবেই গ্রহণ করে থাকুন, এই 'ইটার্নাল ওম্যান'-এর প্রশস্তিতে গ্যেটে আন্তরিক ছিলেন না---এমন কথাও আমরা বলতে পারব না। আসলে গ্যেটের নারী-সম্পর্কিত ভাবনাটাই সম্পূর্ণ বাস্তব পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। ছিল মূলতঃ আদর্শায়িত, রোমান্টিক, অতিলৌকিক গৌরববোধে কিছু সমাচ্ছন্ন। সমাজে নারীর বাস্তব অধিকারের স্বীকৃতির দিকটা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটু চাপা পড়ে। এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল অনেকদিন। 'সবুজপত্র'-এর যুগ থেকে তা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন অনেকটা।

সমাজ ও সংসারে নারীর অধিকারের সীমানা কতটা সংকুচিত সে বিষয়ে অবশ্য অন্নদাশঙ্কর যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। আমরা এর আগে আলোচিত তিনটি প্রবন্ধেই তার নিদর্শন দেখেছি। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে যে বইটি লিখে তিনি খ্যাতির শিখরে সমাসীন হয়েছিলেন সেই 'পথে প্রবাসে'তে বারবার এসেছে বাঙালি সমাজের মেয়েদের প্রসঙ্গ। বাংলার বাইরে গিয়ে প্রথমে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত, পরে ইংল্যান্ড-এর মেয়েদের দেখে তাঁর বারবার মনে পড়েছে সামাজিক জীবনে বাংলার মেয়েদের আবদ্ধতা ও জড়তার কথা। বইটির প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকেই তিনটি উদ্ধৃতি দেখা যাক—

১. "এদেশে অবরোধ-প্রথা নেই, পথে ঘাটে সুবেশা সুকেশীর সাক্ষাৎ মেলে—'সুকেশী', কারণ এদেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না, বিধবারা ছাড়া। এদেশের জীবননাট্যে নারীর ভূমিকা নেপথ্যে নয়। দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না করে পুরুষকে সহজ হবার সুযোগ দিয়েছে।"

২. "কানাড়ী মেয়েদের অবরোধ নেই। তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই মতো কঠিন খাটছে, এমন দেখা গেল। .... ছাব্বিশ জন পুরুষের মাঝখানে হয়তো একজন মেয়েও খাটছে, 'লজ্জাসরম নেই! নারী যে কর্মসহচরীও।"

৩. "মারাঠা মেয়েরা কর্মী-প্রকৃতি। তাদের অবরোধ নেই, তরুণীরা পায়ে হেঁটে স্কুল কলেজ যাচ্ছে,....কত মেয়ে একাকী ট্রামে উঠছে, ট্রেনে বেড়াচ্ছে, ভয়ডর নেই, পুরুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার।"

সমকালের বাংলার মেয়েদের তুলনায় দক্ষিণ ভারত, মহারাষ্ট্র, গুজরাতের মেয়েদের পথে ঘাটে অপেক্ষাকৃত মুক্ত চলাফেরার দিকটি স্বাভাবিকভাবেই অন্নদাশঙ্করের ভালো লেগেছিল। অবশ্য সহজে পথে চলতে পারত বলেই যে ঐ সব অঞ্চলের মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার পেয়েছিল এমন নয়। বিবাহ, পণপ্রথা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দিকগুলি খতিয়ে দেখলেই তা বোঝা যেত। তবে 'পথে প্রবাসে' সে জাতীয় সমাজ বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ নয়। আর, সে সময়ের বাঙালি মেয়েরা ঐ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাও পেতেন না—এ সত্যও স্বীকার্য।

ইংল্যান্ডের মেয়েদের কথা এই গ্রন্থে বলেছেন অন্নদাশঙ্কর। সেখানে গৃহিনীদের শ্রমশীলতা, নিজেরে সংসার গড়ে তোলবার আন্তরিকতা, একান্নবর্তী পরিবারের চাপ নেই বলে তাদের স্বাধীনতা, সংসার-নির্বাহে যন্ত্রের সহায়তা থাকার ফলে নিজেদের অবসর পাবার স্বাচ্ছন্দ্য—ইত্যাদির সপ্রশংস উল্লেখের পর লেখক বলেন—"নারীর আভা-মণ্ডল হচ্ছে নারীর পরিচ্ছদ. নারীর গৃহ"। (পথে প্রবাসে, এম. সি. সরকার, অষ্টম সংস্করণ ১৯৫৯, পৃঃ ৯০)।

নারী সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি আবারও এই মন্তব্যে ধরা পড়ে। সে দৃষ্টি নারীর প্রতি অতীব সংবেদনশীল ও শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু তা পুরুষের সঙ্গে নির্বিশেষ নয়। নারীর স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিত্বের বিকাশকে তিনি পুরুষেরই পূর্ণতর প্রাপ্তি রূপে দেখেছেন। "নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজেব চোখের জ্যোতিকে নিজের

হাতে নিবিয়েছে।" (ঐ, পৃঃ ৪২)—একথা বলেছেন তিনি 'পথে প্রবাসে' গ্রন্থে। কিন্তু পশ্চিমের দেশের পুরুষেরা শ্রমিক নারীর পারিশ্রমিক পুরুষের সমান করবার ব্যাপারে, এবং নারীকে ভোটাধিকার দানে অস্বীকৃত ছিল—এই তথ্যগুলি তাঁর ভাবনায় উঠে আসেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে নারীবাদী চেতনা যেভাবে মানুষকে ভাবিয়েছে -- ১৯৩০-৩১ সালের এক বাঙালি যুবকের কাছে সেই দৃষ্টিকোণ আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতে পারি না. এই কথাটি মনে রাখলে কিন্তু 'পথে প্রবাসে'র কোনো কোনো অংশে নারীর অধিকার বিষয়ে এমন কিছু ভাবনার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় যা আজকের নারীবাদীদেরও চমকে দেবে। অন্নদাশঙ্কর যদি কথাগুলি আজ বলতেন তাহলে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। কিন্তু ১৯৩০-এ এক বাঙালি তরুণের ভাবনা হিসেবে তা সত্যিই অবাক হবার মতো।

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন - অপেক্ষাকৃত মুক্ত সমাজে, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই বাইরের কাজে নিযুক্ত --সেখানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের বাইরে এক সখ্য সম্পর্কের বৃত্ত গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। সেই সম্পর্ক রক্ষার অধিকার বিষয়ে তিনি নারী ও পুরুষকে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হতে বলেছেন পরস্পরের প্রতি। সমাজও যেন এ বিষয়ে উদার ও নিরপেক্ষ থাকে। তাঁর উক্তি নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হলেও নারীর সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ সমাজ এ ব্যাপারে চিরকাল পুরুষের চেয়ে নারীর প্রতি কঠোরতর মনোভাব গ্রহণ করেছে। এই দ্বিবিধ মানদণ্ড যেখানে নারী নির্যাতনে পৌঁছে যায় সেখানে সর্বত্রই অন্নদাশঙ্কর রায় প্রতিবাদে তীক্ষ্ণভাষী হয়েছেন। 'পথে প্রবাসে'-র সমকালে ১৯২৮ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে রচিত 'যতি ও সতী' প্রবন্ধে তিনি 'সতী' শব্দের সমার্থক পুরুষাবাচক শব্দের অস্তিত্ব না থাকার উল্লেখ করেছেন। এবং লিখেছেন—"সতীত্বের জন্য নারীকে এতো দাম দিতে হয় যে নারীত্ব দেউলে হয়ে যায়।...সতী-নারীকেও পুরুষ কামিনী বলে ঘৃণা করেছে, নারীর এর বড়ো অপমান কী হতে পারে।" (তারুণ্য, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৫, পৃঃ ৫১)।

সততার সঙ্গে এবং আন্তরিক অন্বেষায় নিজের বিচারবুদ্ধির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন বলে এক একটি বিরল ক্ষেত্র 'পথে প্রবাসে'-তা পাওয়া যায় যেখানে অন্নদাশঙ্করের মানবিকতা সুগভীর সমাজমনস্ক প্রেক্ষিত লাভ করেছে। এক জায়গায় তিনি গৃহের বাইরে নারীর কর্মজগতের কথা বলেছেন—"বিয়ের আগে স্ত্রী যে কাজে বিশেষজ্ঞ হয়েছে, বিয়ের পরে সে কাজটি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক কর্মস্থল থেকে আরেক কর্মস্থলে ঘুরতে থাকা তার পক্ষে মস্ত বড় ত্যাগ, এবং সে ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৬)। 'সে ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি'—কত সহজেই উচ্চারণ করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় কত অল্প বয়সে। তাবৎ বিশ্বের কোনো সমাজই কিন্তু এই সত্যটুকু সহজে হৃদয়ঙ্গম করেনি। নারীকে কর্মক্ষেত্রে সম-অধিকার দেবার আদর্শ ঘোষণা করে সমাজ আজও আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

আমরা ফিরে যাই আবার গোড়ার কথায়। যে যুগে, যে পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অন্নদাশঙ্কর রায় মানসিক ও বৌদ্ধিকভাবে বেড়ে উঠেছিলেন সেখানে নারী ও পুরুষের একেবারে সমান সামাজিক অবস্থানের ছবিটি দেখা, অন্তত বিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে, তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপরন্তু রোমান্টিক মানসিকতার উত্তরাধিকারও কিছুটা ছিল—তা আমরা দেখেছি।

অন্নদাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির কাউকেই নারী-পুরুষের সামাজিক সম-অধিকার নিয়ে ভাবিত হতে দেখা যায় না। নারীত্বের বিশেষ অধিকারটুকু বৃত্তের মধ্যেই তারা পূর্ণতার স্বাদ পায়। তাঁর নায়িকারা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিযোগিনী নয়। তারা তাদের নারীত্বের রহস্য মাধুর্যময় দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। পুরুষের পাশে তারা হীনপ্রভ নয় কোথাও। পুরুষ কোথাও তাদের অসম্মান করেনি বা দুর্বলতর প্রজাতি বলেও ভাবেনি। কিন্তু ভাবনায়, কর্মে, নাগরিক ও সামাজিক অধিকার প্রয়োগে নারী ও পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র যে সম্পূর্ণ সমান হবে—এরকম কোনো দাবি বা প্রশ্ন তাঁর কথাসাহিত্য থেকে উঠে আসে না। অন্নদাশঙ্কর রায় সে জাতীয় লেখক নন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অসমাপিকা'-র (১৯৩০) নায়িকা সুরুচি বিবাহের পূর্বেই শিশুসম্ভবা হয়েছিল। তার স্বামী সুচারু তা জানতে পারে এবং তার মানসীকল্পনা প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। সুরুচি শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে পিতৃগৃহে যদিও সে তার নিজের কাছে নিজে ছোট হয়নি কখনই, তবু এই উপন্যাসটি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয়—"এই প্রণয়লীলার সমাজতান্ত্রিক ও পারিবারিক দিকটা লেখক একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন।" বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ৪৯৭)। "আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩) ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতেও আমরা প্রেম সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাই। কিন্তু নারী ও পুরুষের স্বভাবের পার্থক্যই উপন্যাসগুলিতে বড় হয়ে উঠেছে। অবশ্য, বলা দরকার যে উপন্যাস হিসেবে এগুলি অন্নদাশঙ্করের অপরিণত সৃষ্টি। তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস ছয় খণ্ডে লেখা 'সত্যাসত্য'। এই উপন্যাসের নায়িকা উজ্জয়িনীর জীবন শুরু হয়েছে বাদল নামের এক যুবকের পত্নী রূপে—যে বাদল আধুনিক পৃথিবীর বহুধাব্যাপ্ত চিন্তা-মননের স্রোতের সঙ্গে নিজের জাগ্রত চেতনাকে প্রতিমুহূর্তে মিলিয়ে চলতে চায়। বাদলের মনের নাগাল পাবার জন্যই উজ্জয়িনীর প্রয়াস শুরু হয়। বাদলের হিতৈষী বন্ধু সুধীকেও উজ্জয়িনী একদা সময়ে অবলম্বন করতে চেয়েছে। তারপর আবেগের উচ্ছ্বাসের করতে পারে। অন্তত, উজ্জয়িনীকে সেই আত্ম-প্রতিষ্ঠ ভূমিতে পৌঁছে দেওয়াই লেখকের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এই উপন্যাসে আমরা দেখি উজ্জয়িনীর সমগ্র আকুতি, ব্যাকুলতা, সন্ধান—সবই হৃদয়াবেগের পথ ধরে চলে। নারীর প্রতিষ্ঠার বাস্তব ও সামাজিক সমস্যাগুলি যেন কোথাও দানা বেঁধে উঠতে পারে না। ধনীকন্যা, ধনী ঘরের বধূ উজ্জয়িনীকে বাঙালি সংসারের চালচিত্রে কোনো সংলগ্নতা দেওয়া হয়নি। তার আর্তি ও চরিতার্থতা—সবই অনেকখানি [illegible] হয়ে [illegible] থাকে। তাছাড়া, অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থ মন্তব্য

করেছেন—"....বাদল কর্তৃক বিবাহবন্ধনকে অস্বীকার করার সঙ্গে বাদলের সঙ্গীনীদের প্রতি ঈর্ষাই তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। এই স্বীকারোক্তির ফলে উজ্জয়িনীর আত্মানুসন্ধান তার ভিত্তি হারিয়ে ফেলে।" ('উজ্জয়িনী ও তার আত্মঅন্বেষণ', আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃঃ ১৬৭)। আসলে তাঁর গল্প উপন্যাসের মেয়েরা যে বলয়ের মধ্যে বাস করে সেটি হৃদয়াবেগের জল-হাওয়ায় গড়া। অনেক ছোটগল্প লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর যেখানে সেই বৃত্তটির মধ্যে নারীর স্বমহিম অবস্থান। নারীত্বের রহস্য বলয়ের আলোকিত উদ্ভাস সেখানে বহুবর্ণে দেখা দেয়। সেই বৃত্তটির মধ্যে অনায়াসেই বিজয়িনী হয়ে দাঁড়ায় নারী। কিন্তু সেই বৃত্তটি বাস্তবের রূঢ় রৌদ্রালোকিত, বেঁচে থাকার যুদ্ধ-বিক্ষত কঠিন সামাজিক ভূমির বাইরে অবস্থিত।

এ ব্যাপারে একা অন্নদাশঙ্কর রায়কে চিহ্নিত করা অনাবশ্যক। একেবারে এই সময়ের গল্প-উপন্যাসেও যেন সেইরকমই দেখি আমরা। নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা আছে কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব প্রায়শই পুরুষ-সাপেক্ষ। হৃদয়ের সমস্যাই যেন আজও নারীর প্রথম ও প্রধান সমস্যা। খাওয়া-থাকার সংকটের মোকাবিলা করবার জন্য আজ যে মেয়েরা হৃদয়লীলা শিকেয় তুলে রেখে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, বাংলা উপন্যাসে তাঁদের পদক্ষেপ এখনও কম। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস অবশ্য চমৎকার ব্যতিক্রম।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের নারী ভাবনায় প্রগতিমনস্কতার সঙ্গে ঈষৎ স্ববিরোধের যে আভাস পাওয়া যায় তার বীজ ছিল 'নারীত্ব' সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণার মধ্যেই। কিন্তু আগেই বলেছি, পরিবর্তনশীল দেশ-কালের সঙ্গে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের নির্মোক তিনি অকাতরে ফেলে আসবার ক্ষমতা রাখেন। একেবারে সাম্প্রতিক কালে যখন নারীবাদের নিত্য নতুন প্রশ্ন সমাজ-মানসকে বারবার সচেতন করছে তখন অন্নদাশঙ্কর রায়ও এসে উপনীত হয়েছেন নারীর সামাজিক অধিকার রক্ষায় জোরালো প্রতিবাদের সমর্থনে। ১৯৮৪-তে প্রকাশিত 'সংস্কৃতির সংকট' প্রবন্ধ সংকলনে তিনি লিখেছেন—"স্ত্রী ও শূদ্রকে অবদমিত রাখাই ছিল শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রধারীদের চিরাচরিত নীতি ও রীতি। এতে স্ত্রী ও শূদ্রও সহযোগিতা করেছিল। বিদ্রোহের বা বিপ্লবের কথা পুরাণে ইতিহাসে লেখে না। প্রতিরোধ না করলে সব অন্যায়ই চিরস্থায়ী হয়। তখন তাকে বলা হয় ধর্মের অঙ্গ।" (সাহিত্যলোক, ১৯৮৪, পৃঃ ৮৪)। ঐখানেই তিনি আরো বলেছেন—"নারী জাগরণ ও শূদ্র জাগরণ যদি অব্যাহত থাকে আমূল পরিবর্তন আশা করতে পারি।"

অনেক দোলাচল পার হয়ে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারেন ১৯০৪ সালের জাতক অন্নদাশঙ্কর রায়। নারীর অধিকার সম্পর্কে এই তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে পাওয়া উপলব্ধি।

সৌজন্যে : 'সাংস্কৃতিক খবর'

অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্যরীতি

ধীমান দাশগুপ্ত

সাহিত্যিক ঐতিহ্য

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যরচনা আবাল্য দুই মহান সাহিত্যপ্রবাহে লালিত, একটি ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারা, অন্যটি য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ার। অন্নদাশঙ্করের এই দুই ধারার অনবদ্য সমন্বয় ঘটেছে। সাহিত্যচেতনার পর শৈলীর প্রসঙ্গ, গদ্যরীতির কথা। কী লিখব-র পর কেমন করে লিখব। তাঁর শৈলী সবুজ পত্রযুগের সূত্র ধরে এসেছে। সবুজপত্রে তখন চলছে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে আর প্রমথ চৌধুরীর চার ইয়ারী কথা, সে তাঁর শিক্ষানবীশীর কাল। একদিকে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী অন্যদিকে ওড়িয়া সাহিত্যের রাধানাথ, মধুসূদন, ফকীরমোহন। ওড়িয়ায় নতুনপন্থী সবুজদলের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি একজন। সবুজপত্রের ভাবে ও ভাষায় যে নতুনত্ব, সবুজদলের দৃষ্টি ও আদর্শে সেই নতুনতা। গদ্যরীতির প্রধান দুটি—একটা চলতি বাকরীতি, আরেকটা সাহিত্যের বাকরীতি। বাংলাতে চলতি বা কথ্য রীতিকে যাঁরা সাহিত্যে সারস্বত বাকরীতির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন সেই প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশিষ্য হলেন অন্নদাশঙ্কর। বীরবলের গদ্যে সরলতা সত্ত্বেও যে অতিরঞ্জন আর অলংকারিতা, অন্নদাশঙ্কর কালক্রমে তা কাটিয়ে ওঠেন। ধূর্জটিপ্রসাদ যেমন সরল হতে গিয়েও দুরূহ অন্নদাশঙ্কর তা নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের চলতি বাক্যরীতির স্বাদু প্রভাবকে একদিকে স্নিগ্ধতা ও সরলতায়, অন্যদিকে বিশুদ্ধি ও মননে সঞ্চারিত করে গদ্যরীতির প্রধান দুটি ভাগকে আশ্চর্য মেলান। তাঁর শৈলীর পেছনে যে স্নিগ্ধতা ও সরলতা তা লোকসাহিত্যেরও উত্তরাধিকার, ছড়া বাউলগানের সংসর্গের ফল, যে উত্তরাধিকার অর্জন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বিশুদ্ধ হয়ে সরল। তাঁর শৈলীর পেছনে যে বিশুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিকতা তার কারণ তাঁর মানবিকবাদী মনীষা যা পাশ্চাত্য তবু প্রাচ্য ধরনের। তাঁর শৈলীর এই উভযোজ্যতা ও সংশ্লেষণ-প্রবণতাই এ প্রবন্ধের বিষয়।

শৈলী ব্যবহারের প্রবণতা

আগেই বলেছি এই শৈলীতে প্রথমত আছে সরলতা ও বিশুদ্ধি যে সরলতা ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রবণতা তলস্তয়ের জগতের শিল্পাদর্শ থেকে আহৃত। তাঁর নিজের ভাষায়, যে তলস্তয় আর্টিষ্ট তাঁরই অনুসরণ করেছি, যিনি মরালিষ্ট তাঁর নয়। একদিকে

শিল্পের প্রতি এই টান, অন্যদিকে গান্ধীর প্রভাবে পড়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হবার বাসনা। এই টানাপোড়েন সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর গদ্যরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর শৈলীতে গান্ধীর বাকরীতির যে প্রলেপ তার উৎস ওইখানে। দ্বিতীয়ত, শৈলীতে মননশীল বৈজ্ঞানিক বীক্ষণ ও তারই সঙ্গে ডকুমেনটেশনের ঝোঁক। এই তথ্যমূলকতা আজকের সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের রচনায় যেমন সেরকম প্রক্ষিপ্ত, আরোপিত কিছু নয়। এই তথ্যমূলকতা অন্যদের থেকে গুণে ও মাত্রায় ততটা আলাদা আইন আদালতের জগত নিয়ে লেখা তাঁর গল্পগুলি অচিন্ত্যকুমারের অনুরূপ গল্প থেকে যতটা পৃথক। তাঁর গদ্যরীতি নিশ্চয়ই মননশীল বুদ্ধিজীবীর গদ্য, যে বুদ্ধিতে কালক্রমে বোধেরও ছায়া পড়ে। তলস্তয়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সত্যের প্রতি অনুরাগ, এপিকের প্রতি আকর্ষণ ; রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ, বিচিত্রের পথে প্রবাসের বহিঃসৌন্দর্য তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে অন্তঃসৌন্দর্যেও ডুব দেয়। তাই তাঁর গদ্য, নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবীর গদ্য কিন্তু মিস্টিক বুদ্ধিজীবীর, বিদেশে যার সুন্দর তুলনা রাসেল। অ্যাটিচুডের পরিবর্তন স্বভাবতই তাঁর গদ্যরীতিতে তারতম্য ঘটায়। তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্প মূলত ঘটনামূলক, রিয়ালিটির বাইরের দিক নিয়ে লেখা, সেগুলো সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত ন্যারেটিভ রীতির। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে রয়েছে রিয়ালিটির ভিতরের দিকের কথা, এক প্রকার ইনার ভিশনের উপস্থিতি, সেগুলোতে বিবরণ ও সংলাপের প্রাধান্য। তাঁর সংলাপ যেমন নেহাত কথোপকথন নয়, এক ধরনের বিদগ্ধ বির্তক, তার কনটেন্টও তেমনি আত্মজৈবনিক উপাদান গেঁথে গেঁথে একধরনের (নান্দনিক বা সমাজতাত্ত্বিক) কনসেপ্ট।

শব্দপ্রয়োগ

আমার লেখকসত্তা প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন, একটি শব্দও এত শক্তিমান হতে পারে যে হাজার বছর ধরে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, একটি বাক্যের জন্য হয়তো একটা যুগ অপেক্ষা করছিল, যেই ওটি উচ্চারিত হলো অমনি মানুষ পেয়ে গেল তার ভাবনার কণ্ঠস্বর, একটি আইডিয়াও ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচনা করতে পারে। শব্দ বাক্য ও আইডিয়ার শক্তি ও অমোঘতায় বিশ্বাসী অন্নদাশঙ্করের এই উক্তিটি আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। এমনিতে তাঁর শব্দনির্বাচনে নেই কোন গোঁড়ামি। চলতি বাংলা শব্দ, দেশি শব্দ, বাংলা হরফে চলতি ইংরেজি শব্দ, দরকার হলে আরবি ফারসি এমনকি অন্যান্য বিদেশী শব্দ লেখায় বসান তিনি। তবু তৎসম শব্দের অবিরল ব্যবহার তাঁর সাহিত্যিক ঐতিহ্যই মনে করিয়ে দেয়। গোপাল হালদার সচেতনভাবে যে সংস্কৃত ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চান অন্নদাশঙ্কর সেই ঐতিহ্যলালিত শব্দসমূহকে সরল গঠনের বাক্যে সাজিয়ে সারস্বত রীতি ও চলিত রীতির মিল ঘটান। তাঁর বাক্যগঠন যদি মূলত কথা বাক্‌রীতির, শব্দনির্বাচন তবে মূলত সাহিত্যের বাক্‌রীতির। তবু সমসাময়িক অন্য লেখকের চেয়ে তাঁর তৎসম শব্দেও

যুক্তাক্ষর ব্যবহারের প্রবণতা তুলনায় অনেক কম। টাইপ করে লেখেন তিনি, বাংলা যন্ত্রে যুক্তাক্ষর টাইপ করতে অসুবিধা হয়, যুক্তাক্ষরের সীমিত ব্যবহারের পেছনে এই কারণ ক্রিয়াশীল হতে পারে।

তাঁর একটা গল্পের (কামিনীকাঞ্চন) প্রথম পাঁচ ছয় পাতা ওল্টাতে একদিকে পেলাম ফূর্তি তামাশা বাদশা বুঁদ উদাস ইত্যাদি শব্দ, অন্যদিকে মডার্ন ফিলসফি, ইন্টারেস্টিং কেস, জেনারেল ওয়ার্ড, ইনটেলেক্চুয়াল, মেটাফিজিকস্-এর মতো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। বাংলা ও বিদেশী শব্দের একটির বিশেষ্য ও অন্যটির বিশেষণ হিসেবে একই বাক্যে পাশাপাশি অবস্থানও মোটেই বিরল নয়। শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণ নয়, বিশেষ্য ও ক্রিয়া। ক্রিয়া ও সম্বোধন। তাঁর শব্দ ব্যবহারের যে টোন তাতে রয়েছে অভিজাত তৈরির সচেতন প্রয়াস। যেমন, ১. কেসটা ইন্টারেস্টিং নয়, মানুষটা ইন্টারেস্টিং। (ইংরেজি শব্দটির দ্বৈত এবং টা ও টির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়) ২. আগ্রহ ছিল কিন্তু সময় ছিল না। ৩. চিন্তা করে যে আনন্দ পেতুম সে আনন্দের <u>তুলনা নেই</u>, বই পড়ে যে আনন্দ পেতুম সেও <u>অতুলনীয়</u>। (রেখিত শব্দদুটি লক্ষ্য করুন) ৪. এখানে আমি মরে যাচ্ছি, মরতে মরতে মরেই যাব একদিন। ৫. পাশা যেমন হাসতে হাসতে স্বর্গে চলে গেল আমি কি তেমন পারব! আমি হয়তো কাঁদতে কাঁদতে নরকে যাব। ৬. তাঁর মুখে হাসি কিন্তু চোখে জল। রোদ বৃষ্টি। ভাষার দুটি দিক, কৌশল ও রহস্য, এই উদাহরণ ক'টি এটাই স্পষ্ট করে যে শব্দপ্রয়োগের সময় থেকেই অন্নদাশঙ্কর ইমোশান ও টেকনিকালিটিকে ভাষায় মেলাতে চান। শুধু অভিঘাত নয়, শব্দের ব্যবহার কখনো কখনো কমিকতাও নিয়ে আসে, এমন উপমা যা প্রধানত শব্দভিত্তিক। শব্দছন্দ ও শব্দদোলনের কথাও এ প্রসঙ্গে জরুরি।

কথোপকথন পরপর ও একটানা ব্যবহার করার সময়ে বারবার বলে, বলি বা বলেনের পুনরুক্তি এড়াতে গিয়ে তিনি যা করেন তা বাংলা সাহিত্যে অনেকটাই নতুন— তা হল সংলাপের সঙ্গে বর্ণনাত্মক মন্তব্য। যেমন বারুণী গল্পের শেষাংশে সংলাপগুলির আগে বা পরে যুক্ত হয় এইসব মন্তব্য : আমি মাথা নাড়ি, তিনি বিরক্ত হন, আমি বিষণ্ণ স্বরে বলি, তিনি ধাঁধায় পড়েন, তাঁকে আশ্বাস দিই, আমি ভেঙে বলি, (তিনি) বলেন, আমার মনে পড়ে যায়, আমি হাসি তিনি সায় দেন, ডাক্তার (তিনি) কঠোর হন, আমি স্বীকারোক্তি করি, তিনি বিস্মিত হন, আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বলি, তিনি মনে করিয়ে দেন, আমি কাতর স্বরে সুধাই। স্পষ্টত এই মন্তব্যগুলি সংলাপের অন্তর্নিহিত ভাব ভঙ্গি ও ব্যঞ্জনাকে স্পষ্টতর তীক্ষ্ণতর করে, আবার একটানা সংলাপের একঘেয়েমিও কাটিয়ে দেয়।

বাক্যগঠন ও বাক্যক্রম

সরল বাক্যগঠনের দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশি। জটিল বা যৌগিক বাক্যকেও প্রায়ই তিনি সরলে ভেঙে দিতে চান। জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে সংযোগকারী শব্দগুলিকে রাখতে

চান সরল। ইংরেজি বাক্যগঠনের সচেতন প্রভাব অবশ্যই আছে তাঁর বাক্যকাঠামোয় কিন্তু কখনো তা আড়ষ্ট বা বিশেষ শ্রুতিকটু হয়ে আসেনি। এই কাঠামো ব্যাকরণের অন্বয়ের উপর মূল নির্ভরশীলতা সত্ত্বেও নানা বৈচিত্র্য অর্জনে সক্ষম। বাক্যগঠনের মতো বাক্যসাজানোও সমান জরুরি প্রসঙ্গ, যে ক্ষেত্রে যুক্তিক্রম মেনে চলে তাঁর গদ্য, সুধীন্দ্রনাথের গদ্য যুক্তি মেনে যতটা দুরূহ, এ গদ্য যুক্তি মেনে ততটাই সরল আর তাঁর যুক্তিক্রম ইংরেজিতে বললে Consecutiveness ও Concurrentness-এর সুন্দর মিশ্রণ। এই কটি বৈশিষ্ট্যের সমর্থনে বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, এখানে তাঁর রচনা থেকে তিনটে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ১. এ পৃথিবী একদিন আমাকে তার ঐশ্বর্য পারাবারের মীন করবে। আমি তার আনন্দলীলার সাক্ষী হব। আনন্দ! আনন্দ! চারদিকে আনন্দ! আমি সেই আনন্দ পারাবারের মীন। যেদিকেই সাঁতার কাটি সেদিকেই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন আর কিছু নেই। নিরানন্দ কোথায় তা দেখতে হলে আনন্দের বাইরে যেতে হয়। কিন্তু আনন্দের বাইরে কি যাওয়া যায়? না একবার সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারলে আর যাওয়া যায় না। আনন্দের ভিতরে আমি, আমার ভিতরে আনন্দ। বাইরে। বাইরে বলে কোনো কথাই নেই। ভিতরে। ভিতরে। সমস্তই ভিতরে। ২. আক্ষেপের সত্যিকার হেতু যদি থাকে তবে সেটা এই যে সুরথ যাদের চেয়েছেন তাদের সবাইকে পাননি। ভালোবেসে না পাওয়াটা অন্যায় নয়, কিন্তু পেয়ে না ভালোবাসাটা অন্যায়। না ভালোবেসে পাওয়াটাও অন্যায়। অন্যায় না বলে বলতে পারা যায় প্রেমের ঋণ। সেসব প্রেমের ঋণ শোধ হবে কী করে? তারা সবাই বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। মথুরা থেকে বৃন্দাবন বহুদূর। ফিরে যাবার পথ হারিয়ে গেছে, রথই বা কোথায়। স্মৃতিটুকুই সম্বল। ভাবতে ভাবতে মনে উদয় হয় এই ভাব যে, অমিয়াকে আরো বেশি করে ভালোবাসলেই সে ভালোবাসা ভগবানের কাছে পৌঁছবে ও সে প্রেমের উদ্বৃত্ত তাঁর মারফৎ যাদের পাওনা আছে তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। ও কি, তার চোখে জল ভরে আসে (চোখ জলে ভরে আসে—নয়)। সে আবেগে আকুল হয়ে কাঁদে। সন্ধ্যাবেলা যে সন্ধ্যাতারার মতো উদয় হয়েছিল ভোরবেলা সে শুকতারার মতো অস্তপ্রায়। তার মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকে পরমেশ। সে যেন পূর্বজন্মের একটি স্মৃতি। এখনি সে মিলিয়ে যাবে। (একটি ইমোশনকে ঘিরে তিনটে উপমা কীভাবে দানা বেঁধেছে লক্ষণীয়)।

অন্নদাশঙ্করের গদ্যরীতির এক উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর সংলাপ-রীতি। দীর্ঘ, সংলগ্ন, কখনো ঈষৎ শিথিল সেই সংলাপের সুর। নাগরিক কথোপকথন তা, পরিশীলিত ও মননশীল, নিরপেক্ষ আবেগ ও বুদ্ধির খেলা সেই কথোপকথনে। তাতে অনুপ্রাস আসে, আসে হিউমার, কখনো কথার জন্য কথা, কিন্তু সর্বত্রই ও সর্বদাই এক শৈল্পিক প্রয়োজন ও নান্দনিক তৃপ্তির হাত ধরে আসে তা। সেখানেও সরলতার স্বাদ। বিশুদ্ধির স্বাদ।

অলংকরণ

তাঁর সংলাপ গল্প বলে। শব্দ দিয়ে ছবি, টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে কথা। কখনো

বর্ণনার, কখনো অনুভবের। কিন্তু বাচালতা বা বাগ্মিতার জন্য তাঁর অলংকরণ নয়। কনসেপ্টধর্মী বড়ো মাপের থিমকে ছোট গল্পের পরিসরে ঢোকাতে গিয়ে সংলাপে অনেক খোরাক দিতে হয়। আবার বড়ো মাপের হলেও এপিক নয় এমন থিমকে কয়েক খণ্ডের উপন্যাসে ছড়াতে গিয়ে সংলাপ দিয়েই অনেক ফাঁক ভরাতে হয়। ফর্মাট নির্বাচনে এই দ্বিধা অন্নদাশঙ্করের শৈলীর একমাত্র সীমাবদ্ধতা। অনুষঙ্গ আহরণ ও প্রসঙ্গ বর্ণনায় তিনি এদেশ বিদেশ থেকে, একাল সেকাল থেকে প্রয়োজনমতো ক্লিশে ব্যবহার করেন, আশ্চর্য মানিয়ে যায় তা। কোথাও যৎসামান্য অতিকৃতি করলে তাও মানিয়ে যায়। তাঁর অলংকরণ উপমা তুলনা বেশির ভাগ প্রাত্যহিক জীবন থেকে, লোকায়ত সাহিত্য থেকে তুলে নেওয়া। উদাহরণ দিই—

১. বিয়ে তো নয়, অভিমন্যুর ব্যূহ। প্রবেশের পথ খোলা, নির্গমের পথ রুদ্ধ।

২. বুকে হাত দিয়ে দেখি, ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কিনা।

৩. আপ ট্রেন বেচারীর প্রাণান্ত। সে গ্রামের মেয়ে।

৪. আমি ঘরপোড়া গরু। আমার ঘর পুড়ে গেছে। ঘরের লোকই ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেল।

উপমার অন্য দৃষ্টান্ত দেখা যাক— মিলি দুহাতে মুখ ঢাকল। সে কাঁদছিল। কথা বলল না। শুধু একটা হাতে তুলে রুমালের মতো নাড়ল। মুখ ঢাকা হাত রুমালের উপমা পেয়ে চোখের জলকে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে এখানে। উপমার ইমোশন হয়ে ওঠা এই। আমরাও চরকা কাটি খদ্দর পরি, ... নিরামিষ খাই, মদিরা স্পর্শ করিনে, সত্যে মতি আছে, সাধ্যমতো অহিংসাও মানি, কিন্তু ব্রহ্মচর্য? এই ভরা যৌবনে? শিরসি মা লিখ, মা লিখ, চতুরানন। দুই বন্ধুতে মিলে হাসাহাসি করে। মজা দেখতে বাচ্চারা ছুটে আসে। উপমা / তুলনা / অনুষঙ্গের আইডিয়া হয়ে ওঠা এই।

যদিও প্রসঙ্গ অনুযায়ী তাঁর গদ্যরীতি পাল্টায়, তবু গল্প ও উপন্যাসের গদ্যরীতিই এ প্রবন্ধের আলোচ্য যা একই সঙ্গে ভাবের সাথে ভাবনায়, বস্তু জিজ্ঞাসার সাথে রোমান্টিক চেতনার, লৌকিক জীবনের সাথে পরিশীলিত জীবনের সুন্দর সংশ্লেষণ। তা পশ্চিমী ভাবনার সারস্বত প্রকাশ প্রাচ্য আঙ্গিকে।

সৌজন্যে : কবিকণ্ঠ, ১৯৮২

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ ৯৯

দাউদ হায়দার

মা হেমনলিনীর মৃত্যু হয় ৩৫ বছর বয়সে, বাবা নিমাইচরণ তখনও দিব্যি শক্ত সবল, জোয়ান। প্রৌঢ় নন আদৌ। কিন্তু পুত্র অন্নদাশঙ্কর রায়ের মনে গেঁথে যায়, বেশিদিন বাঁচবো না। অতএব, চল্লিশ পেরোনোর আগেই অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করবেন। অন্তত, যতটা পারা সম্ভব। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া, এমনকি নাটকও।

—ত্রিশোত্তর যুবার মাথায় মৃত্যুচিন্তা চক্কর দিতেই পারে, তাই বলে দুম্ করে সময়ের হিসেব কষাটা কি রোমান্টিকের লক্ষণ নয়?

ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের পাল্লায় পড়ে (জীবনী ও কবিতা পড়ে) কুড়ি শতকের পয়লা ভাগের বহু বাঙালি কবিও রোমান্টিকতায় পোক্ত হয়েছেন, সন্দেহ নেই।

—অবশ্য, কে রোমান্টিক নয়? শিল্পীরা আরও বেশি। বাদ যান না অন্নদাশঙ্কর রায়ও। তাই বলে রোমান্টিকতাই জীবন নয় তাঁর। বরং তিনি প্রেমিক। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রেমিক। বাক্ স্বাধীনতার প্রেমিক। মানবাধিকারের প্রেমিক। গণতন্ত্রের প্রেমিক। দেশের প্রেমিক। ভাষা প্রেমিক। কল্যাণের প্রেমিক। শান্তির প্রেমিক। মানুষের প্রেমিক। বিবেকের প্রেমিক। এবং প্রেমেরও প্রেমিক।

প্রেমিকের আজ জন্মদিন। ৯৯ বছরে পা রাখছেন। এগুচ্ছেন সেঞ্চুরির দিকে। জন্মেছিলেন ১৯০৪-এ, ওড়িশার দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানালে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিশ্বপ্রেমের মূলে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা। দুই সভ্যতায় লালিত হয়েছেন এবং ধারণও করেছেন যথার্থ।

—আসলে তিনি রেনেসাসেঁরই মানসপুত্র। আবার রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজিরও। দেশ ভাগ চাননি কখনও। কোনও সেকুলার দেশপ্রেমিক চাননি। বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশের লেখকরাও তাঁর মতো এত লেখালেখি করেননি।

'কাঁদো প্রিয় দেশ' জিয়াউর রহমান সরকার বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যেমন করেছিলেন পাকিস্তান সরকার 'খোকা ও খুকি' ছড়াটি।

একটি বিষয় আমাকে আন্দোলিত করে যে, অন্নদাশঙ্কর রায় পূর্ববঙ্গের সন্তান নন। অথচ পূর্ববঙ্গকেই আপন ভেবেছেন বেশি। আজীবন থাকতেও চেয়েছিলেন কুষ্টিয়ায়, যদি দেশ ভাগ না হত।

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ খ্যাতনামা কবি-ঔপন্যাসিকের দেশঘর পূর্ব বাংলায়, আজকের বাংলাদেশে। অথচ অনেকের লেখায় বাংলাদেশ শিকড়সুদ্ধ উঠে আসেনি। কারণ কী? দেশ ছাড়ার বেদনা?

কেউ শিশু বয়সে, কেউ যুবক বয়সে, কেউ মধ্য বয়সে বাংলাদেশ ছেড়েছেন। শিশুদের কথা বাদ দিলুম। তরুণ বা প্রৌঢ়দেরও তেমন গাঢ় সম্পর্কের কোনও মুসলমান বন্ধু কেন ছিল না?

অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিস্তর বন্ধু এখনও বাংলাদেশে ছড়ানো। যেহেতু তিনি

বাংলাদেশকে আপন করে নিয়েছিলেন, বাংলাদেশও তাঁকে হেঁসেলে ঠাঁই দিয়েছে। বুঝেছিলেন যে, ভাষা সংস্কৃতি দুই দেশের মানুষের মিলন ঘটাতে পারে। ধর্ম বা অন্য কিছু নয়। মনে পড়ছে আমাদের, চাকরি জীবনে অধিকাংশ সময়ই পূর্ববঙ্গে কাটিয়েছেন। শুরু নওগাঁ দিয়ে।

নওগাঁয় তখন বহু হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। লীলা রায়ের বাংলা শিক্ষার ভার যে কোনও পণ্ডিতের ওপরে ছাড়তে পারতেন। বদলে বেছে নেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে। পরবর্তীকালে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে নামী অধ্যাপক এবং 'হারামণি'-খ্যাত। বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থ 'হারামণি'। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধি দিয়েছে আঠারো বছর আগে।

একথা মানছি যে, অন্নদাশঙ্কর রায় চাকরি জীবনে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গেই বেশি সময় কাটিয়েছেন। নওগাঁ, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ঢাকায়। হিন্দু মুসলমান বলে ভেদাভেদ করেননি কাউকে। হতে পারে, এর মূলে স্ত্রী লীলা রায়ের অবদানই বেশি। লীলা রায় ছিলেন আমেরিকার টেক্সাসের এল পাসোর কন্যা। এল পাসোয় গিয়ে আবিষ্কার করি, কাউ বয়দের একদা হুল্লোড় থাকলেও বহু জাতির রক্তের সংমিশ্রণ অঞ্চলটি গরীয়ান।

আরও একটি অভিজ্ঞতা যে, দক্ষিণ জার্মানির 'ওরন্‌ডর্ফ' গ্রামে ইহুদি-ক্যাথলিক-প্রেটেস্টান এমনকি মুসলমানদেরও সহাবস্থান।

এই ওরন্‌ডর্ফ গ্রাম (জার্মান ভাষায় ডর্ফ মানেই গ্রাম) থেকেই ১৭৪০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে যারা মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন, প্রত্যেক ওরন্‌ডর্ফ উপাধিকারী। এই ধারীর মধ্যে লীলা রায়েরও পূর্বপুরুষ।

লীলা রায়ের মৃত্যুর পর অনেকেই ভেবেছিলেন অন্নদাশঙ্কর বড় বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন। হয়তো হয়েছেন, কিন্তু মনের দিক থেকে আদৌ নন। যদিও বড় সন্তান পুণ্যশ্লোক রায় গত বছর অক্টোবরে গত হয়েছেন। তবু তিন সন্তান সারাক্ষণ ঘিরে থাকেন তাঁকে। বড় কন্যা জয়া রায়, ছোট কন্যা তৃপ্তি রায়, বড় নাতি চন্দ্রহাস রায় এবেলা ওবেলায় এসে সঙ্গ দেন। তিন নাতি-নাতনি থাকেন বাইরে। বিবি, রুরু ও আদিত্য আমেরিকায়। সোনা চেন্নাইয়ে।

বিবি ও সোনাও সন্তানের জননী এখন।

এই যে দীর্ঘ জীবন অন্নদাশঙ্কর রায়ের, এরকম জীবনকে ভাগ করে দিয়েছেন সাহিত্যে নানা শাখায়। সন্তানদের জন্যে। বন্ধুদের জন্যে। মানুষের জন্যেও। এখন বয়সের ভারে নতজানু হয়েছেন বটে, সুস্থও নন, চলাফেরা করতে পারেন না, অধিকাংশ সময়ই বিছানায় শুয়ে, কিন্তু অথর্ব নন। ভাবনাচিন্তা একেবারে পরিষ্কার। সুরজিৎ দাশগুপ্তকে একটি লেখাও ডিকটেট করলেন। রাতে আবার যথারীতি দেশী-বিদেশী ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনেন। বাদ যায় না আজীবন প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতও।

এখন কেবল তার একটিই দুশ্চিন্তা, ধর্মের নামে দেশে হচ্ছে কী? আমরা কি বাঁচবো?

সৌজন্যে ঃ 'সংবাদ প্রতিদিন' ১৫.০৩.০২

একজন লেখকের ধ্রুপদী উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি ঃ অন্নদাশঙ্কর

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছড়াকার নয়, অন্নদাশঙ্করের প্রথম জীবনে ইচ্ছে ছিল একজন কবি হওয়ার। তার মধ্যেই লেখা চলছিল গল্প-উপন্যাস। লিখতে লিখতে অনুভব করেছিলেন বাংলায় ধ্রুপদী উপন্যাস লেখার খুব প্রয়োজন। বড়ো মাপের জীবনদর্শনের উপন্যাস। শুরুও করে দিলেন লেখা। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। ক্রমে ঔপন্যাসিক হিসেবেই অধিকতর প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর।

বেশ স্ফীতকায় অনেকগুলি উপন্যাস লেখার পরে লেখকের এটুকু চাওয়া নিশ্চয়ই বেশি নয়। কিন্তু বাঙালি বোধহয় তাঁর ছড়া নিয়ে যতখানি মাতামাতি করে, তাঁর উপন্যাস নিয়ে ততটা নয়। আসলে সেই বিখ্যাত ছড়া, 'তেলের শিশি ভাঙলে পরে খুকুর পরে রাগ করো'—এই একটি ছড়াই যত নষ্টের মূল বলে আমার ধারণা। ছড়াটি স্কুলপাঠ্য না হলেও বোধহয় এত ক্ষতি হত না তাঁর। অন্নদাশঙ্করের প্রসঙ্গ উঠলেই বাঙালি একবাক্যে বলে ওঠে, ওই যে সেই লেখক যাঁর তেলের শিশি—।

কিন্তু কেন তাঁর উপর এই অবিচার তা তাঁর উপন্যাস ও উপন্যাস বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেই হয়তো স্পষ্ট হবে বিষয়টা। অন্নদাশঙ্কর ধ্রুপদী উপন্যাস লেখার বিষয়ে কতটা সিরিয়াস ছিলেন তা তাঁর উপন্যাস বিষয়ক ধ্যানধারণা থেকে জেনে যান পাঠক। উপন্যাস বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের ধারণা খুব পরিষ্কার। জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর ঔপন্যাসিক হওয়ার ব্রত। ছড়া ও প্রবন্ধ লিখেছেন বহু, কিন্তু উপন্যাসেই তাঁর স্বস্তি।

বেশ কয়েকটি উপন্যাসের জনক অন্নদাশঙ্কর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যয় করেছেন লেখার টেবিলে। ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন প্রতিটি লেখার আগে। ছোটো উপন্যাসের পাশাপাশি লিখেছেন বড়ো মাপের উপন্যাস বিশেষ করে বড়ো মাপের উপন্যাসগুলি লিখতে গিয়ে তিনি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন বহু বড়োমাপের লেখকের উপন্যাস। সেই সঙ্গে অনেক মহান মানুষের জীবনাদর্শও। টলস্টয় ও রল্যাঁর সঙ্গে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর জীবনদর্শনকে। আর সেই সঙ্গে উপন্যাস কী তা নিয়ে তৈরি করেছেন নিজের ধারণা। তারই কয়েকটি উদ্ধৃতি দিই উপন্যাসের মডেল সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিষ্কার করতে ঃ

১. 'সব দেশের সব বয়সের পাঠক পাঠিকার ভিতরে একটি চির শিশু আছে। সে চায় নতুন গল্প, নতুন উপন্যাস। 'নভেল' কথাটার মানে কী? যা নতুন। নতুন না হলে তাঁর কৌতূহল না জাগলে সে পড়তে চায় না। আমাদের প্রতিদিনের কাজ তাকে নূতনত্বের স্বাদ জোগানো। জগতের নূতনত্বের অভাব নেই। চোখ কান খোলা রাখলে কত নতুন মুখ চোখে পড়ে। নতুন কথা কানে আসে। লিখতে জানলে যে কেউ নতুন গল্প, নতুন উপন্যাস লিখতে পারেন।'[১]

২. 'আমরা যারা বাংলা উপন্যাস লিখি তারা যেন ক্লাসিক রচনায় মন দিই। লেখা মানেই জীবনপাত। জীবনপাত করে যদি বহুজনের জীবনে বহুকাল ধরে জীবনলাভ করি তো জীবনপাত করা সার্থক। কেবল জীবনলাভ নয়, জীবনদানও বটে। কারণ ক্লাসিক মাত্রেরই জীবনদায়িনী শক্তি অসীম। লোকে তার থেকে জীবন পায় বলেই শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁর স্রোতে অবগাহন করে। তাতে যদি কিছু পঙ্কিলতা থাকে তো উপায় নেই। জীবনের স্রোত নির্মল নয়। ভাগীরথীর স্রোতের মতোই ঘোলা।'[২]

৩. 'যিনি যা জানেন তিনি তাই নিয়ে লিখুন। ফাঁকি না দিলেই হ'লো। যদি মানবহৃদয়ের ঠিক সুরটি বাজে তা হলে বুর্জোয়ার জন্যে বুর্জোয়ার বিষয়ে বুর্জোয়ার লেখা বলে না-মঞ্জুর হবে না। শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষের কাহিনী যদি হয় তো ভাবী কালের প্রোলেটারিয়ান পাঠকও আপনার করে নেবে।'[৩]

৪. 'উপন্যাস এক গঠনকর্ম। কবিতার মতো স্বতঃসৃজন নয়। প্রবন্ধের মতো এক ঝোঁকে লেখা নয়। ভ্রমণকাহিনীর মতো স্মৃতিলিখন নয়। গড়তে যদি না শিখে থাক তবে তা শেখ।...গঠনের কাজ দিনের পর দিন করে যেতে হয়।'[৫]

৫. 'কাল তোমার জীবনে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে বলে আজ তুমি উপন্যাস লিখতে বসে যাবে এটা হবার নয়। ....কালের ব্যবধান উপন্যাসের বেলা অপরিহার্য প্রয়োজন.....

উপন্যাসের পক্ষে পরের মন জানাও অত্যাবশ্যক। এর জন্যে চাই অন্তর্দৃষ্টি, চাই দরদ, চাই একাত্ম হবার ক্ষমতা। বহুদর্শিতারও প্রয়োজন আছে....

উপন্যাসের জীবন তার (লেখকের) আপনার জীবন, তার নায়ক, নায়িকার জীবন, নায়ক নায়িকার সঙ্গে যুক্ত মানব-মানবীর জীবন, জীবনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম বা নিয়তি, জীবনের বৃহত্তর পটভূমি, জাগতিক....রিয়ালিটি। উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়।'[৬]

তাঁর তিনটি প্রধান রচনা 'সত্যাসত্য', 'রত্ন ও শ্রীমতী' ও 'ক্রান্তদর্শী' নিয়ে অন্নদাশঙ্করের বেশ অহঙ্কারই ছিল কেন না তিনি একটি লেখায় বেশ সোচ্চারেই বলেছিলেন টলস্টয়ই ছিল তাঁর আদর্শ। টলস্টয়ের রচনা মাথায় রেখে তিনি উপরোক্ত উপন্যাসত্রয় লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'রেজারেকশন' ও 'আনা কারেনিনা'র সমগোত্রীয় উপন্যাসও বাংলাসাহিত্যে লেখা সম্ভব।

এই ধারণা উচ্চাকাঙ্খা কিনা তা বিচার করবেন তন্নিষ্ঠ গবেষক ও সমালোচক। কিন্তু তিনি উপন্যাস নিয়ে যে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করতেন, কী হবে প্রকৃত উপন্যাস তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা মত প্রকাশ করেছেন লিখিতভাবে। অন্নদাশঙ্করের মতে, 'উপন্যাস তো কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে নয়। উপন্যাস হচ্ছে আর্ট। আর্ট হচ্ছে সভ্যতার ফুল। যে দেশে সভাতা নেই সে দেশেও রাশি রাশি উপন্যাস লেখা হতে পারে, লক্ষ লক্ষ পাঠক দিনে একখানা করে পড়তে পারে। কিন্তু 'বিদ্যাপতি করে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক'.....সভ্যতা হচ্ছে ভালো মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা।

সভ্যতা হচ্ছে ধর্মাধর্ম জ্ঞান, নীতি-অনীতি বোধ, রুচি-অরুচি বিচার। যেখানে সভ্যতা নেই সেখানে সত্যিকারের ভালো জিনিসের কদর নেই। তেমন ভালো জিনিস যদি বা কেউ লেখে তবে প্রকাশক জোটে না বা রাষ্ট্রবিরূপ হয়।'

কিন্তু 'সত্যাসত্য'—তাঁর তিনটি উপন্যাসের যেটি প্রথম লেখা, সেই উপন্যাস মোট ছয় খণ্ডে লেখা, আর তা লিখতে সময় লেগেছিল বারো বছর। একাদিক্রমে বারো বছর লেগেছে তা নয়, প্রথমে কথা ছিল পাঁচ খণ্ডে লেখা হবে পাঁচ বছরে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে। তারপর ঠিক হয়েছিল এক-একটি খণ্ডের যতটুকু লেখা হবে তা প্রকাশককে পাঠাবেন, সেরকম প্রুফ আসবে ডাকে (যেহেতু তিনি চাকরিসূত্রে থাকতেন দূর মফস্বলে), সেরকম বই হিসেবে প্রকাশ পাবে খণ্ডে খণ্ডে। কিন্তু সব কটি খণ্ড শেষ করার আগেই তাঁর পোস্টিং হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। ফলে লেখায় যতি টানতে বাধ্য হন কেন না জেলাশাসকের চাকরি করে বড়োমাপের উপন্যাস শেষ করা সহজসাধ্য নয়। তারপর জেলা জজ হওয়ায় আবার সময় পান। তখন আবার লেখা শুরু হয়। লিখতে লিখতে পরিসর বেড়ে যায়, পাঁচ খণ্ডের জায়গায় ছয় খণ্ডে শেষ হয় উপন্যাস।

এই উপন্যাস লেখার আগে তিনি পড়েছিলেন টুর্গেনিভের 'সনস অ্যান্ড লাভার্স'। তারও আগে তিনি রচনা লেখার পুরস্কার হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলেন রমা রল্যাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ'। সেই উপন্যাস পাওয়ার ইতিহাসও কি কম রোমাঞ্চকর!

পাটনা বিভাগের কমিশনার মিস্টার বি. সি. সেন, আই. সি. এস. একদিন মিন্টো হিন্দু হস্টেল পরিদর্শনে আসেন। সঙ্গে পাটনা কলেজের প্রিন্সিপাল মিস্টার ই. এ. হর্ন, আই. ই. এস.। হস্টেলনিবাসী ছাত্রদের জড়ো হতে বলা হয় একটা বারান্দায়। বলা হয় কাগজ পেনসিল নিয়ে আসতে। প্রিন্সিপাল বলেন আধঘণ্টার মধ্যে ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ লিখতে। বিষয় নির্দেশ করবেন কমিশনার সাহেব। যার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে তাকে তিনি কুড়ি টাকা পুরস্কার দেবেন।

আমরা ছাত্ররা লিখতে বসে যাই। কমিশনার ও প্রিন্সিপাল অপেক্ষা করেন না। লেখা সংগ্রহ করার ভার দিয়ে যান হস্টেল সুপারিন্টেনডেন্টের ওপর। আর সকলের মতো আমিও লেখা সেরে তাঁর হাতে দিই। বিষয়টা আমার মনে পড়ছে না। এটা ১৯২৪ সালের কথা। প্রিন্সিপাল বলে পাঠান পুরস্কারটা আমাকেই দেওয়া হবে। আমি কি নগদ টাকা নেব না সেই দামের বই নেব? আমি বই চাই ও বইয়ের নাম দিই। রম্যাঁ রলাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর ইংরেজি সংস্করণ 'জন ক্রিস্টোফার'। পাটনায় কমলা বুক ডিপোর একটি শাখা ছিল। সেখানে পাওয়া যাচ্ছিল। প্রিন্সিপাল খোঁজ নিয়ে জানতে পান চার খণ্ডে সমাপ্ত সেই সংস্করণের দাম পঁচিশ টাকা। তখন তিনি কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করেন উনি কি অনুগ্রহ করে আর পাঁচটা টাকা বাড়িয়ে দিতে পারবেন? তাই হয়। চারখানা বই পেয়ে আমি আহ্লাদে আটখানা হই।

সেই বয়সে 'জন ক্রিস্টোফার'ই ছিল আমার উপন্যাসের আদর্শ। কখনও যদি উপন্যাস লিখতে হয় তো সেই আদলের উপন্যাস লিখব। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত আমি বিশ বছর বয়সে নিইনি, নিতে আরও পাঁচ বছর লেগেছে।'

বিষয়গুলি উল্লেখ করলাম একটি উপন্যাস লেখার আগে লেখকের প্রস্তুতিপর্ব কী দীর্ঘ কী ব্যাপক কী বৈচিত্র্যময়।

সাহিত্যের যে কোনও ধারা সম্পর্কেই কথাটা প্রযোজ্য। যে কোনও বড়মাপের লেখার আগে সব কবি বা লেখককেই প্রস্তুতি নিতে হয় এভাবেই।

আমরা অন্নদাশঙ্করেব উপন্যাসের বিষয় ও পরিধি নিয়ে ভাবলেই তাঁর কথার সত্যতাও উপলব্ধি করি অনায়াসে। তাঁর উপন্যাসগুলি যাচাই করতে তাঁর ধারণাকে অনুসরণ করাই শ্রেয়। যে লেখকের আদর্শ টলস্টয়, লেখার মান সম্পর্কেও তাঁর ধারণাও অবহিত হয়ে যান পাঠক। তিনি এও বলতেন যিনি যা জানেন তাই নিয়ে লিখুন। ফাঁকি না দিলেই হল।

রবীন্দ্রযুগে লালিত লেখকের ভাবনার মাপ যে কিছুটা রবীন্দ্রানুসারী হবে তাতেও সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়সাধন, অন্নদাশঙ্করের লেখায় বা ভাবনায়ও সেই সুরের প্রতিধ্বনি।

অন্নদাশঙ্কর 'সত্যাসত্য'তে লিখেছিলেন সত্যের অন্বেষণের কাহিনী। তারপর শুরু করলেন 'রত্ন ও শ্রীমতী' নামে আর এক দীর্ঘ উপন্যাস। এটি চার খণ্ডে লেখা ও এতে লেখকের প্রেম অন্বেষণের কাহিনী বিবৃত। পরকীয়া প্রেমকাহিনীর লেখা অতীতেও বহু হয়েছে। সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলী তো পরকীয়া কাহিনীই। কিন্তু গদ্যসাহিত্যে এমন বিশাল পটভূমিকায় লেখা এই প্রথম।

আর শেষ বড়োমাপের উপন্যাস 'ক্রান্তদর্শী' লেখার মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্যের অন্বেষণ। এই উপন্যাসের থিমে কোথায় ফল্গুনদীর মতো অন্তঃসলিলা হয়ে বিরাজ করেছেন গান্ধী। একজন চিন্তাবিদকে অবলম্বন করে এগিয়েছে তাঁর উপন্যাসের অবয়ব। সৃষ্টি হয়েছে নানা চরিত্র। তার মধ্যেই চলছে সৌন্দর্যের সন্ধান।

বেশ বোঝা যায় জীবনকে নানাভাবে দেখাই ছিল অন্নদাশঙ্করের অভীষ্ট। সব বড়োমাপের লেখকেরই তাই। কখনও সত্যকে, কখনও প্রেমকে, কখনও সৌন্দর্য বা আর্টকে। একজন লেখক যখন তাঁর জীবনকে এতভাবে দেখার আয়োজন করেন, তখন তাঁকে তো সমীহ না করে উপায় নেই পাঠকের। একজন অনুজ লেখকও বিস্মিত হয়ে ভাবেন জীবনকে কতভাবে দেখা যায়, কতভাবে অনুভব করা যায়, কত বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা যায় তা জানতে হলে অন্নদাশঙ্করকে পাঠ করা অবশ্যই জরুরি।

ছড়া লিপিকার অন্নদাশঙ্কর

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

এক

বিংশ শতাব্দীর সমবয়সি মানুষ অন্নদাশঙ্কর রায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সম্পূর্ণতাই সংস্কারমুক্ত মন ও মননশীলতা, অতি উন্নত সৃষ্টিকুশলতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতা বোধ, সমকালমনস্কতা সারা দেশের শ্রমশীল জনগণধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বোধ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে এক উজ্জ্বল মনস্বী পুরুষ। আমাদের সমগ্র বয়সকাল ধরে শিল্প-সংস্কৃতি শিক্ষা সমাজভাবনা, দার্শনিকতা, অসাম্প্রদায়িক, চিরমানব-কল্যাণবোধ নিয়ে অভিভাবকের মতো বিরাজ করছেন, অনেকটাই মিডিয়ার প্রচার আর কোলাহল থেকে দূরে অবস্থান করে। আবার সময়মতো নিজের মতামত দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করেও চলেছেন সারাজীবন। শতাব্দী ছুঁয়ে থাকা এই মানুষটির স্মৃতিশক্তি, মেধা এবং সমাজ-সংসার-স্পর্শময়তা বিস্ময়কর।

১৯০৪ সালে ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্য ঢেনকানালে জন্মে কখনও শাক্ত কখনও বৈষ্ণব ধর্মের বাতাবরণে বাল্যকাল কেটে যায়, বাড়িতে ধর্মীয় কীর্তন, পুজো পাঠ ইত্যাদির চল ছিল। বৈষ্ণব পদকীর্তন শোনার মাধ্যমে ভক্তি ও রস সাহিত্যের আস্বাদন ক্ষমতা গড়ে উঠেছিল। ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ওড়িশার কটক থেকে দেন এবং ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম হন। তখন থেকে স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের সাথে পঠন-মগ্নতা গড়ে ওঠে। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠ নাথ পট্টনায়ক প্রমুখ সুহৃদদের সাহচর্যে 'সবুজগোষ্ঠী' নামের সাহিত্য সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। তারপর ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতকস্তরে পড়ার জন্য বিহারে পাটনায় ভর্তি হন। এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েই পরীক্ষায় পাশ করেন। এভাবে ছাত্রজীবনেই বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ক্রমে স্বীকৃত অধিকারের রূপ পেল। কলেজ জীবন থেকেই বিশ্বের ধ্রুপদ কথা সাহিত্যিকারদের উল্লেখযোগ্য সব লেখা পড়েছেন এবং কখনও তা নিয়ে লেখালেখিও করেছেন। এক সময় ওড়িয়া, বাংলা ও ইংরাজী এই তিন ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করার মনোভাব পোষণ করেছেন। পরে অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই সারাজীবন বাংলা ভাষাতেই প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস-কবিতা ও ছড়া এবং ইওরোপ ও বিশ্বের নানা স্থান

পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অবিসংবাদী সাফল্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বাল্যকাল থেকেই আমেরিকা তথা ইওরোপ ভ্রমণে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা বোধ এবং ইওরোপের সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ে ইওরোপের সৌন্দর্য প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। পরে ১৯২৭ সালে আই-সি-এস পড়তে ইংলন্ডে যান এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দেশে ফিরে সারাভারত কর্মস্থলের মধ্যে বাংলাদেশকেই তাঁর কর্মজীবনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। গ্রামবাংলার কৃষিনির্ভর মানুষ এবং উৎপাদনের সাথে সরাসরি মানুষের জীবনধারণ আর জীবনযাপন প্রণালীর গূঢ় রহস্য স্বচক্ষে দেখতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার থানান্তর, মহকুমা এবং পরে জেলা শাসকের দায়িত্বে নানা সময়ে নানা স্থানে কম বেশি সময় কাটিয়েছেন। তখন সাধারণ প্রশাসন এবং বিচারবিভাগ আলাদা না থাকায় কখনও প্রশাসন এবং কখনও বিচার বিভাগে কর্মরত থেকে গ্রাম-গঞ্জ, শহর ও শহরতলীর নানা স্তরের শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত সম্পূর্ণ শিক্ষাবঞ্চিত কর্মহীন আবার অনিশ্চিত ও অনিয়মিত কাজ-কর্মে নিযুক্ত মানুষ জনের বোধ বোধি মানসিকতা এবং গ্রামীণ ও লোকসাংস্কৃতিক ভাব-ভাবনার প্রকাশ, আত্মমর্যাদা বোধ ইত্যাদি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন বা সুযোগ করে নিতে সচেষ্ট ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের প্রশাসনে বা বিচারবিভাগে সময়ে-সময়ান্তরে কর্মরত থেকেও কোনোদিনই সাধারণ মানুষের স্বার্থ পরিপন্থী সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্লেশ বৃদ্ধিকারী এবং নির্যাতনমূলক কাজ কখনই তিনি করেন নি। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্যোগ কখনই নেন নি। সে ব্যাপারে নিজের স্বাধীন চিন্তামুক্ত-মনস্কতা এবং সাধারণ খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য বঞ্চিত মানুষদের প্রতি স্বভাব পক্ষপাত সিভিল সার্ভিসরত অন্নদাশঙ্করের মধ্যে একধরনের নির্লিপ্তি এনেছিল। যা কখনই উদাসীনতা কর্মতৎপরতাহীনতা বা বিচার বিশ্লেষণ-বীক্ষণক্ষমতা-হীনতা নয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ তাদের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া, তাদের প্রেম-প্রীতি-বিরহ-মিলন, লড়াই-সংগ্রাম, স্বাধীন চিন্তা, চেতনা সম্বলিত জীবন দেখা এবং তা সাহিত্যে সৃজনে কাজে লাগানোই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবজীবনের স্থিরচিত্র নয়, সদা চলিষ্ণু মানবাত্মার গূঢ় কথা, নীরবতা, জয়-পরাজয়, যুদ্ধ-সন্ধি সম্বলিত জীবনপট-কথা কাছ থেকে অবলোকন করার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের অহিংস ও বিপ্লবী চেহারা-ছবি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, শুধু নয় কখনও প্রচ্ছন্ন সহায়ক ভূমিকাও নিয়েছেন। বিশেষতঃ গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস তিনি সর্বদাই পোষণ করেছেন। চট্টগ্রামে এবং ঢাকায় কর্মরত থাকাবস্থায় আত্মত্যাগী তরুণ বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী যুবসম্প্রদায়ের কর্মধারার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এবম্বিধকারণে তিনি ইংরেজ প্রভুদের সার্বিক আস্থাভাজন রাজকর্মচারী হবার প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিবদ্ধ রাখতে পারেন নি। নানা সময়েই ছোট

বড় সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। ফলস্বরূপ চাকরির স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে, কিঞ্চিৎ অবমাননাও ভোগ করতে হয়েছে, সামান্য সময়ের ব্যবধানে এক জেলা থেকে সুদূর জেলান্তরে বদলি হতে হয়েছে। কোথাও তেমন থিতু হতে পারেন নি। চাকরিতে যোগ দেবার সময় থেকে যে কোনো সময়ই চাকরি ছেড়ে দেবার মানসিকতা লালন করেও একুশ বছর চাকরি করার পর চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণতই সাহিত্য সেবায় ব্রতী হন। এই সময়সীমার ভেতর ইংরেজ সরকার, কিছুদিনের ফজলুল হকের লীগ সরকার এবং পরবর্তী সময়ের স্বাধীন প্রাদেশিক কংগ্রেসী ইত্যাকার সব সরকারের আমলেই কম-বেশি ব্যক্তিত্বের সংঘাত এড়াতে পারেন নি। অসাম্প্রদায়িক মুক্তমনা, স্বাধীনচিন্তা সর্বোপরি সাধারণ মানুষের ভালোমন্দের চিন্তা চেতনার শরিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় অনেক কিছুই অনেক সময় বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে পারেন নি। সারা বিশ্বের নানা স্থানের নানা সময়ের ফ্যাসিস্ট শক্তির পেশীর তাণ্ডবতাকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সহ রোঁলা, বারবুস, গোর্কী, আইনস্টাইন, রাসেল প্রমুখ বিশ্ব-বিবেকবান লেখক-শিল্পী স্রষ্টাদের প্রতিবাদের ধারায় প্রাণিত ছিলেন। তাই দেশে ও বিদেশে যেখানেই যখন গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার শাসনতান্ত্রিক অপচেষ্টা হয়েছে তার বিরুদ্ধেই তিনি প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৫৯ সালে কেরলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকারেব ৩৫৬ ধারা প্রয়োগে পতন ঘটানোর বিরুদ্ধে তাঁর 'সূর্যগ্রহণ' নামের প্রবন্ধ স্মরণযোগ্য। ১৯৬২ সালে চীন ও ভারত সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে আনন্দবাজার পত্রিকাশিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে অন্যান্য লেখক শিল্পীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে। ১৯৭০-৭১ সালে নকশাল আন্দোলনে সত্তরের দশককে মুক্তির দশক ঘোষণা এবং দেশের মনীষীদের মূর্তিভাঙা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর শারীরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন। ঘরে বসে সাহিত্য তথা সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই শিল্পী-স্রষ্টার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না—এই সত্যই তিনি সারা জীবনে প্রচার করেছেন। এই প্রতিবাদী চেতনার কণ্ঠ তাঁর 'বিনুর বই' নামের আত্মকথামূলক গ্রন্থে বিধৃত হয়ে আছে। সমাজ-সংসারে একদল মানুষকে অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকায় থাকতে হয় অন্যায়-অসাম্য এবং নীতিহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য।

দুই

একজন সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে অন্নদাশঙ্কর একমাত্র নাটক ছাড়া, কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস সত্য প্রেম-সুন্দর অর্থাৎ নন্দন বিষয়ক প্রবন্ধের সাথে ইতিহাস সমাজভাবনা সংস্কৃতি এবং চলমান সময়ও তার ভালো মন্দ নিয়েও তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতের স্বাধীনতা, পরাধীন ভারতবাসীর বিড়ম্বনা হীনমন্যতা ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধের বিষয়। অনেক জীবন সত্যের নির্ভীক প্রকাশের জন্য তাকে সরকারী উচ্চপদের চাকরি একদিন ছাড়তে হয়েছিল। লেখক টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সত্য ও সৌন্দর্যানুসন্ধান করতে শিখেছেন। লেখককে গল্প উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রায়ণ

সমকাল আর তার অগ্রসরতা পশ্চাদপদতা, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলার মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্ব আবার দ্বন্দ্বমুক্তি এভাবেই একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। এইসব সৃষ্ট নর-নারীদের পাঠকদের আদৌ অচেনা মনে হয় না। কল্লোল ও কালিকলম পত্রিকায় 'নীতিজিজ্ঞাসা', 'স্ত্রী-পুরুষ', 'রবীন্দ্রাদিত্য', 'মনে মনে' ছাড়াও নানা বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ 'তারুণ্য' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সমাজ কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত এব প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রেক্ষিতের ভিতর থাকা নর-নারীর সমস্যা সব বিশ্লেষণ করেছেন মানবিক বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় এইসব বিষয় সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে তাঁর 'সত্যাসত্য' ও 'ক্রান্তদর্শী' নামের অবিস্মরণযোগ্য উপন্যাসে। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবসাহিত্য আর পাশ্চাত্য সাহিত্য শিল্পের অভিজ্ঞতা থেকে নরনারীর সম্পর্কানুসন্ধান করেছেন তিনখণ্ডে লেখকের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'রত্ন ও শ্রীমতী'তে। তাছাড়াও 'বিশল্যকরণী', 'তৃষ্ণার জল', 'রাজঅতিথি' এবং 'ক্রান্তদর্শী' যা ষাটোর্ধ্ব বয়েসের পাঠকের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল।

বড়বড় এবং চিরস্মরণীয়যোগ্য উপন্যাস রচনার পাশাপাশি ঘটনামূলক, রিয়ালিটির বাইরের, ইনার ভিশানের উপস্থিতি, কোথাও সংলাপের প্রাধান্য, আত্মজৈবনিক উপাদান ইত্যাদি সব উপকরণ নিয়ে 'মনপবন', 'কামিনীকাঞ্চন', 'রূপের দায়', 'সোনার ঠাকুর', 'মাটির পা', 'বারুণী', 'পমফ্রেট', 'বিনা প্রেম সে না মিলে' নামের সব গল্প স্মরণযোগ্য গল্পে শুধুই একটা কাহিনী কাঠামো নয় একটা [illegible] প্রতিফলন, নিগূঢ় অর্থ, সম্যক তাৎপর্যময় জিজ্ঞাসা ও সত্যানুসন্ধান অন্ন[illegible]সত্য।

কবিতাকেও স্রষ্টা অন্নদাশঙ্কর বিশ্বের [illegible] সৃষ্টি [illegible] বলেই গণ্য করেছেন। উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধাদি [illegible] চাকরির বিস্তৃত সময়ের মধ্যে থেকে কবিতার জন্যে সময় [illegible] তিনি কবিতাই লিখতেন। সব কিছুর মধ্যে দু-একটা সনেট লিখেছেন। [illegible] করেছেন কবিতা একটা সাধনা। খুব কম কথার মধ্যে অনেক বেশি কথা [illegible] করতে পারাতে কবিতার সিদ্ধি। উপলব্ধি করেছেন যে বাংলা গদ্যের বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু গদ্যের ভাষার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। কবিতার পরিচিত শব্দের পুঁজির মধ্যে নতুন নতুন কবিতাগর্ভ শব্দের উদ্ভাবনায় মগ্ন থেকেছেন। কবিতা ছন্দের সাথে কিঞ্চিৎ সুর তাঁর কবিতার শরীরে লেগে আছে। তাঁর 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসের মতো রাধাতত্ত্ব তাঁর কবিতায় মূল ও স্থায়ী ভাব হিসেবে থেকেছে। একটা শাশ্বত বা eternal ভাবনা বা ধারণা তাঁর ছিল। তা থেকে কখনো দূরে থাকেনি তাঁর কাব্যভাবনা। রত্ন ও শ্রীমতীতে সেই শাশ্বতভাবনার-সত্যভাবনার শিল্পীত প্রকাশ ঘটেছে। কবিতায় শুধু intelect চর্চা ও তার প্রকাশ পাঠক মন-মনন স্পর্শ করে না সবসময়। জীবনের সর্বোচ্চ সত্যকে উপলব্ধির জন্যে একটা রহস্যময়তার আশ্লেষ প্রয়োজন। সীমার ভিতর অসীমের অবস্থান ঘটানো যথাযথ কবির কাজ বলে অনুভব করেছেন। কবিতায় সত্যকে উপলব্ধি করতে হয় তা কেউ আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেখাতে পারে না, যে ওই হল 'সত্য'।

জীবনসত্যকে কবিতার সত্যের মধ্যে স্থাপন করে শাশ্বত সত্যের রূপ সৃষ্টি করা তাঁর কবিতা ভাবনার মূল কথা।

।৩

অন্নদাশঙ্কর রায়ের উল্লিখিত সব রকমের উল্লেখযোগ্য লেখালেখির চিরস্মরণীয় নানা দিকের মধ্যেও তাঁর ছড়া একটা বিশেষ মাত্রা নিয়ে সময় পরম্পরান্তর ধরে বেঁচে থাকবে। অন্নদাশঙ্করের নামের সাথে অজস্র ছড়া তার নামে আর নিজ মহিমা নিয়ে আমাদের দৈনন্দিনের জীবনে একাকার হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের নানা মহাসৃষ্টির বিপুল বৈভবের ভিতর রবীন্দ্রনাথের গানকে বাঙালি শ্রোতা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। এই অমোঘ বিশ্বাস স্বয়ং কবিরও ছিল। অন্নদাশঙ্করের ছড়ার ব্যাপারেও আমরা তেমনি প্রত্যাশা রাখি। লেখকের ভাষায় "যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে আয়েসে আরামে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের শ্রমের ঋণ আমি শোধ করব কী উপায়ে?....কাব্যে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে এ ঋণ আমি শোধ করতে পারি নি। পারবও না। কোনো মতেই সে সব রচনা সহজবোধ্য হবে না। সহজবোধ্য করতে গেলে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। সেটা আমার নীতি নয়। তা হলে আমি কী করব? আমি ছড়া লিখব। কিন্তু লিখতে পারব কি? না না করতে করতে একদিন লিখেই ফেলি। তারপর থেকে লিখে আসছি।"

১৯৩৭ সাল, অন্নদাশঙ্কর রাজশাহির জেলা শাসক থাকার সময় হঠাৎ একদিন একটা টেলিগ্রাম আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটোর যাত্রায় অন্নদাশঙ্করের উপস্থিতি এবং সঙ্গ চেয়েছিলেন। ট্রেনের মধ্যে মহাকবি বলেন, "আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখো না কেন?" আমি সবিনয় নিবেদন করি, "ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না। তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। বইখানিতে অনেকগুলি ছড়া ছিল। সেগুলি রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট ছড়া। মার্জিত-শীলিত ও সংস্কৃত।" তখন থেকেই ছড়া লেখার ব্যাপরটা অন্নদাশঙ্করকে পেয়ে বসল। ছড়ার হাত থেকে যেন তাঁর রেহাই নেই। ১৯৪২ সালে অন্নদাশঙ্করের বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে তাঁর সম্পাদিত একপয়সায় একটি সেই হিসেবে ষোলটি কবিতার বদলে ষোলটি ছড়া পাঠালেন। সেই সব ছড়া পরে 'উড়কি ধানের মুড়কি' নামে প্রকাশিত হলে বিষয়ভাব সাবলীলতা আটপৌরে মৌখিক কথার চাল, ছড়ার চলতি ছন্দ সব মিলিয়ে একটা ধরন সকলের সমর্থন গেল সহজেই। 'ক্লোরিহিউ' নামের সেই ছড়ার কিছু অংশের নমুনা। "*আচার্য জগদীশ বসু / উদভিদ্‌কে বলেছেন পশু / নতুন কথা এমন কী / অবাক হওয়াই আশ্চর্য্য / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / এবার যাচ্ছেন পাকুড় / চায়না কিম্বা পেরু না / সেইখানেই তো করুণা / শরৎচন্দ্র চাটুয্যে / মৌন আছেন মাধুর্যে / সৃষ্টির এখন সবাম তাঁর / মঞ্চ পর্দা বেবাক তার / পণ্ডিত জওহরলাল / নীলকে করবেন লাল / তা শুনে ভাবে যত নীল / কান যে নিয়ে যায় চিল।*" ছোটদের নয় একেবারে বড়দের

এককথায় সময়ের বিশাল কজন বড়দের নিয়ে এমন সরস মজার এবং অনাক্রমণাত্মক ছড়া বলাবাহুল্য পাঠককে মুগ্ধ করল। নিজেকে নিয়ে অনাবিল মজা করে 'এপিটাফ্' বা 'শাশ্বত' নামের ছড়া লেখেন। ছড়াকারের নিজেকে নিয়ে মজা সকলের উপভোগের কারণ হয়ে যায়। ছড়া লেখায় তিনি একেবারে প্রবাদপ্রতিম। ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর তাঁর সকল সৃষ্টির সুমহান পরিচয় ছাপিয়ে আছেন।

মোটামুটি সকলের বোঝার উপযুক্ত করে কিছু লেখার জন্য একপ্রকার জনসাহিত্যের কাজ করে ছড়া। পূর্বে ছড়া সাধারণত মুখে মুখে বলা হত বা ছড়া কাটা হত, মানুষ কানে শুনে তা মনে রাখতো এবং মুখপরম্পরায় তা ছড়িয়ে যেত। খনার বচন বা শুভংকরীর আর্যা বা নানা রকমের প্রবাদ-প্রবচন এভাবে মুখে মুখেই পরিচিত হয়ে আসছে। এক-এক সময়ে এক একটি বিষয়ে কোন কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশে তেমন তেমন একটা প্রবচনের কোনো বিকল্প থাকে না। গ্রামে-গঞ্জে অনেক স্বল্পশিক্ষিত মানুষ এমনকি দিদিমা-ঠাকুরমা ধরনের মহিলারাও মুখে মুখে এমন অনেক ছড়া কাটেন, টেবিলে, চেয়ারে, ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বৈদ্যুতিক পাখার তলায় বসে মাথা কুটলেও তেমন কটা পংক্তি রচনা করা সম্ভব হয় না। ছড়ার লোকায়ত এবং ট্রাডিশনাল চরিত্র ছড়াকে এক অনন্য চেহারা দান করেছে। এক একটা ছড়ার দুচার পংক্তিতে সত্য প্রকাশিত হয় দশ পাতা গদ্য কাহিনী লিখেও তা সম্ভব নয়। গুরুগম্ভীর ভাব বর্জন করে কথ্য সময়চলতি লঘু কখনো শব্দের আক্ষরিক অর্থ গোপন করে, আবার কখনো আক্ষরিক অর্থকেই প্রধান অর্থ ধরে শব্দের দ্বিসত্তার ব্যবহার—ধ্বন্যাত্মক শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মাধ্যমে একধরনের ধ্বনিমাধুর্য তৈরি হয়, সেই ধ্বনিময় শীতল অনুভব পাঠক, শ্রোতাকে অভিভূত করে।

বিচিত্র আঙ্গিকে ছড়া লেখা হয়। যেমন লিমেরিক, ক্লোরিহিউ, রুথ্লেস রাইম, ব্যালার্ড ইত্যাদি নানা ধরনের। ইংরাজী রাইম আর বাংলায় প্রচলিত ছড়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। এক এক দেশের ভাষা, সাহিত্যভাষা, রুচি, ভৌগোলিক অবস্থান, গ্রাম-শহরের বিন্যাস, মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা তার সব কিছু সাঙ্গীকরণ আবার কখনো প্রতিবাদী সুর ইত্যাকার সকল কিছুর প্রভাব-প্রতিফলন-প্রতিচ্ছবি-প্রচ্ছায়া প্রতিভাত হয় এক এক দেশের এক এক সময়কালের ছড়ায়। সম্পূর্ণতই মুডের পার্থক্য থাকে। ছড়ার ইমেজ ও ভাব ছন্দ ও মিল গতিময়তা এবং পাঠক শ্রোতার দেখা-শোনা-চেনা দৈনন্দিনের অভ্যাস, চলাচল আচার ব্যবহার সব কিছু মিলিয়ে একটা স্বাদ সৃষ্টি হয়। আপাত-অর্থহীন অনেক কথা-শব্দ ছড়ায় অন্য রকম ভিন্ন একটা অর্থ সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ অন্য একটা মাত্রা পেয়ে যায়। "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল / কাননে কুসুমকলি সকল ফুটিল / রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে / শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।" এভাবে শাব্দিক অনুপ্রাস ব্যবহারের মাধ্যমে যে পংক্তি রচিত হয়েছে তা সময় পরম্পরা ধরে সর্বশ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। একসময় ছড়া যারা বানান তাদের নাম অনেকেই জানে না। কোনো দিদিমা-ঠাকুরমা, বাউল, ফকির, কথক

বা পাঠক, নৌকোর মাঝি, ক্ষেতের চাষী ইত্যাকার সব গৌণ ব্রাত্য জনগণ ছড়া বানিয়েছেন ছড়া কেটেছেন। এখন পদ্যকার এবং কবিরাও ছড়া লেখেন। সময়ের চেহারা ছবি রুচিভেদে ছড়ার চেহারাও বদলে গেছে। তাই স্বাভাবিক।

ছড়াকার অন্নদাশঙ্করের অভিজ্ঞতার জগৎ-এর বিস্তার বহুদূর, বহুমাত্রিক। ওড়িশা, বিহার, বাংলা, ইওরোপে শিক্ষাসূত্রে থাকা, ইওরোপের বহু দেশ ভ্রমণ, দু বাংলার বহু জেলা মহকুমায় কখনো প্রশাসনে কখনো বিচারবিভাগে চাকরি সূত্রে থেকে শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত নানা পেশায় যুক্ত পেশাহীন কর্মহীন, ধনী-ধনহীন-চাষী, কারিগর, দিন-ভিখারি, বাউল-বোষ্টম-ফকির এমন নানা গোত্র ধর্মের মানুষজনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সচল চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক ন্যায়-অন্যায়, অসাম্য-অসামঞ্জস্য-অত্যাচার-প্রেম-অপ্রেম, মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারাকাঙ্ক্ষা, মানুষের পোষমানা আবার পোষ মানতে অস্বীকার করা এমন নানা ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনা। এসব বিষয় সঞ্জাত অভিজ্ঞতা সব সময় গুরুগম্ভীর ভাবে গদ্যে প্রবন্ধে-কথাসাহিত্যে, এমন কি কবিতায়ও প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যা ছড়ার আপাত লঘু কাঠামোর ভিতর দিয়ে চিনির মোড়কে অনেক অপ্রিয় সত্যের প্রকাশ ঘটানো যায় বড়দের ছড়ায়। ছোটদের ছড়ায় অনাবিল মজা-আনন্দ এবং অবাস্তবতার আড়ালে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এবং সমাজ-সংস্কারের অনেক অন্যায় অসামঞ্জস্য সম্পর্কেও একটা ধারণা জন্মানো যায় যার ফলে জীবনের পরবর্তী সময়ে ছোটদের ছেলেবেলায় শোনা বা পড়া অভিজ্ঞতা জীবনে কাজে লেগে যায়।

চার

ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর ছোটদের সাথে বড়দের জন্যেও ছড়া লিখেছেন। তাঁর সব ধরনের ছড়ার মধ্যেই সমাজ-সম্পৃক্তি প্রায় একশত ভাগ। বড়দের জন্যে লেখা ছড়ায় মজার মধ্যে যথেষ্ট ঝাঁঝ এবং সত্যি উচ্চারণের দায়-দায়িত্বের ঝুঁকি নিয়েছেন। এ সব করেছেন ছড়ার স্বভাব চরিত্র এবং প্রসাদগুণ বজায় রেখেই। ছোটদের জন্যে লেখা ছড়ার বইয়ের সংখ্যা সাত। (ক) রাঙা ধানের খই ; (খ) ডালিম গাছে মৌ ; (গ) আতা গাছের তোতা ; (ঘ) হৈ রে বাবুই হৈ ; (ঙ) রাঙা মাথায় চিরুণি ; (চ) বিন্নিধানের খই ; (ছ) সাত ভাই চম্পা (প্রথম ভাগ) আর বড়দের জন্যে লেখা ছড়ার বইয়ের সংখ্যার চার। (ক) উড়কি ধানের মুড়কি ; (খ) শালি ধানের চিড়ে ; (গ) যাদু, এ তো বড় রঙ্গ এবং (ঘ) সাত ভাই চম্পা (দ্বিতীয় ভাগ)। ছোটদের বড়দের জন্যে লেখা মোট এগারটি ছড়া সংকলনের লেখা নিয়ে ছড়া সমগ্রের মধ্যে ধরা আছে পাঁচশত বত্রিশটি ছড়া। সংখ্যার দিক থেকে কম নয় আর মান বা গুণবাচকতার দিক থেকে অনন্য। অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় তাঁর নিজস্বত্ব বিশেষভাবে ধরা আছে যা অন্য কারও মতো নয়। নানা বৈচিত্র্যও বৈশিষ্ট্যে তাঁর ছড়াকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়।

শিশুদের ছড়ার ক্ষেত্রেও শুধু অবাস্তবতা আজগুবি এবং অসম্ভবতার ছোট কিছুকে

শব্দ ও ছন্দের মজায় অনেক বড় করে দেখানোর চেষ্টা নেই। বরং ছোটদের মধ্যে স্বপ্নময়তা এবং কিছু পরিমাণ রহস্যময়তার রসসৃষ্টির প্রয়াস আছে।

লন্ডনের ফগ, লন্ডনের শীত, লন্ডনের গ্রীষ্ম ইত্যাদি ছড়ায় শিশুদের সামনে একটা না দেখা, না শোনা জগতের রহস্য দ্বার উন্মোচিত হয়। কারণ, "*পাহাড় প্রমাণ লেপের তলে / কাঁপতে থাকি ঘুমের ছলে / মুটের মতো পোষাক বয়ে ফিরি / বরফ ঝরে সকল দেহ ঘিরি*" / এমন অভিজ্ঞতা বাঙালী ছোটদের নেই। 'যুদ্ধের খবর' নামের ছড়ায় : *এসব আমার চক্ষে দেখা / নয়কো এসব শোনাশুনি "অশ্ব চলে আড়াই কদম / গজ চলেছে কোনাকুনি"*। তাঁর অতি বিখ্যাত ছড়ার একটি 'কাঁদুনি'। "*মশায়! দেশান্তরী করলে আমায় কেশনগরের মশায়! / .... কেশনগরের মশারমামা / ইস্কুলেতে থাকেন পলাশির সেই লড়াই / যদি কেশনগরে ঘটত / কেশনগরের মশার ঠেলার ক্লাইভ সেদিন হঠত!*" অবিভক্ত দুবাংলাতেই মশার দাপট তখনও ছিল আজও কোনো কোনো জায়গায় সেই দাপট কিছুমাত্র কম নয়। এমনি আরও একটি অতিবিখ্যাত ছড়া 'খুকু ও খোকা'। ১৯৪৭-এ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ বিশেষতঃ বাংলা ভাগের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র ক্ষোভ নিতান্ত লঘু চালে প্রকাশ করেছেন। "*তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো / তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা / বাংলা ভেঙে ভাগ করো! / তার বেলা?!* এই ছড়ায় সুরারোপিত হয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের কণ্ঠে বহুশ্রুত হওয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্নদাশঙ্করের এক-আধটা ছড়ারও যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা এই সব ছড়ার দুলাইন বলতে পারেন। '৪২-এ কলকাতায় জাপানী বোমা পড়া নিয়ে মানুষের আতঙ্কিত হয়ে কলকাতা থেকে পালানোর কথা আছে তাঁর 'জনরব' নামের নাট্যছড়ায়। 'ভেলকির' মতো ছড়া কোনোদিন কোনো সময়ের ছোটরাই ভুলে যেতে পারবে না। পশু-পাখি-ব্যাঙ-পিঁপড়ে-বাঁদর নিয়ে অনেক মজার ছড়ায় অনেক সময় প্রতিবেশী মানুষজন এবং তাঁদের অনেক খামখেয়াল-ক্ষ্যাপামি, মুদ্রাদোষ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটেছে সুন্দর ভাবে। ছোটদের স্বপ্নময়তা ও কল্পনাশক্তি বিজ্ঞানভাবনার মধ্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে ছড়ার স্বাভাবিক গঠন, ছন্দবৈচিত্র্য ছেলেবেলা-থেকে মা-ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, দাদু, জেঠাদের মুখে শোনা সব চিরদিনের কথা কাহিনী, চলতি ধাঁধা, ঠাকুমার ঝুলি, ঈশপের গল্প, ছোটদের জন্য দেশ-বিদেশের গল্প কথা, শিশু মনের নানা রঙিন স্বপ্নকল্পনা বাড়িয়ে তোলার বিষয় ছড়ার আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। শ্লেষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ইত্যাদির ব্যবহারে তার ছড়া অসূয়াপরায়ণতা বা অন্য শিশুর মনখারাপের কারণ কখনোই হয় নি। এবং শিশুমনে সৃষ্টিক্ষমতা তৈরি করার কাজে তাঁর ছড়া যথেষ্ট কার্যকরী।

বড়দের জন্য লেখা ছড়াতে তাঁর দেখা শোনা পড়া দৈনন্দিন ঘটনা, দুর্ঘটনা লব্ধ বিপুল অভিজ্ঞতা, মুখ-মুখোশ অন্তসারশূন্যতা, ভান, ভণ্ডামি, স্বদেশ বিদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক অসংগতি, অস্বাস্থ্য বা অমানবিকতার প্রকাশে ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর অসঙ্কোচে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ছড়ার সার্বিক

চেহারা ছবি চরিত্র বজায় রেখেই। কখনোই তথ্য আর তত্ত্বের আমদানিতে ভারাক্রান্ত করেন নি। ছড়ার লঘু চাল রেখেই অনেক গুরুভার কথা বলেছেন। মেঘনাদ বধের আদলে 'পোড়ামাটি' নামের লেখার সময়সময়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন—

(ক) "মিল কারখানা যদি ধ্বংস করি যায় ইংরাজ আপনি তবে মোর শেয়ারের মূল্য কী বল?"

(খ) "শোনরে ও ভাই রাশিয়ান রে / শোনরে ও ভাই চীন্ন / পাকা ধানে মই দিল রে / কায়দে আজম জিন্না।"

(গ) "কোথায় চায়ের কেটলীরে / মন্ত্রী হলেন এটলীরে .... / চাপাও চায়ের কেটলীরে/ভারতসখা এটলী রে।"

(ঘ) "মানুষকে যদি বলি ফিতে হয় দাদা / আমাদের মতো অহিংসা মতে মারো চালের সঙ্গে কাঁকর শাদা / ফাঁসির হুকুম হবে না একজনারো।

দেশভাগ আর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাওয়া স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে, তাঁর যন্ত্রণা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অজস্র ছড়ায় তা বিধৃত হয়ে আছে। '৪৯ সালে লেখা 'নজরুল' নামের সেই সুবিখ্যাত ছড়া বাঙালি মাত্রেই মনে রেখেছে। *"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল / আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে / ভাগ হয় নি কো নজরুল। এই ভুলটুকু বেঁচে থাক / বাঙালী বলতে একজন আছে দুর্গতি তার ঘুচে যাক।"* অন্নদাশঙ্করের সর্বজনপ্রিয় আর একটি ছড়া "গিন্নী বলেন", *যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি সকলের মুখে কমিউনিষ্টি। মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি / গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্টি .. .. গেল, সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি। ছেলেরা বললো কমিউনিস্টি / মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি। সেধে গুলি খায় কমিউনিস্টি .. তাই বসে বসে করছি লিস্টি। এ পাড়ায় কে কে কমিউনিস্টি।"* তখন সারা পৃথিবী জুড়ে কমিউনিস্ট বিরোধিতার মধ্যে থেকে কমিউনিস্টদের প্রতি এই প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির প্রকাশ ঘটাতে দ্বিধা করেন নি। গান্ধী হত্যার বিষয়ে সেই বিখ্যাত পংক্তি, *'নাথুরাম তো হানল দেহ' / হানবে এরা মূর্তি দেশের মুখে কালি মেখে / ধন্য এদের ফূর্তি।"* বা *"পিতৃঘাতের রক্ত মেখে দিল্লী হলো অন্য / পিতৃ পাঁজর ভস্ম করে / আহ্‌মদাবাদ ধন্য।"* '৫৮-৫৯ সালে একেবারে আজকের আমেদাবাদ দিল্লীর কথাটিই লিখে দিয়েছেন।

দেশজ কথা কাহিনী মিথ্-পুরাণ কথা-প্রবাদ প্রবচন, সাধারণ শ্রমশীল মানুষের মুখের কথা 'মিমিক্রি', সাধু চলতি তৎসম্ অর্ধতৎসম, প্রাকৃত অনেক শব্দের মিশেলে চমৎকার ছড়া তিনি লিখেছেন সারা জীবন। অন্নদাশঙ্করের ছড়া সম্পূর্ণতই তাঁর নিজের মত। অন্য কারও মতই নয়। প্রবন্ধকার কথাসাহিত্যিক ভ্রমণ সাহিত্যকার কবি সমাজভাবুক সব অন্নদাশঙ্করকে ছাপিয়ে ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করবেন। অবশ্য উল্লিখিত সকল রকমের সৃষ্টিতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

সৌজন্যে : 'সাংস্কৃতিক খবর'

অন্নদাশঙ্কর ঃ স্বভাবে স্বতন্ত্র এক বিরল ঔপন্যাসিক

আশিস স্যানাল

প্রথম পরিচয় শান্তিনিকেতনে। ষাট দশকের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে। গিয়েছিলাম কোনও একটা কাজে। ডঃ শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে ফিরছিলাম গেস্ট হাউসে। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। হঠাৎ ডঃ ঘোষ আমকে ডেকে বললেন, 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?' আমি জানালাম, 'না।' সামনের দিকে ইঙ্গিত করে জানালেন, 'ওই তো যাচ্ছেন। দেখা করবেন?'

তাকিয়ে দেখি পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত এক সৌম্য, শান্ত ভদ্রলোক হেঁটে চলেছেন। হাতে একটা লাঠি। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিতেই বললেন, 'বাংলা বর্ণমালা সংস্কার বিষয়ে তোমার লেখাটা পড়েছি। অনেক ভাবার কথা আছে।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দ্রুত কিছু কথা বিনিময়ের পর বললেন, 'নাটক দেখতে যাচ্ছি। যাবে নাকি?'

আপত্তি করলাম না। নাটক দেখেছিলাম দু'জনে মিলে। ডঃ ঘোষ চলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই। এর কয়েক বছর পরে কলকাতায় চলে এলেন। কলকাতার যোধপুর পার্কে প্রায়-ই যেতাম। অন্তরঙ্গতা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। তাঁর সাহিত্য চিন্তার অনেক পরিচয় লাভ করি। তাঁর সময় ও সমাজ চেতনা এবং বুদ্ধিদীপ্ত মনন আমাকে মুগ্ধ করে। এখনও সময়ে অসময়ে যাই তাঁর কাছে।

মনন-প্রধান জীবন-জিজ্ঞাসা পুষ্ট করেছে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। তাঁকে আমার মনে হয়েছে যেন বিশ্বনাগরিক। বিশ্বের আধুনিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আত্মিক পরিচয় তাঁর উপন্যাসে এনেছে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা। এদিক থেকে তাঁকে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর বলা যায়, যদিও 'সবুজপত্রে' তাঁর একটি রচনাও প্রকাশ হয় নি এবং এই পত্রিকাটি প্রকাশের সময় তিনি ছিলেন নিতান্ত বালক।

'সবুজপত্রে'র সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগ হয় ওড়িয়া সাহিত্যে 'সবুজ আন্দোলনে'র মাধ্যমে। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, গোদাবরিশ মহাপাত্র প্রমুখের মতো প্রমথ চৌধুরির 'সবুজপত্র' দ্বারা প্রভাবিত 'সবুজ আন্দোলনে'র সঙ্গে তিনিও যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ওড়িয়া ভাষায়। পরে বাংলা ভাষায় লিখতে আরম্ভ করেন। 'সবুজপত্রে'র কাছে ঋণ স্বীকার করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'সবুজপত্রে'র লেখক হবার সাধ আমার মেটে নি, তবু আমি 'সবুজপত্রে'র-ই একজন। আর কোনও পত্রিকার

সঙ্গে আমার মনের মিল, প্রাণের মিল, দিলের মিল এতখানি হয়নি'। কেন এত মিল, তারও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে : 'সবুজপত্র' যা চেয়েছিল তা পুরাতনের সংস্কার, অন্য কথায় সংস্কার-মুক্তি। অতীত সম্বন্ধে তার মোহ ছিল না, যদিও অতীতকে সে অস্বীকার করতে চায়নি। বাইরের বিশ্বকে সে প্রাণভরে স্বাগত করেছিল, যদিও ফিরিঙ্গিয়ানার সে পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু তার পায়ের তলায় ছিল বাংলাদেশের মাটি।' অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়েছে এই অনুভূতির রসে সঞ্জীবিত হয়ে।

গভীর জীবনপ্রীতি এবং জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান-ই ছিল তাঁর উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রচনা করেছেন তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য'। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। অবশ্য এর আগেও রচনা করেছেন কয়েকটি উপন্যাস। সেগুলির মধ্যে 'অসমাপিকা' (১৯৩০), 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩), বিশেষ উল্লেখ্য। অন্নদাশঙ্কর অবশ্য এগুলিকে 'খণ্ড' উপন্যাস হিসাবে ভাবতেই ভালোবাসেন বেশি। 'সত্যাসত্য' তাঁর কাঙ্ক্ষিত উপন্যাস। ছয় খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'যার যেথা ঘর' (১৯৩২) এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : 'সত্যাসত্য এপিক তথা রূপক হবে।' অবশ্য তৃতীয় সংস্করণে এ দাবি তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এপিক রচনার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর মধ্যে স্তিমিত হয়নি তার প্রমাণ হিসাবে 'প্রত্যাহৃত ভূমিকা' থেকে একটি অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে। তাঁর ভাষায় : 'এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাব নিকাশ। পটভূমিকা কেবল মানব সংসার নয়, নক্ষত্র নীহারিকা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, প্রলয়-পারম্পর্য, অণু-পরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়ক-নায়িকা তিন জনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইন্‌টিউশনের মার্গ, বাদল ইন্‌টেলেক্টের, উজ্জয়িনী আত্ম-নিবেদনের। তিনজনের-ই আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একাত্ম, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়। ওদের স্বভাবে কৃত্রিমতা নেই। এপিকের নায়ক-নায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের আছে। শেষ খণ্ড 'অপসারণ' (১৯৩২)-এর 'উত্তর ভাষণ' অংশেও এই প্রত্যাহারের দাবির স্বীকৃতি আছে। কিন্তু আশ্চর্য, এই দাবি প্রত্যাহারের এখনো পর্যন্ত কোনও কৈফিয়ৎ বা কারণ দর্শান নি তিনি। তাঁর কাছে তা সোজাসুজি কয়েকটি প্রশ্ন রাখলাম।

অকপট স্বীকৃতি

প্রশ্ন ঃ আপনি এপিক রচনার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে 'সত্যাসত্য' রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু পরে দাবি প্রত্যাহার করে নেন। এ জন্য এখনও পর্যন্ত কোন কারণ দর্শান নি আপনি। একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি, কেন আপনি পরে এপিক-এর দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ভালো প্রশ্ন তুলেছো। এতদিন আভাসে ইঙ্গিতে বললেও সোজাসুজি বলিনি

ঠিকই। এপিকে থাকে একজন নায়ক ও প্রতিনায়ক। প্রথমে এই উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে মনে হয়েছিল যে, সুধী ও বাদল বিপরীতমুখী। একজন সত্যের প্রতীক এবং অন্যজন অসত্যের। পাঠক এ দুই জনের মধ্যে একজনকে বেছে নেবে। কিন্তু লিখতে লিখতে মনে হল, সুধী ও বাদল দুই বিপরীত মেরুর চরিত্র নয়। ওরা পরস্পরের বন্ধু। তাই এপিকের দাবি তুলে নিলুম। তবে সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা আধুনিক কালের এপিক উপন্যাসের বিষয়। এ যুগে এপিক আগেকার মতো মহাকাব্য নয়। এখন মহা-উপন্যাস। আমি দুঃসাহসিক অ্যাড্‌ভেনচারে নেমেছিলুম। কাজটা শেষ করতে বারো বছর লাগল। আমার যৌবনটাই ওর মধ্যে নিহিত আছে। ভাগ্যক্রমে এমন একজনকে সঙ্গে পেলুম, যিনি না থাকলে ওই উপন্যাসের প্রাতীচ্য অংশ লেখা খুব-ই কঠিন হতো।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি শ্রীমতী রায়ের কথা বলছেন?

উত্তর ঃ (মৃদু হাসি। তারপর আবার চলে চললেন) ওই উপন্যাসটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় একপ্রকার প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমন্বয়ে। যাকে বলা যায় East West Synthesis। কাজেই পশ্চিমকে কাছে পাওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।

প্রশ্ন ঃ 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০) উপন্যাসেও কি এ-রকম একটা Synthesis-এর ক্ষীণ প্রচেষ্টা ছিল না? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপের পটভূমিকায় ইউরোপ প্রবাসী নায়ক কল্যাণ ঘোষের সঙ্গে ইংরেজ রমণী প্যাগীর প্রেমের মধ্যে কি এর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় না?

উত্তর ঃ না, তা কোনও Synthesis-এর প্রয়াস নয়। কেবল উপাখ্যান।

প্রশ্ন ঃ 'সত্যাসত্য' সম্বন্ধে আপনার দাবি ছিল, 'সত্যাসত্য হবে এপিক ও রূপক'।

উত্তর ঃ বলেছিলাম নাকি?

প্রশ্ন ঃ লিখিত রূপেই আছে। এপিকের কথা তো শুনলাম। এবার রূপকের দাবিটা কেন তুলে নিলেন, তা বলবেন কি?

উত্তর ঃ রূপক হচ্ছে যেমন 'ফাল্গুনী'। অবশ্য যৌবনের দূত সেই সঙ্গে বসন্তের বার্তাবহ। মোটেই বাস্তবধর্মী নয়। প্রথমে আমার রূপকের দিকে একটা মোহ ছিল। 'সুধী'র চরিত্রে দেখবে প্রথম দিকে মানবিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রায় ছিল না। একটা আইডিয়ার মোড়কে তাকে ধরে রাখা হয়েছিল। উজ্জয়িনীও ছিল একটি তত্ত্বের রূপক। মানবাত্মার একটি অবস্থা প্রতীক। লিখতে লিখতে মনে হল, চরিত্রগুলিকে বাস্তব করতে গেলে রূপক রাখা চলবে না। আর আপন তাগিদেই চরিত্রগুলি বাস্তব হয়ে গেল। রক্ত মাংসের চরিত্র হলে যা হয় আর কি—রূপক ভেসে চলে যায়।

প্রশ্ন ঃ East West Synthesis বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর ঃ আসলে East বা West বলে কিছু নেই। মানুষের হৃদয়ের মৌলিক সমস্যা সর্বত্রই এক। কম্যুনিস্ট চীনেই হোক, তৃতীয় বিশ্বের আফ্রিকাতেই হোক, ভারতেই হোক

বা ইংলন্ড আমেরিকাতেই হোক, মানুষের হৃদয়ের মূল সমস্যা সর্বত্রই এক। আমার উপন্যাসে আমি সে কথাই বলতে চেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ 'অসমাপিকা' (১৯৩০) উপন্যাসে সুচারু ও সুরুচির আখ্যানে যে সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম ও অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের সমস্যাটি তুলেছেন, তাতেও কি এক-ই কথা বলতে চেয়েছেন?

উত্তর ঃ অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব কথাটা আমি মানতে রাজি নই। বরং বলা যেতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব। আর এটা কি এখন সব দেশের সমস্যা নয়? গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ করা হচ্ছে কেন?

প্রশ্ন ঃ বার্নার্ড শ তাঁর ক্যান্‌ডিডা নাটকে নারীর জননী ও প্রিয়া সত্তার মধ্যে জননী সত্তাকেই জয়ী করেছিলেন। আপনি কি প্রিয়া সত্তাকে জয়ী করার পক্ষপাতী?

উত্তর ঃ বিবাহিত জীবনে নারীর কাছে পুরুষ হবে অনেকের মধ্যে এক—একক কোনও সত্তা নয়। 'পথে প্রবাসে' গ্রন্থে এ বিষয়ে আমার মন্তব্য আছে। আমার উপন্যাসেও সেই অনুভবের রেখাপাত ঘটেছে।

উপসংহার

অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই অকপট স্বীকৃতি থেকে তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে মনন প্রধান উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। রঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ', টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' রবীন্দ্রনাথের গোরা'র মতো অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' একটি বিরল নিদর্শন হয়ে থাকবে সাহিত্য জগতে। এই উপন্যাসের বাদলকে তিনি অসত্যের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। বাদল হয়ে উঠল ব্যক্তি মানুষের বন্ধন-মুক্তি পিপাসার প্রতীক। উপন্যাসে তার মৃত্যু তাই আমাদের ভাবায়। লেখক নিজেই এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'বাদলের মতো ইন্‌টেলেক্ট সর্বস্ব মানুষের পক্ষে নেতিবাদ-ই মরণের হেতু। একে একে যার সব বিশ্বাস গেছে, সে কী নিয়ে বাঁচবে। বাদলের মতো মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদী মানুষ যে একক ও নিঃসঙ্গ হবে, তাতে কোন বিস্ময় নেই। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের শেষে আবিষ্কার এক করে আত্মপ্রত্যয়। পরেশবাবুকে সে বলে : আমি যা দিন-রাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়।' বাঁচার একটা লক্ষ্য খুঁজে পায় গোরা। কিন্তু 'সত্যাসত্যে'র অপসরণ' খণ্ডে বাদলের উপলব্ধি : 'আমার কোনও দেশ নেই, এ যুগ আমার কাল নয়। আমার কেউ নেই, আমি একক।' এখানে বাদলকে যুগোত্তীর্ণ কোনও চৈতন্যে অবগাহন করান নি অন্নদাশঙ্কর। কারণ, তাঁর উপন্যাসে রয়েছে যুগ্ম নায়ক। সুধীকে তিনি ভবিষ্যতের নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করতে চান। তাঁর বক্তব্য : 'সত্যকে ভারতের লোক সবচেয়ে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে যখন মহাকাব্য রচিত হবে, তখন

ভারতের মহাকবি সত্যকেই শীর্ষস্থান দেবেন, নায়ক করবেন গান্ধীজিকে।' তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'ক্রান্তদর্শী' রচিত হয়েছে গান্ধীজিকে নায়ক করে। বহুদিন ধরে এর জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। 'সত্যাসত্য'র পর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'একালের ভারতীয় মহাকাব্যের নায়ক হবার অন্যতম যোগ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ হলেন গান্ধীজি।' 'ক্রান্তদর্শী' তাঁর 'সত্যাসত্য'র শেষ খণ্ড।

গান্ধীজিকে কাছ থেকে দেখার ও তাঁর জীবন-দর্শন পর্যালোচনার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। 'ক্রান্তদর্শী' বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। যখন বাংলা উপন্যাস সাহিত্য প্রবল তারল্যে ভাসমান, তখন অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস বিশেষ অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। কেবল চটকদার কাহিনী উপস্থাপন নয়—উপন্যাস হবে ঔপন্যাসিকের জীবন-বেদ, জীবন-দর্শন, এই প্রত্যয় আমরা লাভ করি তাঁর উপন্যাস সাহিত্য পাঠ করে। যুগধর্ম ও তারুণ্য ধর্মকে তাঁর মতো বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে বাংলা উপন্যাস সাহিত্য উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সৌজন্যে : 'সাংস্কৃতিক খবর'

বলেছিলেন-এটা ছাড়বেন না

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬। জরুরী অবস্থায় শ্বাসরোধকারী সেইসব দিন। কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর আয়োজনে আলোচনাসভা। প্রথমে বিষয় ঠিক হয়েছিল দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা ; পরে মনে হলো পুলিশের অনুমোদন না জুটতে পারে ; তাই ঠিক হলো "বিশ্বে গণতন্ত্রের সমস্যা।" বক্তা ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়। অসামান্য একটি লিখিত নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন "যে খেলার যে নিয়ম।" সেদিন ওই একটা নিবন্ধই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে আমাদের কাছে অন্যতম হাতিয়ার হয়েছিল। আর এই সভার আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় তাঁর সঙ্গে।

সেই যাওয়ার মধ্যে অনেক কৌতূহল ছিল। একজন এমন মানুষের কাছে যাওয়া, যিনি চীন-ভারত সংঘর্ষের সেই প্রবল কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার আর কুৎসার দিনে আনন্দবাজারের চক্রান্তের শরিক হননি। যাঁর ছড়া পড়তে গিয়ে মনে হতো কবিতার অন্য তবঙ্গ, যা শ্লেষে, বিদ্রূপে, পরিহাসে, যুগপ্রবাহের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে অনবদ্য। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সহজ, সোজা, ঋজু, সমৃদ্ধ—যার প্রতিটি পরতে সৃষ্টিশীল গবেষক এবং এক বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিকের যেন সহাবস্থান। বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস যেন আঙুলের ডগায়। কলম চালালেই হলো।

বহুবার, বহু বিষয়ে, দেশ ও বিশ্বের বুকে গণতন্ত্র, মানবতা আর সংস্কৃতির সঙ্কট যখন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে সে সময়ে তাঁর অভিমত, স্বাক্ষর, লেখা বা ছড়ার জন্যে গিয়েছি। কখনও কল্যাণ রায়চৌধুরী গিয়েছে। অবশ্যই তিনি ছিলেন নির্ভীক, স্বাধীনচেতা, মুক্তচিন্তার মানবিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সব সুরের সঙ্গে আমাদের সুর মিলবে এমন দাবি আমাদের ছিল না। তাই বোধহয় মিলতে আর সাড়া পেতে এবং শ্রদ্ধায় অবনত হতে অসুবিধে হয়নি আমাদের। যতদিন গিয়েছে ততই যেন অনুভব করেছি, রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে জানতে, বুঝতে, ধরতে গেলে দু'জন মানুষের কাছে হাজির হওয়াই যথেষ্ট—একজন অন্নদাশঙ্কর রায়, আর একজন হীরেন মুখার্জি। অন্নদাবাবু চলে গেলেন, কিন্তু হীরেনদা আছেন—এটাই বাঁচোয়া। বয়স যত ক্যালেন্ডারের পাতায় বেড়েছে, ততই যেন রবীন্দ্রনাথের মতোই জীর্ণতাকে অতিক্রম করে পরিণত তারুণ্যের ওজঃ শক্তিকে চিন্তা আর সৃষ্টিকে নিবেদন করেছেন দেশ, জাতি, বিশ্বমানের সার্বভৌম বিবেককে নাড়া দিতে।

গুজরাটে গণহত্যা। রাষ্ট্রপতির কাছে আশু হস্তক্ষেপের আবেদন রেখে তারবার্তায় সই নিতে গিয়ে দেখি বিছানায় মিশে থাকা শরীর, একটু হাঁ-মুখ, চোখ বন্ধ। অন্নদাবাবুর

ছায়াসঙ্গী অর্ধেন্দু যেন ওঁর মনের ভাষাও বুঝতে পারতো। অনেক পরে চিনলেন। অর্ধেন্দু বুঝিয়ে বলল। উনি অস্ফুটে যা বললেন, অর্ধেন্দুর কথামতো—সই করতে পারবো না, নামটা দিয়ে দিন। তারপর যখন বললাম—হীরেন মুখার্জি বলেছেন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার শতবর্ষ পালন করবেন—তখন তাঁর সেই মুখভর্তি হাসিটা, সে স্মৃতি ভোলা অসম্ভব। আক্ষেপ এই, কদিন পরেই শতবর্ষ পালনের নানাবিধ আয়োজন হবে, তবে তা হীরেনদার আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করবে না।

'৯২ আর '৯৬—দুটো বছরে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। তাঁর মতামত লিখেছিলেন কাঁপা হাতে। থাক সেসব সঙ্গোপনে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার মুখে গাড়িতে ওঠার সময় সেই যে বললেন—'এটা ছাড়বেন না'—এই কথাটা কত যে গভীরভাবে বাজলো সে এক অন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা! অনুজকে এমন অকুণ্ঠিত চিত্তে উৎসাহ দিতে পারেন ক'জন? তাঁর এই পরামর্শের কাছে ঋণী নয়, বাধ্য থাকাটাই যেন জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

সৌজন্যে ঃ 'গণশক্তি'

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর—এক ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি

উৎপল ঝা

তাঁর ছড়ার সঙ্গে পরিচয় বাল্যের শিশির মাখা সকালে। এক্কা-দোক্কার কোর্টে দু'পা ছড়িয়ে লাফাতে লাফাতে সাত বছরের ছোট বোন গলা ছেড়ে বলছে 'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো / তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা দেশটা ভেঙে ভাগ করো / তার বেলা'। অনেক বাধা নিষেধ-এর বেড়া ডিঙানোর একটা তীব্র ক্ষোভ সেই ছড়ার মধ্যে ঝরে পড়তো। অভিভাবকদের চোখ-রাঙানি, শাসন সব কিছুর প্রতিই এই ছড়ার মধ্যে একটা যোগ্য জবাব দেওয়ার অভীপ্সা যেন সোচ্চার হয়ে আছে। তখনই চমকিত হয়েছিলাম। তখনো জানিনা কার লেখা এই ছড়া। শিশুদের মনের একান্ত-গভীর বেদনাকে কে মূর্ত করে তুলেছেন। তারপর অবশ্য একে একে হাতে এসেছে 'উড়কি ধানের মুড়কি' 'বিন্নি ধানের খই' আরো আরো সব ছড়ার বই।

এই ছড়ার হাত ধরেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পরে শুনেছি 'পথে প্রবাসে'র কথা। পাঠ্য হিসেবে না থাকলেও পাঠ্য বইতে তাঁর কিছুটা অংশ ছিল—যেখানে লেখকের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। ক্রমে ক্রমে তাঁকে জানা।

কিন্তু কখনো ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে তা ভাবিনি। ১৯৯০ সালে সেই অভাবিত ঘটনা ঘটলো। আমি তখন কর্মসূত্রে রবীন্দ্রসদনে। রবীন্দ্রসদনের এক অনুষ্ঠানে হাজির অন্নদাশঙ্কর রায়, রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী সুমিত্রা সেন। রবীন্দ্রসদনের সেই সময়ের বাঁধাধরা ফটোগ্রাফার পোদ্দারবাবু কীভাবে যেন সবাইকে এক ফ্রেমে বেঁধে ফেললেন। অন্নদাশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তও ছিলেন সঙ্গে। সেই প্রথম পরিচয়েই এই মনস্বী আমাকে আবিষ্ট করেছিলেন। তাঁর মুখ জুড়ে প্রগাঢ় প্রশান্তি। তিনি সেদিন যেভাবে আমাদের মধ্যে নেমে এসেছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল—'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো / তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি। বাসিতে পারি যে ভালো।'

এরপর অবশ্য আরো একটু কাছ থেকে তাঁকে দেখবার সুযোগ ঘটে বাংলা আকাদেমিতে এসে। বিনয়ী অথচ স্পষ্টবাদী; শিশুর সারল্যের সঙ্গে আত্মমগ্নতা এমনতর আপাত বৈপরীত্যের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর মধ্যে দেখেছি। সর্বোপরি এমন আধুনিক মানুষও খুব কম দেখা যায়। যাচাই-এর পর তিনি যা গ্রহণীয় তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতেন। 'সবুজপত্র' তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাই—জরা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি —তিনি যেন চির সবুজ, চির নবীন।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তাঁর প্রবল অনুসন্ধিৎসা দেখা গেছে। জীবন উপলব্ধি ছাড়া জীবন-ধারণ অনেকটা দিন অতিবাহিত করা মাত্র। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর জীবন যাপন করেছেন একটা সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটে। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমি প্রাণ ভরে বেঁচেছি, সময় জুটলে লিখেছি।' তিনি যে অসংখ্য উপন্যাস, ছোটগল্প,

প্রবন্ধ এবং ছড়া লিখেছেন—সেই লেখার চেয়েও তিনি 'প্রাণভরে বাঁচাকে' সর্বাগ্রে স্থান দিচ্ছেন এ কেমন বিস্ময়কর ঠেকে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে তাঁর লেখার মধ্যে সর্বদাই কিছু জীবন উপলব্ধির বা সত্যান্বেষণের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন—'আমার সাহিত্যিক জীবনে টলস্টয়ের কাছে পেয়েছি সত্যের প্রতি অনুরাগ, রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছি সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ।' এই যে 'প্রাণভরে বাঁচা' তার সঙ্গেই লগ্ন হয়ে আছে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। 'অল্প বয়স থেকেই দুটি জিনিসকে বড়ো বলে জেনেছি, একটা হচ্ছে নরনারীর প্রেম, আর একটা আর্টের প্রতি অনুরাগ—' এই দুইয়ের মধ্যেই তিনি নিজের জীবনকে তাঁর প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। দেশভাগের বেদনা তিনি সর্বদা বহন করে গেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে এপার বাংলার সাহিত্যচর্চার ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁর কাছে সর্বদা শোনা গেছে। তিনি দুই বাংলার জাতিসত্ত্বার অভিন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষাই পারে সমস্ত বিভেদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে। আমাদের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বার বার তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতাকে মনেপ্রাণে করেছেন ঘৃণা।

তিনি বিশ্বাস করতেন আর্টের অন্তঃসার জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যে। তাঁর জীবন, কর্ম ও সাধনায় এই অন্তর্নিহিত সত্যে পৌঁছানার জন্য প্রায় শতবার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন বলেই তিনি আমাদের কাছে ক্রান্তদর্শী এবং মনস্বী।

—

ভাষা সংস্কৃতি দুই বাংলার বাঙালিকে এক করতে পারে

কাজল চক্রবর্তী

আমাদের বয়স্ক বন্ধু অন্নদাশঙ্কর বার্ধক্য-অসুখ বাদ দিলে সম্পূর্ণ সুস্থ। এখনও বিশ্ব-সংবাদ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ প্রচুর। সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখা ডিক্টেশন দেন। দু' বাংলায় সমান আদৃত এই মানুষটি দেশভাগ না হলে আমৃত্যু থাকতে চেয়েছিলেন কুষ্টিয়ায়। এই ইচ্ছে নিয়ে আমার প্রয়াত বান্ধবী কবি নাসিমা সুলতানার গর্ব ছিল খুব। ও বলেছিল—'ওই মানুষটাকে আমি আমার একটা ছড়ার বই উৎসর্গ করবো।' নাসিমা সে সুযোগ পায়নি। একদিন ওনাকে এই কথা বলাতে অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন. কোন কথা বলেননি।

অন্নদাশঙ্কর জন্মেছিলেন ১৫ মার্চ ১৯০৪ উড়িষ্যায়। পড়াশুনা উড়িষ্যায়। চাকরির জন্য এসেছিলেন বঙ্গে। সিংহভাগ কেটেছে বর্তমানের বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্যাখা হয় বর্তমানের বাংলাদেশেই। তাঁর ইচ্ছে ছিল কবি হবার। গেলেন গদ্যে, প্রচুর লিখলেন, তাঁর যে চাকরি সে চাকরিতে গদ্যে ওইসব চরিত্র চিত্রণ সম্ভব ছিল না। আমরা পেলাম শরৎবাবুর গ্রাম্য চরিত্র ছাড়া সাহিত্যে এমন সব চরিত্র তারা সদর্থেই মধ্যবিত্ত। বিশ্বপ্রেম ছাড়া এই চরিত্র চিত্রণ অসম্ভব। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার যথার্থ মিশ্রণ দ্যাখা যায় তাব জীবন ও সাহিত্যে। আমি নিশ্চিত অন্নদাশঙ্করের অনেক বন্ধু এখনও বাংলাদেশে বর্তমান। তাঁকে রমনা ময়দানে যদি আবার শেখ মুজিবের মত মঞ্চ করে কিছু বলতে বলা হয় তাহলে তিনি অকপটে জানাবেন বাংলা ভাগ করা ঠিক হয়নি, বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছে এই দেশভাগ। ভাবা যায় ফজলুল হকের সরকার বিশ্বাসঘাতক মনে করে বদলি করেছিল এমন স্থানে, যেখানে তিনি যোগ দেবার পরে অপমানিত বোধ করে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। উদ্দেশ্য সবটা সফল না হলেও কিছুটা সফল তো হয়েছিল ফজলুল হক সরকার। পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়েছিল তেলের শিশি ভাঙল বলে, খুকুর পরে রাগ করো ছড়াটি। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে লেখা 'কাঁদো প্রিয় দেশ' গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশে। যে বাংলাদেশ তাঁর এত প্রিয় সেই বাংলাদেশ থেকে পাওয়া এই আঘাত তিনি ভালভাবেই হজম করেছেন। তাঁকে বহুবার এ প্রসঙ্গে নিয়ে এসেও কোন সদুত্তর পাইনি। তিনি এখনও বিশ্বাস করেন, 'ভাষা ও সংস্কৃতি দুই দেশের মানুষের মিলন ঘটাতে পারে। ধর্ম বা অন্য কিছু নয়।' সম্প্রতি গুজরাট প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ধর্মের নামে দেশে হচ্ছেটা কী? আমরা কি বাঁচবো?'

বয়েসে অনেক অনেক তরুণ পদ্য লেখক হিসেবে যদি আজ দুই বাংলার বাঙালিদের প্রশ্ন করি, এই তাপসকে আমরা কী যথাযথ মর্যাদা দিতে পারলাম? ক'জন এখনও বিশ্বাস করেন, 'ধর্ম নয়, ভাষা ও সংস্কৃতি দুই দেশের মানুষের মিলন ঘটাতে পারে।' সম্ভবত সে সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। না হলে আমার সম্পাদনায় 'প্রামাণ্য অন্নদাশঙ্কর রায়' বইটি প্রকাশের তোড়জোড় করে বাংলাদেশের কোন লেখকের লেখা সময়মত পেলাম না কেন? এর কারণ কি আমি নিজে, নাকি অন্নদাশঙ্কর।

সৌজন্যে : 'বিচিত্রা', বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ২৬.৭.০২

প্রদীপ্ত আত্মার প্রবাদ স্রষ্টা ঃ অন্নদাশঙ্কর

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

সুদূর শৈশবে বাস্তুছাড়া হওয়ায় স্মৃতিকাতর বাবা-মাকে ঘুম পাড়ানি ছড়ার আঙ্গিকে বলতে শুনেছি,—

'তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যেসব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা?'

বাংলা ভাগ তথা ভারত ভাগ কোনোমতেই মানতে পারেননি অন্নদাশঙ্কর। অখণ্ড ভারত তথা অখণ্ড বাংলার সজীব স্মৃতি তিনি লালন করেছেন সস্নেহে। মানুষের সনাতন মূল্যবোধকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। দিয়েছেন বলেই হিন্দু বা মুসলিম বা অন্য কোনো ধর্ম পরিচয়ে নয়—অন্নদাশঙ্কর মানুষের তৈরি ধর্মের গণ্ডি অতিক্রমকারী আদ্যন্ত আধুনিক মন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। হজরত মহম্মদকে নিয়ে আপত্তিকর রচনার কারণে বাংলাদেশে অবাঞ্ছিত বর্তমানে জার্মানির নাগরিক দাউদ হায়দারের মত নাস্তিককে তিনি নিজের কলকাতার বাড়িতে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিয়েছেন, স্পষ্ট মেয়ে তসলিমা নাসরিনের নষ্ট গদ্যের তিনি এক সাহসী পাঠক।

যে মানুষ নিজের জীবনকালেই স্বীয় রচনাকে প্রবাদের আঙ্গিকে ফিরে পান তাঁকে আমরা প্রবাদ পুরুষ যদি নাও বলি প্রবাদস্রষ্টা পুরুষ নিশ্চয়ই বলতে পারি। অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পর্কে আমার আগ্রহ তেলের শিশির সঙ্গে পরিচয়ের প্রায় সমসাময়িক। বাংলা এবং ভারতেব বিভাজকদের তিনি যেমন সমালোচনা করেছেন সেইরকমই আবেগ আপ্লুত অবস্থায় বাংলাদেশের জন্মের সময় তিনি মুজিবর রহমানকে নিয়ে ছড়া কেটেছেন।

আত্মপ্রচার এবং প্রতিষ্ঠার তাগিদে অন্নদাশঙ্কর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো নির্লজ্জ আপোষ করেছেন বলে কখনো শুনিনি। হয়ত এই কারণেই যতখানি প্রতিষ্ঠা তাঁর দীর্ঘজীবনে প্রাপ্য ছিল তা তিনি পেলেন না। গুজব শুনেছি—রাজনীতির কারিগরদের ধামা ধরে জনৈক বাম-ডানপন্থী বুদ্ধিজীবী অন্নদাশঙ্করকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে শিরোপা পান। গুজবের সত্যমিথ্যা জানি না, তবে পরবর্তী সময়ে পর [illegible] থেকে মনে হয়েছে এই গুজবের সত্যতা আছে। নিজের লেখালিখি নিয়ে অত্যন্ত স [illegible] মানের কবি লেখকেরা যে ধরনের আচার-আচরণ করেন—সেটা অন্নদাশঙ্করের প [illegible] অকল্পনীয় মনে হয়েছে। পশ্চিমবাংলা, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্বের যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া থেকেছে স্পষ্ট। কোনো রাজনীতিবিদের লালচোখ বা নিঃশব্দ চাহনিকে তিনি মতামত প্রকাশের বাধা বলে মানেননি।

কয়েকবার তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য পাওয়া গেছে। ১৯৮২ সালে বিধাননগরে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা ATI-তে তরুণ আই. এ. এস. ও ডাব্লু. বি. সি. এস. অধিকারিকদের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে এসেছিলেন। অন্নদাশঙ্করের চলন বলনের মধ্যে যে স্নিগ্ধ দার্ঢ্য ছিল তা আমাকে চমৎকৃত করেছিল। পরে, ভারতীয় ভাষা পরিষদে একবার সারাদিন বাংলা ছড়া উৎসব হয়েছিল। দুশো'র বেশি ছড়াকার বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। প্রবল শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে টানা দেড়ঘণ্টা মঞ্চে বসেছিলেন অসুস্থ এবং উজ্জ্বল অন্নদাশঙ্কর---যে সময় চিকিৎসকেরা তাঁকে দশ মিনিটের বেশি মঞ্চে বসে থাকার অনুমতি দিতে পারেননি। স্মৃতিতে স্পষ্ট থাকবে আমার ছড়া শুনে আনন্দময় হয়ে ওঠা অন্নদাশঙ্কর এবং তাঁর তীব্র করতালি।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে অন্নদাশঙ্কর বিশেষভাবে নিয়মতান্ত্রিক। তাঁর রুটিন খুব স্পষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর বাড়িতে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা জানেন অন্নদাশঙ্কর কোনোরকম বাহ্যিক আড়ম্বরে বিশ্বাসী নন।

বাংলা তথা ভারত বিভাজনকে কিছু মানুষ কোনোদিনই মানতে পারেননি। অন্নদাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে একজন। ভারতের শাশ্বত সনাতন মূল্যবোধ তাঁর মধ্যে মূর্ত। আন্তর্জাতিক শক্তির কূটচালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন ঘটলেও সেই বিভাজন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভারতীয় মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে ভারত বিভাজন এবং বাংলা বিভাজনকে কার্যত তিনি অস্বীকার করেছেন। অখণ্ড ভারত তথা অখণ্ড বাংলার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার অন্যতম প্রমাণ বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য। এই সখ্যের কারণে তিনি বহু আত্মীয়তা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। একসময় তাঁর কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, তিনি নাকি বাংলাদেশের মুসলিমদের এজেন্ট। ভাবতের হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলিম ছেলেদের বিবাহের তিনি অন্যতম প্রধান অনুঘটক এবং পৃষ্ঠপোষক। এই সমালোচনার কারণ কি সম্পূর্ণ ঈর্ষাবশত নাকি কোনো কারণবশত—তা আমার জানা নেই। তবে যে প্রদীপ্ত আত্মা প্রথাগত ধর্মে আস্থাশীল নয়, কৃত্রিম রাষ্ট্রিক বিভাজনে বিশ্বাস করেন না---তাঁব ক্ষেত্রে এটা খুব অস্বাভাবিক বলেও মনে হয় না

কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর রচনা প্রবাদের চেহারা পেয়েছে। যতদিন ভারত তথা বাংলা খণ্ডিত থাকবে ততদিন প্রদীপ্ত আত্মার প্রশ্ন শোনা যাবে—দেশ ভাগের বিরুদ্ধে, বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম বিভাজনের বিরুদ্ধে। অন্নদাশঙ্কর অমরত্ব অর্জন করেছেন--তাঁর মৃত্যু হবে না।

সৌজন্যে ঃ 'সাংস্কৃতিক খবর'

ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রখর তর্জনী

শুভময় মণ্ডল

এই সেদিন, গত বসন্তের সূচনায় সবরমতীর দু-পাশ জুড়ে নগর আমেদাবাদ জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ হয়ে উঠল। আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার-এর বইপত্র খুলে দেখি, আমেদাবাদ তো জল্লাদের নন্দনকানন বিশেষ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রায় প্রতি দশকেই জল্লাদেরা সেখানে আহ্লাদে উল্লম্ফন করেছে। কী মনে হলো জানি না, পাশাপাশি একবার খুলে নিয়ে পাতা সরাতে লাগলাম অন্নদাশঙ্কর রায়-এর 'ছড়া সমগ্র'-র।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এই উপমহাদেশের এই দেশের মাটিতে যখনই নখদাঁত বসাবার সুযোগ পেয়েছে, যখনই রক্তের আস্বাদে ঠোঁট চেটেছে আহ্লাদে-উল্লাসে তখনই তর্জনী তুলেছে অন্নদাশঙ্করের ছড়া। কখনও তীব্র ব্যঙ্গে, কখনও আত্মতিরস্কারের শব্দমালায়। ভাবলাম এহেন যে আহমেদাবাদ, তাকে নিয়ে কিছু, কখনও কি লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর। আশ্চর্য, পাতা ওলটাতে ওলটাতে বেরিয়ে পড়ে ১৯৬৯-র আহমেদাবাদ। একাগ্নী শরের মতো অন্নদাশঙ্করের শব্দসমাহার, বিঁধতে যাদের কখনও লক্ষ্য ভুল হয় না।

আহা মদ বাদ
মাংসও বাদ
মৎস্যও বাদ
বল্লভাচারী জৈনপীঠ!
তবুও তনুতে
অণুতে অণুতে
রক্তের স্বাদ
পেতে চায় কেন হিংসাকীট!
গান্ধী শতকে
চোখের পলকে
যা তুমি দেখালে
পিতৃঋণের সে অবদান
শুনে মনে হয়
পছন্দ নয়
মুছে দিতে চাও
তোমারও নাম মুসলমান!

সাম্প্রদায়িক হানাহানির মুহূর্ত এলেই অন্নদাশঙ্করের ছন্দ যেন তিরস্কারের বাঘনখ পরে নেয় আঙুল জুড়ে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে চিহ্নিত করে ফালাফালা করতে চায়, কখনও বা আত্মতিরস্কারে নিজেকেও রক্তাক্ত করে। শেষোক্ত প্রবণতার উদাহরণ হিসাবে

'খুকু ও খোকা' (তেলের শিশি ভাঙল বলে)-র দু-এক পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা বাহুল্য হবে। এসব পঙ্‌ক্তি এখনও আর বলে দিতে হয় নাকি! দেশভাগ নিয়ে, নজরুলকে নিয়ে তাঁর ছন্দ নিজের হৃদস্পন্দনের মতো চেনে বাংলাদেশ ও বাঙালি।

নিজের বিভিন্ন মত নিয়ে আশ্চর্য ঔদার্য ছিল অন্নদাশঙ্করের। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও মৌলবাদী আধিপত্যের প্রশ্নে, নিজের অবস্থান থেকে একপাও নড়তে নারাজ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রশাসনিক পদ ছাড়ার সেই ঘটনাও এখন ইতিহাস হয়ে আছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তখন তিনি মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাঁকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডেকে এনে নির্দেশ দেওয়া হলো, একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের তাড়িয়ে দিতে হবে। মন্ত্রীর লিখিত আদেশ চাওয়া হলে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, মৌখিক আদেশই যথেষ্ট, লিখিত আদেশ মিলবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় নিজে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। অন্নদাশঙ্কর আত্মসমর্পণ করেননি। তখনই স্থির করে নিয়েছিলেন প্রশাসনিক চাকরিতে ইতি টানার সময় এসেছে। দুই সম্প্রদায় সম্মিলনের ব্রতই তাঁর জীবনব্রত। তার থেকে এতটুকু বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দেবেন না তিনি।

সম্প্রীতির ব্রতে তিনি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী থেকে লালন ফকিরের কাছে আনত হয়েছেন। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, 'আমি গান্ধীবাদী নই। রবীন্দ্রবাদীও নই। আমি প্রেমবাদী, সৌন্দর্যবাদী।' দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে গান্ধীর সকল মতবাদকে তিনি নির্বিশেষে মেনে নেননি। তেমনই এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাছে অবিমিশ্রভাবে গৃহীত হয়নি। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথও পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। পরে 'গোরা' লিখে তিনি তাঁর সাবেক মনোভাবকেই বিশ্লেষণ করে দেখান ও তার থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন।' সুতরাং অন্নদাশঙ্করের প্রণম্য সেই রবীন্দ্রনাথ, যে রবীন্দ্রনাথ গোরার মধ্য দিয়ে তাঁর ভারতবর্ষকে খুঁজে নিয়েছেন : 'তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

এই ভারতবর্ষকে, এই কল্যাণের প্রতিমাকে তো চোখের সামনে ভেঙে যেতে দেখেছেন বিগত শতকের প্রায় সমবয়সী অন্নদাশঙ্কর। তখন তিনি কখনও কুষ্টিয়া, কখনও রাজশাহী, কখনও মৈমনসিংহ-এ। নিজেকে, নিজেদেরকে ক্ষমা করেননি অন্নদাশঙ্কর। আমরা বলেছিলাম, আত্মতিরস্কারে অন্নদাশঙ্করের ছন্দ প্রায়শই নিজেকেও বক্তাক্ত করে :

দাদু, এ তো বড় রঙ্গ
    দাদু, এ তো বড় বঙ্গ!
তোমরা তখন করছিলে কী
    ভাঙল যখন বঙ্গ?

দিদি, আমরা তখন করতেছিলেম
ভা'য়ে ভা'য়ে দঙ্গ
আপন যদি পর হয়ে যায়
ঘর হয়ে যায় ভঙ্গ।

স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিকল্পিত দাঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন কুনাট্যরঙ্গ বারংবার রক্তাক্ত করেছে অন্নদাশঙ্করকে। তিনি প্রতিবাদ করেছেন, ব্যঙ্গের শাণিত তর্জনী তুলেছেন এবং ক্রমশ প্রগতিশীল শক্তির দিকে তাঁর সমর্থন স্পষ্ট করেছেন।

১৯৯০ সালে লালন ফকিরকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "কবি লালনের চেয়ে 'মহাত্মা' লালন অনেক, অনেক বড়ো। ডাকটিকিট বার করতে পারলে মহাত্মা বলে তাঁর পরিচয় দিতুম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। ডাকটিকিট প্রকাশ করা তার সাধ্যাতীত। ভারত সরকারকে এ নিয়ে অনুরোধ করতে ভরসা পাইনে। আবেদন নিবেদন আমাদের স্বভাব নয়।" সকল ধর্মের লোকের আপনজন ছিলেন বলেই একদা 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদক লালনের আগে মহাত্মা বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলেন। বিশেষণটি ভারী পছন্দ হয়েছিল অন্নদাশঙ্করের। '৯০ সালে এ লেখার পরই '৯২-এ অন্নদাশঙ্করকে দেখতে হলো বাবরি মসজিদ নিয়ে দাঙ্গা। অন্নদাশঙ্কর ৯০-এর দাঙ্গার নিটোল পাঠ নিতে পেরেছিলেন। অনুভব করেছিলেন প্রগতিবাদী শক্তির পক্ষে নিপাট সমর্থন ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা।

বিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালির অন্যতম অভিভাবক অন্নদাশঙ্কর একুশ শতকের পথ চেয়ে প্রগতিবাদীদের সতর্ক করেছেন ঃ আগামী শতাব্দীর নারী ও শূদ্রের জন্যে পরিবর্তনের বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে। যারা ধর্মের নামে যুগধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে নামবে, এটাকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিলে তাদেরই সুবিধা। যে বিবাদটা মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের। সেটাকে মনে হবে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের। যে বিরোধটা হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর। সেটাকে মনে হবে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর। সুতরাং প্রগতিবাদীদের সতর্ক থাকতে হবে। যেমন এপারে তেমনি ওপারে (১৯৯৩)। লালন ফকিরকে নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন '...হিন্দু মুসলমানের মিলন আমার চিরদিনের কাম্য। এ বই যদি মিলনের সহায় হয় তবে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এই লেখা ৭০ দশকের। দুই দশক পরে এসে তিনি প্রগতিবাদীদের সপক্ষে কণ্ঠস্বর আরও সোচ্চার করলেন। পরম অভিভাবকের প্রজ্ঞায় সতর্ক করলেন তাদের।

নিজেকে অন্নদাশঙ্কর চিনেছিলেন রবীন্দ্রবাদী নয়, গান্ধীবাদী নয়, ইউরোপপ্রেমিক হিসেবেও নয়, সহজিয়া বাউল ফকিরদের আপনজন হিসেবে। বলেছিলেন, বাউল ফকিরদের সঙ্গে আমার affinity আছে। সুফিদের সঙ্গেও। একুশ শতকের সূচনাকালে একতারা নামিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন। ভেদবুদ্ধির কারিগররা যখন আরও নির্লজ্জ, আরও নখর। তিনি চলে গেলেও জেগে থাকল প্রখর তর্জনী মৌলবাদের বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।

সৌজন্যে ঃ 'গণশক্তি'

স্মৃতিচারণ ঃ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

পোশাকে-আচরণে শৃঙ্খলাপরায়ণতায় পুরোদস্তুর সাহেব। কিন্তু মনে-মননে, চিত্তে-চিন্তায় পাক্কা ভারতীয়। 'বাঙালি' বললাম না। কারণ প্রাদেশিকতা তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত অরুচিকর। আমি তাঁকে যা দেখেছি তাতে বলতে পারি, তাঁর মত আন্তর্জাতিক মানসিকতার মানুষ আমি খুবই কম দেখেছি। অতিরঞ্জন নয়, বলতে পারি, এমন মননশীল, উদার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আমি কমই দেখেছি। শিশুকাল থেকে তাঁকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি। প্রায় এক দশকের ওপর তিনি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্বিশেষে প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে আসতেন। সেই পঞ্চাশ-ষাট দশকের শান্তিনিকেতনে। তাঁর ক্ষীর্ণতনু দেখলে মনে হত, বড্ডই দুর্বল উনি। কিন্তু তাঁর শারীরিক সামর্থ্যও ছিল প্রবাদতুল্য। অত্যন্ত স্বল্পাহারী। সন্ধ্যে ৬টায় নৈশাহার করে নিতেন। তারপর আসতেন আমাদের বাড়ি। ২/৩ কিলোমিটারের মত রাস্তা। কোনদিন তিনি না এলে আমার বাবা তাঁর খোঁজে বেরোতেন। পরে জানা যেত, তিনি হঠাৎ বিশেষ কাজে আটকে পড়েছেন। ঠিক সন্ধ্যা ৬-৩০ নাগাদ আসতেন। আমার বাবা তাঁর অত্যন্ত সুহৃদ। আমার বাবা অধ্যাপক সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বেদ-বেদান্তে সুপণ্ডিত মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য শুকনো ছিল না, ছিল রসে টইটম্বুর। অন্নদাশঙ্করের হাসি ছিল অত্যন্ত বিরল ব্যাপার কিন্তু আমার বাবার রঙ্গ-রসিকতায় তিনি খুবই হাসতেন। তাঁকে কখনও অট্টহাস্য করতে দেখি নি। উপনিষদ, বেদবেদান্ত সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে তিনি সোজা প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসত পথেব প্রহরী, সারমেয়কুল। কুলিন কোন সারমেয় তাঁর পোষ্য ছিল না। কিন্তু পথের সারমেয়দের তিনি যে কত ভালবাসতেন তা বোঝা যেত, তাঁর সঙ্গী ওই পল্লী সারমেয়দের ঘনঘন লাঙ্গুল আন্দোলনে।

আপাত কঠিনদর্শন, অতি গম্ভীর মানুষটিকে দেখে কেউ বুঝতেই পারতেন না, তাঁর ভেতরে কত না দরদ লুকিয়ে আছে! আমার বাবা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ শিষ্য। তাই রবীন্দ্রনাথের কথাও তিনি সর্বদা শুনতে চাইতেন। শাস্ত্র অথবা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি পেতেন আমার বাবার কাছে। দুজনের কথা যেন ফুরতেই চাইত না। সময়-সচেতন অন্নদাশঙ্করের হঠাৎ খেয়াল হত, সময়ের কাঁটা তাঁর নির্ধারিত সময়কে পেরিয়ে যাচ্ছে। 'আচ্ছা চলি' বলে এগোতেন। বাবা বলতেন, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। মজার ব্যাপার, ওঁর রতনপল্লীর বাড়ি অবধি বাবা এগোতে যেতেন। উনি সহবত দেখাতে ফের বাবাকে এগোতে আসতেন। আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এসেই পড়তেন। আমার বাবা সহবত দেখাতে আবার তাঁর সঙ্গে যেতেন। এইভাবে মাঝে মাঝে চার-পাঁচবার এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে-যাওয়া চলত। তখন ঘড়ির কাঁটা

সম্পর্কে অতি সচেতন দুই মননশীল মানুষেরই আর খেয়াল থাকত না। আমার বাবার নৈশাহারের সময় ছিল ৮টা। তা কখন জানি পেরিয়ে যেত। অন্নদাশঙ্কর খুব লজ্জিত হয়ে বলতেন, ইস্ আপনার ডিনারের সময় পেরিয়ে গেল। দুঃখিত। বাবা বলতেন—তা হোক। আলোচনা আজ যা হল, তা খাওয়ার সময় না পেরিয়ে গেলে তো আর হত না। খাওয়া তো রোজই আছে।

অন্নদাশঙ্কর বলতেন—কাল থেকে ৮টার মধ্যে আলোচনা সেরে ফেলতে হবে। কথামত তাই হত পরের দিন। কিন্তু ২/৩ দিন পর আবার সেই 'আপ পহলে'-র লক্ষ্ণৌ সহবত দেখাতে দেখাতে খাওয়ার সময় পেরিয়ে যেত। আমরা ভাইবোনেরা হেসে কুটিকুটি হতাম দুই বুদ্ধিমার্গী মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে। এখন অনুতাপ হয়, অপরিণত তখন বয়স, তাই ওই আলোচনার নোট নিয়ে রাখি নি। তখন টেপের চলনও এ দেশে তেমন করে হয়নি। থাকলে ওই আলোচনা একটা মূল্যবান দলিল হয়ে থাকত। খুব শিশুকালে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন রীতিমাফিক আমরা ভাইবোনেরা অন্নদা শঙ্করকে 'অন্নদাদা' ডাকতাম। কিন্তু অন্নদাদা না বলে বলে ফেলতাম 'অন্নদা'। ভাবতাম, ওঁর নাম অন্ন, তার সঙ্গে 'দা' (দাদা) জুড়ে 'অন্নদা'। বাবা কয়েকবার শুধরেও আমাদের সম্বোধনের ত্রুটি দূর করতে পারলেন না। তখন বললেন—না, শান্তিনিকেতনী 'দাদা' ওঁর ক্ষেত্রে চলবে না। উনি 'জ্যেঠামশাই'। আমার বয়সী হলেও মননে উনি অনেক বড়। উনি বাংলার লেখার জগতের জ্যেঠামশাই। তোমাদেরও। সেই থেকে ওঁকে জ্যেঠামশাই ভাবতাম।

শেষদিন পর্যন্ত ওঁর স্নেহ পেয়েছি। যদিও দেখা-সাক্ষাৎ কমই হত। আমার লেখালেখিতে দারুণ উৎসাহ যোগাতেন। আমার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ দেখে দারুণ খুশি। তখন বাবা নেই, ওঁর কাছ থেকে দারুণ প্রশংসা পেয়েছি। উনি বই পড়ে এতই আনন্দ পেয়েছিলেন যে আমাকে মস্ত একটা চিঠিই লিখে ফেললেন। চিঠিটি অতি সযত্নে রেখেছি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই আমার সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশ ঘটেছিল। সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষকে তিনি আমার সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার ওই বইটি তিনি গৌরদাকে দেন। বই পড়ে উৎসাহিত গৌরকিশোর ঘোষ আমাকে আহ্বান জানান, তাঁর নতুন কাগজ 'আজকাল'-এর জন্য। সে অন্য ইতিহাস। কিন্তু ওঁর মত বড় মাপের মানুষ আমার মত অর্বাচীনের লেখার যেরকম ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, তা অত্যন্ত বিস্ময়ের। শুধু 'বন্ধুকন্যা' বলে নিশ্চয় তিনি অতবড় সার্টিফিকেট দেন নি। আসলে, একজন বর্ষীয়ান, মহান মননশীল মানুষ অর্বাচীন হলেও তাঁর আন্তরিক চেষ্টা বা কৃতিত্বের মূল্য দিতে কুণ্ঠাবোধ বা কার্পণ্য করেন না। উত্তম নিশ্চিন্তে চলেন অধমের সঙ্গে। যাইহোক ৫০ দশকের শেষ সময়। একদিন প্রচণ্ড উত্তেজিত দেখলাম জ্যেঠামশাইকে। বাবাকে উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছেন। ওঁকে অস্থির হতে কখনও দেখিনি। পড়ছিলাম। কান কিন্তু ওইদিকে। উনি বললেন—সিনেমা পত্রিকা আমাকে লিখতে বলছে। সঙ্গে আগাম মোটা অঙ্কের টাকাও পাঠিয়েছে। কী করি বলুন তো?

সিনেমা পত্রিকায় কী লেখা উচিত? যে সিনেমা পত্রিকার নাম করলেন, সেটি লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখতাম আমরা। শুধুই তারকাদের কেচ্ছাকাহিনী। কোন উঁচুদরের লেখক সম্ভবত সে সব পত্রিকায় লিখতেন না। তখন বাবা বললেন—ওইসব পত্রিকায় সিনেমার নায়ক-নায়িকার কেচ্ছাকাহিনী থাকে শুনেছি। দেখি নি কখনও।

—আমিও তো দেখি নি। শুনেছি, ওদের অনেক পয়সা।

—আমার তো মনে হয় না কোন বোদ্ধা-পাঠক ওইসব পত্রিকা পড়ে। ভেবে দেখুন। লেখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাই ভাল।

—আমিও ভেবেছি। তবু আপনার মত নিলাম। কালই মানি অর্ডার করে টাকা ফেরৎ দিচ্ছি। লেখার প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগ—সবিনয়ে জানিয়েও দেব।

পরের দিন এলেন। আবার সেই চিরাচরিত প্রশান্তি মুখে। বললেন—'ঘাড় থেকে বোঝা নামল। টাকা ফেরৎ দিয়েছি।'

অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল ওঁর। ৯৭ বছর বয়সেও সাল তারিখ, কারও বয়স সঠিক বলতে পারতেন। বহুদিন পর তাঁর ওখানে গেছিলাম একদিন। সঙ্গে এক বন্ধু। আমাদের পারিবারিক সংবাদ নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বলতে লাগলেন। আমার ভাইবোনদের সবার সম্পর্কে সঠিক খবর নিজেই বললেন। যেটুকু জানতেন না, জেনে নিলেন। আমার বন্ধু বেরিয়ে এসে বললেন—উনি সব ঠিকঠাক বলছিলেন?—একদম ঠিক। বয়স ওঁর এখন কত বলো তো? প্রায় ৯৭। ভাবা যায়? সুদীর্ঘজীবনে মানুষের স্মৃতি ও মতি—দুটোরই বিভ্রম হয়। ওঁর কোনটাই হয় নি। ভেবেছিলাম, উনি শত বসন্ত পার করবেন। তা হলো না। ওঁর জন্ম বসন্তে। আমার বাবা আর ওঁর জন্মদিন (বাংলা তারিখমত) একই দিনে। দুজনেরই ফাল্গুনে জন্ম। দুজনের মনেই ছিল চিরবসন্ত। শীতের প্রবেশ ঘটেনি ৯৮ বছর পেরিয়েও। পিতৃবিয়োগের পর ওঁকেই অভিভাবক মনে হত। ওঁর মহাপ্রয়াণে আমি অভিভাবকহীন হলাম।

পর্যটক সাহিত্যিক—অন্নদাশংকর রায়

সজলকান্তি জানা

ওড়িশার ঢেঙ্কানালে জন্মগ্রহণ করেন অন্নদাশঙ্কর। পিতা নিমাইচরণ মাতা হেমনলিনী দেবী। শৈশব থেকেই তিনি লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন এবং প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিলেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতকস্তরে প্রথম স্থানাধিকারী হন।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিক 'পথে প্রবাসে' লিখে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হন। এর পরেই পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও স্পষ্ট যুক্তিবাদী মানসিকতার ধারাবাহিক উপন্যাস 'সত্যাসত্য' লিখে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যরসিকদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দেই আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিলেত চলে যান। ১৯২৯ অবধি সেখানে থেকে 'লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ', 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স', 'লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগদান করেন। ইতিমধ্যে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখে ফেলেছিলেন 'তারুণ্য' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ—যা ছিল প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও সমন্বয়ের বিশ্লেষণ। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে 'আগুন নিয়ে খেলা' উপন্যাস লিখে সমগ্র পাঠকসমাজকে করে তুললেন চমকিত। ঐ বছরেই মার্কিন মহিলা 'অ্যালিসকে' বিবাহ করলেন এবং তাঁর নাম দিলেন লীলা রায়।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ অবধি অবিভক্ত বাংলায় জেলা মেজিস্ট্রেট, জেলা জজ প্রভৃতি পদে কর্তব্যবত থেকে একের পর এক লিখে চললেন উপন্যাস, প্রবন্ধ, গদ্য, ছড়া, কবিতা, কাব্যনাট্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও কিশোর উপন্যাস। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ছিলেন এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্র্যাক্স ট্রাইবুনালের সভাপতি। ১৯৫০-এ রাজ্যের জুডিসিয়াল সেক্রেটারী ও কলকাতার লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার। তিনি আদ্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী মানসিকতার জন্য কর্মস্থলে মতের অমিল হওয়ায় নিজেই চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।

হাতে অফুরন্ত সময় পেয়ে লেখালেখি এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লিখেছিলেন তৎকালীন দেশবিদেশের নানান পটভূমিকায় সৃষ্ট সমস্যা সমূহের সমাধান সূত্র। সমস্তরকম সংস্কার ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি এদেশে উদার সংস্কৃতির প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। দেশের মূল ব্যাধি 'অস্পৃশ্যতা' দূরীকরণের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি সমস্ত মানুষের শুভবুদ্ধির আগমন ঘটানোর প্রতি আবেদন জানান।

অন্নদাশঙ্করের 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাঙাধানের খৈ', 'ডালিম গাছে মৌ', 'শালিধানের চিড়ে'—ইত্যাদি ছড়াগুলি যেমন আমাদের মুগ্ধ করেছে তেমনই 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাস, 'পথে-প্রবাসের' মতো ভ্রমণকাহিনী এবং 'সাহিত্যে সংকট'-এর মতো বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যকে করে তুলেছে সমৃদ্ধতর।

২৮শে অক্টোবর ২০০২ তিনি আমাদের অভিভাবকহীন করে চলে গেলেন। তাঁর রচনাশৈলীর উপাদান থেকে প্রেরণা ও শিক্ষা নিয়ে যদি আমরা জাতির উন্মেষ ঘটাতে পারি তবেই হবে তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শন।

পিতা অন্নদাশঙ্কর ঃ কিছু অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র

জয়া রায়

বাবাকে আমরা পেয়েছি একান্ত আপনজন রূপে। তাঁকে যেমন সমীহ না করে থাকা যায় না, তেমনি ভালোও না বেসে পারা যায় না। পৃথিবীতে যতরকম বিষয় আছে সব নিয়েই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা যায়, আবার গল্প করতেও বাধে না কেননা তিনি যে আমাদেরই একজন—এক্কেবারে আমাদের নাগালের মধ্যে।

তিনি একাধারে স্নেহময় এবং ক্ষমাশীল পিতা। ছেলেমেয়েদের মারধোর করে শাসন করায় বিশ্বাস করতেন না, পারতেনও না। রাগ করে মেজাজ হারাতে তাঁকে কখনো দেখিনি। কোনও বিষয়ে বিরক্ত হলে মাত্র একেবারই কঠিন গলায় শান্তভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন—তাঁর সেই কণ্ঠস্বরকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে কার সাধ্য।

আমি তখন বাংলা সাহিত্যের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছি। বাবার সতর্কবাণী সত্ত্বেও একটা ভালো করে জানা প্রশ্ন কি করে যেন প্রশ্ন পত্রের উল্টোপিঠে আত্মগোপন করে থেকে আমাকে বোকা বানিয়ে দেয়। আবিষ্কার করেন বাবা। যখন বুঝতে পারলুম আশানুরূপ ফললাভ হবে না আমি জেদ ধরলুম, পরীক্ষা দেব না। আমার কান্নায় শেষ পর্যন্ত মার মন গলে গিয়েছিল। কিন্তু বাবা খুব কঠিন গলায় বললেন, "ফেল করলে কিছু বলব না, কিন্তু পরীক্ষা দিতেই হবে।" বাবার কণ্ঠস্বরেই মালুম হয়ে গেল যে অস্ত্রে মাকে ঘায়েল করেছি সে অস্ত্র এখানে খাটবে না। অগত্যা চোখের জল মুছে পড়ার টেবিলে ফিরে গেলুম। বাবাকে তখন নির্মম মনে হলেও পরে বুঝতে পেরেছিলুম তিনি সেদিন ঠিকই করেছিলেন। কোনও একটা ভুল বা অপরাধ করে ফেললে বাবার কাছে ক্ষমা চাইলেই বাবা সস্নেহে ক্ষমা করতে এগিয়ে আসেন। বস্তুতঃ বাবার মত ক্ষমা চাইতেও আমি কাউকে দেখিনি। যদি কখনও তাঁর মনে হয়েছে কারও প্রতি ঠিক সুবিচার করা হয়নি তবে তৎক্ষণাৎ ছোটবড় বিচার না করেই মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে নিতে তাঁর জুড়ি নেই। 'আমি পিতা, ছেলেমেয়েরা আমাকে সম্মান করতে বাধ্য' অথবা 'আমি কর্তা, সকলে আমার হুকুম মানতে বাধ্য'—এরকম মনোভাব কখনও তাঁর মধ্যে আমরা দেখিনি। বরং তাঁকে এক গ্লাস জল এনে দিলেও তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে লজ্জায় ফেলে দেন।

বাবা অত্যন্ত সতর্ক অভিভাবক ছিলেন। ছেলেবেলায় দেখেছি বাথরুমের সুইচ থেকে ঝুলছে বাবার হাতে লেখা সতর্কবাণী—"ভিজে হাত দিও না।"

আর একটু বড় হয়ে দেখেছি আমাদের পড়ার টেবিলের আলো পিছন থেকে বাঁদিকে ঘেঁষে আসছে কিনা, চোখ থেকে টেবিলের ওপর রাখা বই খাতার দূরত্ব ঠিক আছে কিনা সেসব নিয়ে বাবা মাথা ঘামাচ্ছেন। পড়ার টেবিলে যখনই বসতুম মেরুদণ্ড সোজা রেখে ঋজুভাবে বসতে উপদেশ দিতেন। রাত দশটার পরে পড়াশোনার অনুমতি

ছিল না। চোখ খারাপ হবে। সবসময় বলতেন ব্রাহ্মমুহূর্তে যা পড়া যায় সব মনে থেকে যায়।

সামনে আমার তখন এম. এ. পরীক্ষা। রাত দশটার মধ্যে বিছানায় যেতে সাহস কুলোয় না। কিন্তু বাবার যে আবার বরাবরের অভ্যাস বাড়ির সকলের সঙ্গে "অসতো মা সৎগময়ঃ", "নৈশো বাস্যমিদং" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে সকলকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ির সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে তবেই শুতে যাওয়া। অগত্যা বিছানায় ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি। অপেক্ষা করি বাবার ঘরের আলো কখন নিভে যাবে তারপর খুব সন্তর্পণে ফিরে আসি পড়ার টেবিলে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাবার আগে সেটার মাথায় চাপিয়ে দিই কাগজপত্র, কাপড়-চোপড় যা পাই হাতের কাছে। দরজাটাও খুব সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে নিচের ও উপরের ফাঁকগুলিতেও কিছু গুঁজে দি যাতে আলো বিশ্বাসঘাতকতা না করে বসে। সবেমাত্র মন লেগে গেছে বইয়ের পাতায়—নিঃশব্দে খুলে যায় ভেজানো দরজাটা—বাবা দাঁড়িয়ে আছেন—"করছ কী! রাত যে অনেক হলো। চোখ খারাপ হবে। যাও শুতে যাও।" পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলের দোর গোড়া পর্যন্ত বাবা পৌঁছে দেননি এমনটা কখনও হয়নি। সারাটা পথ সতর্ক করতে করতে যেতেন যাতে মোট প্রশ্ন সংখ্যার সঙ্গে মোট উত্তর সংখ্যা মিলিয়ে নিতে ভুলে না যাই। যেন দশ মিনিট আগে লেখা শেষ করে রিভিশন করতে না হয়।

সকলকে নিয়ে খেতে বসতে বাবা বরাবর ভালোবাসেন। খাবার সময় ধীরে সুস্থে ভালো করে চিবিয়ে খেতে উপদেশ দিতেন যাতে হজম ভালো হয়। দাঁতের সুস্বাস্থ্যের জন্যে আমরা ছেলেবেলায় নিমের দাঁতন ব্যবহার করেছি—টুথপেষ্ট নয়। বাবা নিজে খুব ভালো সাঁতার জানতেন এবং সাঁতার ভালো বাসতেন। ময়মনসিংহ জেলা পালের বাড়ির ঠিক পিছনেই প্রবাহিত ছিল ব্রহ্মপুত্র নদী। প্রতি রবিবার বাবা সাঁতার কাটতে এবং সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতেন। বাবা টেনিস এবং বিলিয়ার্ড খেলায় নিপুণ ছিলেন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলাতেও তিনি সবসময় ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করতেন। আমার ছোট ভাই আনন্দরূপ খুব ভালো ক্রিকেট খেলত।

ছেলেমেয়েদের আত্মিক বিকাশের প্রতি বাবার সজাগ দৃষ্টি ছিল। বাবা গভীরভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। কিন্তু একেশ্বরবাদী এবং নিরাকারবাদী। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন ঈশ্বর মঙ্গলময়—তিনি যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন। আমাদের বাড়িতে কোন দেবদেবীর ছবি বা মূর্তি দেখিনি। কোনওরকম পূজাও অনুষ্ঠিত হতো না। কিন্তু মা-বাবা তাঁদের ধর্মবিশ্বাস কখনই ছেলেমেয়ের ওপর চাপিয়ে দেননি। যে কোন পূজায় অংশগ্রহণে আমাদের কোন বাধা ছিল না। আমি যখন রথের মেলা থেকে শিবঠাকুর কিনে এনে আমাদের আলমারীতে রেখে দুবেলা পুজো করতে শুরু করি (অবশ্য এখানে স্বীকার করতে হয় যে কলা এবং চিনি ভোগের লোভে লোভেই এই ভক্তি) তখন মা-বাবা কোন বাধা দেননি। পরবর্তীকালে আমাদের দু'বোনেরই বিয়ে হয় রক্ষণশীল হিন্দু

পরিবারে। আমি দীক্ষা নিই রামকৃষ্ণ মিশনে। এ সবকিছুই মা-বাবা গ্রহণ করেন ঔদার্য্যের সঙ্গে। বস্তুত, আমাদের বাড়ির দরজা তাঁরা খুলে দিয়েছিলেন সব ধর্মের, সব বর্ণের, সব শ্রেণীর মানুষের জন্যে। সবধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে শেখানো হয়েছে আমাদের। প্রতি রাতে উপনিষদের মন্ত্র পাঠ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ দিনে বাইবেল, কোরান এবং গীতা পাঠ করতেন বাবা। বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিতেন আমাদের।

বাবার উপরে উপনিষদের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছোটবেলা থেকেই আমরা নচিকেতা ও যমরাজ, মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপাখ্যান এবং তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং সত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলুম। তখন থেকেই উপনিষদের মন্ত্রগুলির উপর আমার গভীর বিশ্বাস গড়ে ওঠে।

আমরা তখন মুকুল দে মহাশয়ের বাড়িতে। দোতলায় দুটি ঘর। একটি বড়, একটি ছোট। বড়টিতে থাকতেন বাবা, ছোটটিতে আমি। সেটিই আমার 'স্টাডি' কাম বেডরুম। বাবার ঘর থেকে আমার ঘরে যেতে হতো সরু একটি ছাদ পেরিয়ে। কখনো কখনো দরজা খুললেই ছাদের জমাট বাঁধা অন্ধকার আমাকে যেন ভয় দেখাত। কখনো বা পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া ছাদ কেমন যেন একটা অদ্ভুত শিরশিরানি পাঠিয়ে দিত আমার শিরদাঁড়া দিয়ে। দু'চোখ প্রাণপণে বন্ধ করে রেখে বিছানা থেকেই বাবাকে ডেকে উঠতুম। সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া মিলত। ভয় করছে শুনে বলতেন 'মন্ত্র বলো।' বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠতুম "অসতো মা সৎগময়ঃ"—ভোজবাজির মতো ভয় যে কোথায় মিলিয়ে যেত। পরম শান্তিতে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়তুম।

ছেলেমেয়েদের নৈতিক বিকাশের দিকেও বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সত্যভাষণ, অপরাধ স্বীকার এবং মার্জনা ভিক্ষা, বিনয় ও নম্রতা এবং সৌজন্যমূলক আচরণের উপদেশ দিতেন। তাস এবং দাবার প্রতি বাবার বিশেষ অনীহা ছিল। বাবার এ নিয়ে একটি ছড়াও আছে। তাস আমাদের বাড়িতে প্রথম প্রবেশাধিকার পায় দার্জিলিঙের 'ঘুম' পাহাড়ে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে গিয়ে। তখন আমরা সব বড় হয়ে উঠেছি—স্কুলের শেষ ধাপে অথবা কলেজের প্রথম ধাপে। গ্রীষ্মাবকাশের শীতার্ত দুপুরগুলো যখন আর কাটতে চাইছে না—আশেপাশের প্রকৃতিকে যখন আর অতটা রহস্যময়ী বোধ হচ্ছে না তখন একদিন হঠাৎ সপত্নীক নাট্যকার তরুণ রায়ের আবির্ভাব। সঙ্গে তাসের প্যাকেট। তিনিই প্রথম তাস খেলায় দীক্ষিত করলেন আমাদের। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম বাবাও সাময়িকভাবে তাসের প্রতি তাঁর নিষেধাজ্ঞা মুলতুবি রাখলেন যদিও নিজে যোগ দিলেন না তাসের আসরে। কিন্তু সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। এটাই আবিষ্কার করা গেল ছুটি শেষে—তাসও গায়েব। শেষ গানেরই রেশ নিয়ে ফিরে আসি পড়াশোনার ব্যস্ত জগতে।

বাবা-মা ক্লাবে যেতেন। সঙ্গে নিতেন আমাদেরও। বাবা খেলতেন টেনিস ও বিলিয়ার্ড। ঘন সবুজ বেল্ট দিয়ে মোড়া বিলিয়ার্ড টেবিলে নানা রঙের বলগুলির আনাগোনা লক্ষ্য করতে ভারি ভালো লাগত আমার। কি ক্লাবে কি বাড়ির পার্টিতে

কখনো মা-বাবার হাতে বিশেষ ধরনের পানীয়ের গ্লাস দেখিনি। এ বিষয়ে বাবা অত্যন্ত নীতিবাগীশ ছিলেন।

খেতে বসে খাবারের অপচয়ও যে এক ধরনের নৈতিক অপরাধ সে কথা বাবাই প্রথম আমাদের বুঝিয়ে দেন।

বাবা নিজে বরাবর মিতব্যয়ী ছিলেন এবং অপচয় অপছন্দ করতেন। আমাদের যা টাকা লাগত দিতে কার্পণ্য করতেন না কিন্তু হিসাব রাখতে বলতেন। প্রতি রবিবার তিনি আমাদের চার আনা করে পয়সা দিতেন। আমার ছোট ভাই আনন্দ সেই পয়সা জমিয়ে যখন ২০ টাকা করেছিল তখন বাবা এত খুশি হয়েছিলেন যে ঐ টাকার সঙ্গে আর কিছু যোগ করে ওকে একটা বেবি ব্রাউনি ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি যে বাবার পুরস্কার আমার কোনও দিনই পাওয়া হয়নি কেননা আমি পাওয়া মাত্রই খরচ করে ফেলতুম—জমানো আর হয়ে উঠত না।

বস্তুত ছেলেমেয়েদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতি বাবা বিশেষ যত্নবান ছিলেন। দেশে-বিদেশের সেরা সেরা বই দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন লাইব্রেরী এবং সেখানে দিয়েছেন অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেও ভালোবাসতে শিখিয়েছেন মা-বাবা। বাবার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লাইব্রেরীটিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বই এবং রেকর্ড কেনায় বাবার সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। রোজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সঙ্গীত শ্রবণ আমাদের বাড়ির রেওয়াজ। শুধু সঙ্গীতের সংগ্রহশালাই গড়ে দেননি বাবা—ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির সঙ্গীতের আসরও জমজমাট হয়ে উঠেছে কতবার—গান গেয়েছেন শচীন দাস, মতিলাল, দীপালী নাগ, বিজন ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। সে যুগের ডাকসাইটে কণ্ঠশিল্পীরা সরোদ বাজিয়েছেন তিমির বরণ, সেতার বাজিয়েছেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই এক আসরে 'জলতরঙ্গ' প্রথম শুনি এবং মুগ্ধ হই। জাভার নৃত্য দেখিয়েছেন সুমন্ত্র ওরফে আমাদের 'মন্ত্রদা'।

শুধু সঙ্গীতের আসরই নয়—প্রতি বুধবার আমাদের বাড়িতে বসত সাহিত্যসভা। পড়া হত স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। হতো সাহিত্য সমালোচনা। মা নানারকম মুখরোচক খাবার তৈরি রাখতেন। আসতেন অশোক বিজয় রাহা, হীরেন দত্ত, সুনীল সরকার, শিশির ঘোষ, ক্ষিতীশ রায় এবং আরো অনেকে। প্রতি শনিবার মা'র পিয়ানোর সঙ্গে ভায়োলিন বাজাতে আসতেন বিবিদি—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী।

সাহিত্যচর্চ্চা এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় এক স্বপ্নিল পরিবেশে বড় হয়েছি আমরা। বাবা এও উপলব্ধি করেছেন যে সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হবে না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে তাদের। জীবনযুদ্ধে সফল হতে হবে। তাই আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্যে বাবা রাখতেন 'দি সায়ান্টিক

এমেরিকান'। দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানাহরণের জন্যে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন 'দি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন'।

আই সি এস অন্নদাশঙ্কর সম্বন্ধে আমরা ছেলেমেয়েরা বিশেষ সচেতন ছিলুম না। আমাদের মা বিদেশিনী এবং বাবা আই সি এস হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জীবনে বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না। মা-বাবা দুজনেই চরকা কাটতেন, খাদি কাপড় পরতেন। বাবার খাদি স্যুটও ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জামাকাপড় যেমন তাঁদের ছিল না তেমনি ছিল না তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও।

পদমর্যাদা নিয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন—আমাদেরও মেলা-মেশার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। ধোপার মেয়ে পার্বতী আমার বোনের বান্ধবী ছিল আর 'আক্কানা' মালির মেয়ে আমার।

বাবার কর্মজীবনের কয়েকটি বিশেষত্ব সেই অপরিণত বয়সেই চোখে পড়েছিল যদিও সেগুলির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি অনেক পরে। বাবা অত্যন্ত স্পর্শকাতর কোমল সংবেদনশীল মানুষ। বিচারকের ভূমিকায় তিনি সুখী ছিলেন না। বিচারকের আসনে বসেও তিনি অপরাধীকেও ঘৃণা করেন নি।

যে পরিস্থিতি তাকে অপরাধে বাধ্য করেছে দোষ দিয়েছেন তিনি তাকেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাবা বলতেন—"ভাগ্যিস আমাকে ফাঁসির হুকুম দিতে হয়নি।"

বাবার সদাপ্রসন্ন শান্ত সমাহিত চেহারার আড়ালে একটা ইস্পাত-কঠিন, অনমনীয়, অন্যায়ের সঙ্গে আপোসহীন, নীতিবাগীশ, বিবেকী ব্যক্তিত্ব ছিল যা তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিতে বাধ্য করেছিল।

আই সি এস অন্নদাশঙ্করের কাছে আসতেন নানা ধরনের মানুষ। হরেক রকম তাদের দাবিদাওয়া। অনেকেরই সঙ্গে থাকত রকমারি উপহার। বাবা হাসিমুখে সকলের সঙ্গেই কথা বলতেন, কিন্তু কোন উপহারই গ্রহণ করতেন না। মুর্শিদাবাদের আম ভারত বিখ্যাত। একবার মুর্শিদাবাদের সেরা আমের এক মস্ত ঝুড়ি সমেত এসেছিলেন নবাব ঘরানার কেউ একজন। মর্মাহত হয়েছিলুম যখন আমাদের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে ফিরে গেল আমে ভরা সেই ঝুড়ি। একটি আমও ছোঁবার অনুমতি পাওয়া যায়নি!

বাবা অফিস থেকে আর্দালি পেতেন। উর্দি পরা, তক্‌মা আঁটা, পাগড়ি বাঁধা রাশভারি আর্দালিদের আমরা ছোটরা সমীহই করতুম। কিন্তু যখন কাজের লোকের অনুপস্থিতিতে মা নিজের হাতে বাসন মাজতেন, কাপড় কাচতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন তখন আর্দালিদের গম্ভীর মুখে উঁচু এক টুলে বসে থাকা এবং মাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসা ভালো চোখে দেখতুম না। কিন্তু তাদের দোষ ছিল না। সরকারি লোক দিয়ে বাড়ির কাজ করানোর ব্যাপারে বাবার কড়া নিষেধ ছিল।

বাবার মধ্যে যেমন উপনিষদের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তেমনি বাইবেলের

সুগভীর প্রভাব অনুভব করা যায়। বাইবেলের 'সেন্ট ম্যাথু'র 'সায়মন ইন দি মাউন্ট' বাবার বিশেষ প্রিয়। পারিবারিক সভায় বিশেষ জোর দিতেন আবার ৫, ৬ এবং ৭-এর ওপর। "শুধু তোমার প্রতিবেশিকে নয়, তোমার শত্রুকেও ভালবাসো।" "ডান গালে চড় খেলে বাঁ গালটাও বাড়িয়ে দাও"—যিশুর এইসব উপদেশ বাবা কেন পড়ে শোনাতেন তখন না বুঝলেও এখন বুঝি। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তিনি তো আর ছোটখাটো প্রত্যাশা করতে পারেন না। নৈতিক দিক থেকে তারা আরও আরও ওপরে উঠুক এইটেই তিনি চেয়েছিলেন।

রাত্রে শুতে যাবার আগে বাবা মা'র সঙ্গে বাইবেলের উপদেশ উচ্চারণ করে প্রার্থনা করতেন—"দাই কিংডম কাম, দাই উএল বি ডান ইন আর্থ এজ ইট ইস ইন হেভেন"—প্রার্থনা করতেন "লিড আস নট ইন্টু টেম্‌টেশন বাট ডেলিভার আস্ ফ্রম ইভিল।"

বাবার দিকে তাকিয়ে অনুভব করি তিনি নিজের মধ্যে—সত্য করে পেয়েছেন বাইবেলের সেই উপদেশ—"ব্লেস দেম দ্যাট কার্স ইউ, ডু গড টু দেম্ দ্যাট হেট ইউ এণ্ড প্রে ফর দেম্ হুইচ ডেসকাইটফুলি ইউজ ইউ এণ্ড পারসেকিউট ইউ।"

তাঁর ভালবাসা শত্রু-মিত্র, পাত্রাপাত্র উচ্চনিচ ছোট-বড় ভেদাভেদ জানেনি। আমাদের বাড়িতে রান্না করতেন নবদা। তাঁর বিরুদ্ধে ছোটদের অভিযোগের যথেষ্টই কারণ ছিল। কিন্তু বাবা সেসব শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা নবদা ছিলেন এক হতাশ প্রেমিক। বাবা তাঁর দুঃখে কাতর ছিলেন। আমাদের মালি মঙ্গল যখন যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অবসর নিতে বাধ্য হয় তখন বাবা নিজেও অবসর নিয়েছেন। চার পড়ুয়া ছেলেমেয়ের ব্যয়ভার তাঁর ওপরে। তা সত্ত্বেও তিনি মঙ্গলের চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় নিজের ওপর টেনে নেন। এবং সে ফিরে এলে তার জন্যে দৈনিক দুধ ও ডিমের ব্যবস্থা করে দেন।

অবোলা প্রাণীদের প্রতিও বাবার ছিল অপরিসীম মমতা এবং ভালবাসা। বাবার পাহাড়ি কুকুর বিন্দির যখন বয়স হয়ে গেল তখন সে চোখে দেখতে পেত না, কানেও শুনতে পেত না। বাবা পরম মমতার সঙ্গে তাকে কোলে করে বাইরে নিয়ে যেতেন নিত্যকর্মের জন্যে আর তাকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভুলি কুকুর প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে আমাদের পাশের বাড়ির বাগানে পড়েছিল। তাকে সেবা ও চিকিৎসার জন্যে তুলে আনতে গিয়ে মঙ্গল যখন কামড় খেল তখন ডাক্তার তার কাছে যাওয়া নিষেধ করেছিলেন। ভুলির জন্যে কিছু করতে পারা গেল না এটা বাবাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। ভুলিকে আমরা যখন আমাদের বাগানে শুইয়ে দিই, তখন বাবা একটি কাগজে লিখলেন 'ভুলি তুমি আমাদের ক্ষমা করো।' কাগজ এবং প্রচুর ফুল বিছিয়ে দিলেন ভুলির মরদেহের ওপর।

আমাদের বাড়িতে অনেক বেড়াল ছিল। তারা বেশ সভ্যভব্যই ছিল। পাত থেকে

মাছ চুরি করত মাত্র একজনই। তারও পক্ষপাতিত্ব ছিল বাবারই খাবারের থালা। কিন্তু বাবার কাছে তার সাতখুন মাফ্। বেড়ালগুলোর পক্ষপাতিত্ব ছিল বাবার বিছানার ওপরেও। প্রায়ই দেখা যেত কোন না কোন বেড়াল বাবার বিছানা জুড়ে শুয়ে আছে আর বাবা এক পাশে কোনক্রমে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। বাবা তাদের শাসন করতে দিতেন না।

বাবার ওপরে আর একজনের প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। তিনি মহাত্মা গান্ধী। বাবার জীবনচর্চায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এই প্রভাব। শুধু চরকা কাটা এবং খাদি ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত ছিল না তা। সন্তান পালনের ক্ষেত্রেও গান্ধীবাদী ছিলেন বাবা। গান্ধীজির এক ভাষাতত্ত্ব এবং মাতৃভাষাতত্ত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে একাধিক ভাষা না শিখিয়ে শিখিয়েছেন মাত্র একটি এবং সেটি হলো মাতৃভাষা বাংলা। একই কারণে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমও ছিল বাংলা।

মা এবং বাবা দুজনেই নিরামিষাশী ছিলেন। অনেক পরে স্বাস্থ্যের খাতিরে ডাক্তারের আদেশে আমিষ আহারে বাধ্য হন। শুধু আমিষ বর্জন নয়, সব অর্থেই হিংসা বর্জন করেছিলেন তাঁরা। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করলে বাবার কাছে অহিংসা শব্দের অর্থ কী তা পরিষ্কার হবে। আমরা তখন শান্তিনিকেতনে শ্রীপল্লীতে। আমাদের বাড়িতে নুড়ি পাথরের একটা পথ ছিল। বাবা সন্ধেবেলা সেই পথ ধরে পায়চারি করতে ভালবাসতেন। সেদিন মুখসন্ধে, বাবা পায়চারি করছেন। কাছেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ভুলি। পাড়ার সার্বজনীন প্রতিহারিনী। হঠাৎ সে তার ভূমিশয্যা ত্যাগ করে স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল। মাটির দিকে মুখ করে আর্ত চীৎকার করতে শুরু কবল। আমরা ছুটে এসে দেখি এক অভাবনীয় দৃশ্য—ফণাতোলা এক বিষাক্ত সাপ আর তার ঠিক সামনেই বাবা। অন্যমনস্ক লেখক জানতেই পারেন নি তাঁর জন্যে কী বিপদ ওৎ পেতে আছে। লাঠি-হাতে মঙ্গলকে ছুটে আসতে দেখে আর্তস্বরে বাধা দিতে চাইলেন বাবা। কিন্তু তার আগেই ক্ষিপ্রবেগে নেমে এসেছে লাঠি উদ্যত ফণার ওপরে। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সাপ নয়, লাঠির প্রতিটি আঘাত তাঁরই শরীরে পড়ছে। সে রাতে বাবা না পারলেন খেতে না শুতে। বিনা অপরাধে একটা প্রাণ কেন নেওয়া হলো সেকথা তাঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে ওঠা যায়নি।

আমাদের জীবনের আলোকবর্তিকা বাবা। আঘাত-সংঘাতের মাঝে যখন দিশাহারা হই তখন তাঁরই দিকে তাকাই—পেয়ে যাই দিশা। বাবার নিজের জীবনও গোলাপের শয্যা নয়। খুব কম বয়সে মাকে হারান তিনি। পরিণত বয়সে একাধিক প্রিয়জনকে। এসেছে দুঃখ, আঘাত, বঞ্চনা, হতাশা, মোহভঙ্গ আর পারিবারিক বিপর্যয়। বারে বারেই অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কখনই ধৈর্যহারা হননি তিনি। ঈশ্বরের করুণা এবং মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা কখনও হারাননি। অন্তরের মধ্যে যে দীপটি তিনি জ্বালিয়ে রেখেছেন শত ঝড়-ঝাপটাতেও সেটিকে নিভে যেতে দেননি। সেই দীপ

থেকে আমার মত আরও অনেকে জ্বালিয়ে নিয়েছেন আপন আপন দীপশিখা। পরম বেদনার দিনগুলিতে বাবার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়েছে গীতার সাংখ্যযোগের স্থিতপ্রজ্ঞের কথা—দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

লেখার টেবিলে বাবা যেন ধ্যানস্থ যোগী। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা। মৈত্রেয়ীর মত তাঁরও প্রশ্ন "যা আমাকে অমৃত দেবে না তা নিয়ে আমি কি করব?"—সৃষ্টিই তাঁর অমৃত। পরমতম শোকের মধ্যে দিয়ে কিভাবে আনন্দ উত্তরণ করা সম্ভব তা বাবার মধ্যেই দেখেছি। মায়ের স্মরণ সভায় কী ধরনের গান তাঁর ভালো লাগবে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন যে গানের ক্ষণ হবে আনন্দ আর মুক্তি। গাওয়া হয়েছিল "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়"। সৃষ্টিই তাঁর আনন্দলোকে উত্তরণের চাবিকাঠি।

ঈশ্বর তাঁকে সুদীর্ঘ, নীরোগ এবং সৃজনশীল জীবন দিন এই আমাদের প্রার্থনা। সেই সঙ্গে ঈশ্বরকে নতজানু-কৃতজ্ঞতা অন্নদাশঙ্করকে পিতারূপে আমাদের উপহার দেবার জন্যে। আমাদের বিনীত প্রার্থনা যেন তিনিই আমাদের উপযুক্ত পুত্রকন্যা হতে সাহায্য করেন।

সৌজন্যে ঃ 'কবিতীর্থ ঃ জুলাই-১৯৯৪

আমার বাবা

আনন্দরূপ রায়

বাবার ও মা'র জীবনের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য, একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই বিশেষত্বের মূলে ছিল দুজনেরই অজানা ভবিষ্যতের নতুন পথে এগিয়ে চলার ঝোঁক ও সাহস।

মা'র ঠাকুমা তাঁর পরিবারকে আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বহু কষ্টে সমৃদ্ধশালী হন। মা তাঁর ঠাকুরমার মতোই দুঃসাহসী ছিলেন ; একটা সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে জব্দ হয়ে থাকতে চাননি। উনি তাঁর অর্বাচীন ও সংকীর্ণ সমাজ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে ইউরোপ ও ভারতে এসেছিলেন নতুন পরিচয়ের খোঁজে। এবং বাবাকে বিয়ে করে সম্পূর্ণভাবে নতুন জীবন সৃষ্টি করেছিলেন।

বাবার ক্ষেত্রে দেখি যে তিনিও সমস্ত সংকীর্ণতার ওপরে উঠে উদার মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন খুব অল্প বয়সেই। এমনকী বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম লেখা হল 'নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা' নিয়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ।

এই দুই pioneering spirit যে জীবনযাপন করেছিলেন সেটা ছিল একেবারেই নিজস্ব, পরীক্ষামূলক এবং পথিকৃতের। দুজনে ছিলেন কবিতার দুটি চরণশেষের দুটি মিল। এটাই তাঁদের জীবনসাধনার মূল কথা।

বাবা একটি সর্ব ধর্ম থেকে সার সংগ্রহকারী একেশ্বরবাদী ধর্ম গঠন করেছিলেন। তার মধ্যে প্রচলিত রীতি, প্রথা, বিধান, সংস্কার—এ সমস্ত কিছু ছিল না। বাইবেল, উপনিষদ ইত্যাদি সবই পাঠ শোনা ও আলোচনা হত। প্রত্যেকদিন শোবার আগে আমাদের দুটি মন্ত্র আবৃত্তি করতে হত—উপনিষদের 'অসতো মা সদ্‌গময়'..., আর গীতা থেকে 'অদ্‌বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'। এই দুটি শ্লোকই বাবা আমাদেরকে দিয়েছিলেন জীবনের মন্ত্ররূপে ; এর মধ্যে কোনো ভাগ্য বা বস্তু বা বাহ্য কিছু পাওয়ার জন্য প্রার্থনা নেই, আছে শুধু আপন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

বাবা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সব ধর্ম মূলত এক, এবং এই অর্থে তিনি প্রকৃত secularist ছিলেন।

[নির্বাচিত অংশ]

সৌজন্যে ঃ 'বাংলা বই', বাংলা আকাদেমি।

পরিশিষ্ট

(ক) অন্নদাশঙ্করের বংশতালিকা
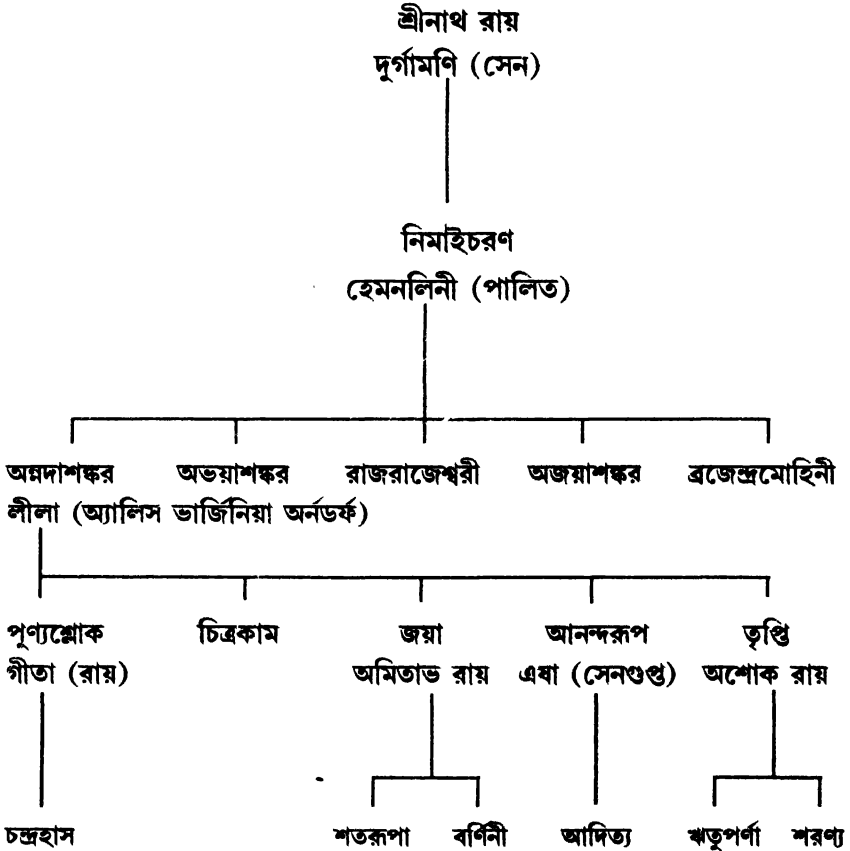
(খ) অন্নদাশঙ্করের জীবনপঞ্জী

১৫ই মার্চ ১৯০৪ ॥ দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানাল গড়, ওড়িশায় জন্ম।

১৯২১ ॥ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ।

১৯২৩ ॥ ইন্টারমিডিয়েট আর্টস-এ প্রথম।

১৯২৫ ॥ ব্যাচেলার অব আর্টস ইংরেজি অনার্স-এ প্রথম।

১৯২৭ ॥ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস প্রতিযোগিতায় প্রথম

১৯২৭-২৯ ॥ লন্ডনে শিক্ষানবিশি এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস্ কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন।

১৯৩০ ॥ বিবাহ—লীলা রায়কে (পূর্বনাম ঃ অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ)।

১৯২৯-৪৭ ॥ মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসাবে কর্মরত।

১৯৪৭-৫১ ॥ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন উচ্চ-প্রশাসনিক পদে কর্মরত।

১৯৫১ ॥ জুডিসিয়াল সেক্রেটারী ও লীগ্যাল রিমেমব্রান্সার পদে থাকাকালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে অকাল অবসর গ্রহণ।

১৯৫৭ ॥ জাপান ভ্রমণ।

১৯৬৩ ॥ জার্মানি ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ।

১৯৬৭ ॥ কলকাতা বাস-এর শুরু।

১৯৮০ ॥ বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ।

১৯৮৬ ॥ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি হন।

১৯৮৭ ॥ পদ্মভূষণ সম্মান লাভ

১৯৮৯ ॥ সাহিত্য অকাদেমি ফেলশিপ সম্মান লাভ

১৯৯৬ ॥ বাংলাদেশ রজতজয়ন্তী দিবসে বিশেষ অতিথি

১৯৯৯ ॥ নজরুল পুরস্কাল লাভ।

২০০০ ॥ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ।

● এছাড়া পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণপদক, টেগোর সেন্টেনারি মেডেল। বিশ্বভারতী তাঁকে প্রদান করে দেশিকোত্তম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট দিয়েছে।

২০০২ ॥ মার্চ থেকে বার্ধক্যজনিত শারীরিকভাবে দুর্বল অবস্থায়,

২৮ শে-অক্টোবর শেঠ সুখলাল কার্ণানী হাসপাতালে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়।

(গ) অন্নদাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জি

কবিতা ও ছড়া

১। রাখী (১৯২৯)
২। একটি বসন্ত (১৯৩১)
৩। কালের শাসন (১৯৩৩)
৪। কামনা পঞ্চবিংশতি (১৯৩৪)
৫। উড়কি ধানের মুড়কি (১৯৪২)
৬। নূতনা রাধা (১৯৪৩)
৭। রাঙা ধানের খৈ (১৯৫০)
৮। ডালিম গাছে মৌ (১৯৫৮)
৯। শালি ধানের চিড়ে (১৯৭২)
১০। আতাগাছে তোতা (১৯৭৪)
১১। হৈ রৈ বাবুই হৈ (১৯৭৭)
১২। হট্টমালার দেশে (১৯৮০)
১৩। ক্ষীর নদীর কূলে (১৯৮০)
১৪। রাঙা মাথায় চিরুনি (১৯৮০)
১৫। ছড়া সমগ্র (১৯৮৫)
১৬। শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬)
১৭। বিন্নি ধানের খই (১৯৮৯)
১৮। কলকাতার পাঁচালী (১৯৯২)
১৯। যাদু এ তো বড় রঙ্গ (১৯৯৪)
২০। সাত ভাই চম্পা (১৯৯৪)
২১। খেয়াল খুশির ছড়া (১৯৯৭)
২২। দোল দোল দুলুনি (১৯৯৮)
২৩। রাঙা ঘোড়ার সওয়ার (২০০২)

গল্প

২৪। প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪)
২৫। দুকান কাটা (১৯৪৪)
২৬। হাসনসখী (১৯৪৫)
২৭। মন পবন (১৯৪৬)
২৮। যৌবন জ্বালা (১৯৫০)
২৯। কামিনীকাঞ্চন (১৯৫৪)
৩০। রূপের দায় (১৯৫৮)
৩১। গল্প (১৯৬০)
৩২। কথা (১৯৭১)
৩৩। কাহিনী (১৯৮০)
৩৪। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৪)
৩৫। গল্প সমগ্র (১৯৯৯)

উপন্যাস

৩৬। আগুন নিয়ে খেলা (১৯৩০)
৩৭। অসমাপিকা (১৯৩১)
৩৮। সত্যাসত্য ঃ যার যেথা দেশ (১৯৩২)
৩৯। পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩)
৪০। সত্যাসত্য ঃ অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩)
৪১। সত্যাসত্য ঃ কলঙ্কবতী (১৯৩৪)
৪২। সত্যাসত্য ঃ দুঃখমোচন (১৯৩৬)
৪৩। সত্যাসত্য ঃ মর্ত্যের স্বর্গ (১৯৪০)
৪৪। সত্যাসত্য ঃ অপসরণ (১৯৪২)
৪৫। না (১৯৫১)
৪৬। কন্যা (১৯৫৩)
৪৭। রত্ন ও শ্রীমতী (১ম) (১৯৫৬)
৪৮। রত্ন ও শ্রীমতী (২য) (১৯৫৮)
৪৯। সুখ (১৯৬১)
৫০। বিশল্যকরণী (১৯৬৭)
৫১। তৃষ্ণার জল (১৯৬৯)
৫২। রত্ন ও শ্রীমতী (৩য) (১৯৭২)
৫৩। রাজঅতিথি (১৯৭৮)
৫৪। ক্রান্তদর্শী (১ম) (১৯৮৪)
৫৫। ক্রান্তদর্শী (২য) (১৯৮৫)
৫৬। ক্রান্তদর্শী (৩য়) (১৯৮৫)
৫৭। ক্রান্তদর্শী (৪র্থ) (১৯৮৬)

প্রবন্ধ

৫৮। তারুণ্য (১৯২৮)
৫৯। আমরা (১৯৩৭)
৬০। জীবনশিল্পী (১৯৪১)
৬১। ইশারা (১৯৪৩)
৬২। বিনুর বই (প্রথম পর্ব) (১৯৪৪)
৬৩। জীয়ন কাঠি (১৯৪৯)
৬৪। দেশকালপাত্র (১৯৪৯)
৬৫। প্রত্যয় (১৯৫১)
৬৬। নতুন করে বাঁচা (১৯৫৩)
৬৭। আধুনিকতা (১৯৫৩)

৬৮। সাহিত্যে সংকট (১৯৫৫)
৬৯। কণ্ঠস্বর (১৯৫৬)
৭০। অপ্রমাদ (১৯৬০)
৭১। দেখা (১৯৬১)
৭২। রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২)
৭৩। প্রবন্ধ (১৯৬৪)
৭৪। খোলা মন ও খোলা দরজা (১৯৬৭)
৭৫। আর্ট (১৯৬৮)
৭৬। গান্ধী (১৯৭০)
৭৭। দিশা (১৯৭০)
৭৮। প্রাণরক্ষা ও বংশরক্ষার অধিকার (১৯৭০)
৭৯। শুভোদয় (১৯৭২)
৮০। বাংলার রেনেসাঁস (১৯৭৪)
৮১। শিক্ষার সংকট (১৯৭৬)
৮২। কাঁদো, প্রিয় দেশ (১৯৭৬)
৮৩। প্রেম ও বন্ধুতা (১৯৭৬)
৮৪। চক্রবাল (১৯৭৮)
৮৫। আই. সি. এস. (১৯৭৮)
৮৬। লালন ও তাঁর গান (১৯৭৮)
৮৭। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য (১৯৭৮)
৮৮। দ্বিধাদ্বন্দ্ব (১৯৭৮)
৮৯। বাংলাদেশে (১৯৭৯)
৯০। সাতকাহন (১৯৭৯)
৯১। টলস্টয় (১৯৮০)
৯২। স্বাধীনতার পূর্বাভাস (১৯৮০)
৯৩। জাতিবৈর (১৯৮১)
৯৪। শিক্ষার ভবিষ্যৎ (১৯৮১)
৯৫। সংহতির সংকট (১৯৮৪)
৯৬। সংস্কৃতির বিবর্তন (১৯৮৪)
৯৭। সিংহাবলোকন (১৯৮৫)
৯৮। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (১৯৮৫)
৯৯। নতুন প্রবন্ধ (১৯৮৬)
১০০। দেখাশোনা (১৯৮৮)
১০১। স্রোতের দীয়া (১৯৮৯)
১০২। এই সময় (১৯৮৯)
১০৩। যুক্তবঙ্গের স্মৃতি (১৯৯০)
১০৪। সন্ধিক্ষণ (১৯৯১)
১০৫। যেন ভুলে না যাই (১৯৯২)
১০৬। বিনুর বই (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্রে) (১৯৯৩)
১০৭। সাহিত্যিকের জবানবন্দী (১৯৯৬
১০৮। সেতুবন্ধন (১৯৯৬)
১০৯। নব্বই পেরিয়ে (১৯৯৬)
১১০। বিদগ্ধ মানস (১৯৯৭)
১১১। মুক্তবঙ্গের স্মৃতি (১৯৯৮)
১১২। জীবন যৌবন (১৯৯৯)
১১৩। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র (১৯৯৯)
১১৪। নতুন করে ভাবা (১৯৯৯)
১১৫। সাহিত্যে সংকট ও অন্যান্য (২০০০)
১১৬। আমার কাছের মানুষ (২০০১)
১১৭। শতাব্দীর মুখে (২০০১)
১১৮। আমার ভালোবাসার দেশ (২০০১)

বিবিধ

১১৯। পথে প্রবাসে (ভ্রমণ কাহিনী) (১৯৩১)
১২০। ইউরোপের চিঠি (ভ্রমণ কাহিনী) (১৯৪৩)
১২১। পাহাড়ী (কিশোর উপন্যাস) (১৯৪৪)
১২২। আলাপ (চিঠিপত্র) (১৯৫৩)
১২৩। রাতের অতিথি (কাব্যনাট্য) (১৯৫৪)
১২৪। চতুরালি (নাটক) (১৯৫৫)
১২৫। জাপানে (ভ্রমণকাহিনী) (১৯৫৯)
১২৬। ফেরা (ভ্রমণকাহিনী) (১৯৬৬)
১২৭। চেনাশোনা (ভ্রমণকাহিনী) (১৯৭৫)
১২৮। কিশোর সঞ্চয়ন (সংকলন গ্রন্থ) (১৯৮৪)
১২৯। কিশোর সাহিত্য সমগ্র (১ম খণ্ড) (১৯৯৫)
১৩০। নির্বাচিত রচনা (১৯৯৫)
১৩১। ভ্রমণকাহিনী সমগ্র (১৯৯৮)